ISSN 2229-7537

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

Vol. 17, October, 2025

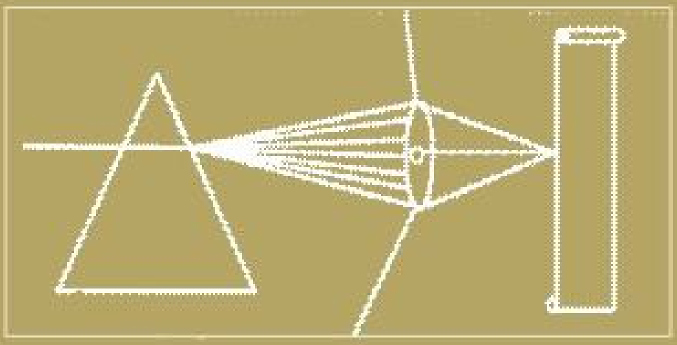

Annual Bilingual Journal

of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia, West Bengal

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 17, October, 2025

Annual Bilingual (English & Bengali) Journal
of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia

THE PRISM

Vol.17, October 2025

Journal of Mahatma Gandhi College

Lalpur, Daldali, Purulia- 723130, West Bengal, India

Contact: + 91 9083255098 / 8944094237 **E-mail:** prismmgc@gmail.com

Editorial Board

Editor in Chief:

Dr. Abhijit Ghosh, Assistant Professor in Economics.

Members of Editorial Board:

Dr. Kalyan Senapati, Assistant Professor in Chemistry.

Dr. Apurba Gorai, Assistant Professor in Sanskrit.

Dr. S M N E Mustafa, Assistant Professor in English.

Dr. Srimoyee Datta, Assistant Professor in Commerce.

Dr. Jayanta Sinha Mahapatra, SACT-I in Bengali.

Advisory Board:

Dr. Nachiketa Bandopadhyay, Registrar, SKB University, Purulia.

Dr. Santi Kundu, Principal, M.G. College, Lalpur.

Prof. (Dr.) Sauren Bandopadhyay, Vice Chancellor, West Bengal State University, Barasat, North 24 Parganas, West Bengal.

Prof. Prahallad Debnath, Department of Commerce, Tripura University (A Central University).

Dr. Debaprasad Mandal, Department of Chemistry, IIT Ropar, Panjab

Dr. Pavan Kumar Pandey, Department of Sanskrit, Banaras Hindu University, Varanasi.

Dr. Gourisankar Nag, HOD, Dept.of Political Science, SKB University, Purulia.

Prof., Proboodh Kumar Kuiri, HOD, Dept.of Physics, SKB University, Purulia.

Prof. Pradipta Banerjee, HOD, Dept.of Commerce, SKB University, Purulia

Cover Design: Prof. Rahul Chakrabarti

Date of Publication: 2nd October 2025

Publisher: Teachers' Council, Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia.

Printed at: Kabitika. Mob: 9832130048

Price : 350.00, 10 $

Editorial

Contemplate and Create

With this dictum, we are pleased to present the 17th issue of The Prism. The consecutive seventeen years of publication, maintaining quality, does not merely draw attention to the annals of our venture—it is a celebration of determination, intellectual curiosity, and academic commitment. In an era of rapid transformation, where knowledge, technology, and society are evolving at an unprecedented pace, the role of academic journals has become more significant than ever. The Prism, since its inception, has stood as a reflection of intellectual diversity and a beacon for critical thought. This edition of The Prism brings together contributions that explore new frontiers of learning while remaining deeply rooted in values of reason, argument and inclusivity. The articles featured in this volume address contemporary challenges while also bringing forth history—be it in the realms of economics, literature, science, or social policy—and attempt to offer academic quintessence tempered with practical insight.

Mahatma Gandhi College, situated in a rural hinterland where issues of asymmetric information and infrastructural limitations persist, has nonetheless continued its academic journey with determination. The uninterrupted publication of The Prism for seventeen consecutive years is a testimony to that resolve. It would not be an overstatement to say that The Prism has consistently contributed to the ever-expanding repository of academic endeavours of our time.

We invite you to engage with this edition and share your comments with us. Hopefully, this edition of The Prism, like its previous editions, will continue to inspire students, teachers, and researchers alike to pursue the creation of a knowledge base, excellence with empathy, and innovation.

We extend our gratitude to the contributors, reviewers, advisory board, colleagues in this college and to the editorial team for their unwavering commitment. Together, we reaffirm our resolve to make The Prism not just a journal, but a platform of discussion, dialogue, and debate.

Thank you all
Members of Editorial Board

2nd October, 2025
Mahatma Gandhi College, Purulia

.

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 17, October, 2025

Contents

সুচিত্রা ভট্টাচার্য-এর ‘উড়ো মেঘ’ :
নারীর সামাজিক প্রতিকূলতা ও আত্মমুক্তির প্রয়াস
আকাশলীনা ঢোল 11

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ : এক নাগরিক জীবনের রূপায়ণ
দিলরুবা খাতুন 23

‘তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী’র আলোকে মুঘল যুগে
কাশ্মীরের পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক দিকের একঝলক
মীরসাহেব আনসারী 30

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ
পায়েল কুন্ডু 45

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা
অনিরুদ্ধ বিশ্বাস 52

ভারতীয় দর্শনে দুঃখ ও দুঃখবোধ: একটি পর্যালোচনা
সুশোভন দে 67

ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মানবাধিকার : সমস্যা ও দৃষ্টিকোণ
রূপসিং টুডু 81

ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসায় পণ্য ও পরিষেবা করের (GST) প্রভাব:
সুযোগ, সংকট ও সম্ভাবনা
সাধন কুম্ভকার 93

মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে নারী চরিত্রের আধুনিকতা
সুশান্ত রুহিদাস 110

উপযোগিতার নীতি: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
রুবাই কুন্ডু 124

Gender and Development: Disentangling the Nehruvian Vision
Debdatta Chatterjee 132

Precarity of Stigmatising Disability: Representation of AIDS in
Mahesh Dattani's Ek Alag Mausam
Dipanjan Kundu 145

Sati in Indian Tradition: Origins, Sanction,
Abolition and the Radical Reappraisal by Ambedkar
Kaushik Mandal 161

Plague as punishment: Narrating illness
and disease in Iliad and Sitala Mangal-kavya
Arpita Ghosh 175

A Critical Examination of India's Media Landscape: Freedom,
Challenges, and Accountability
Sumit Howladar 185

The Partition of India and the Instrumentation of Violence as
Psycho-Political Weapons over the Afflicted: Political Revision of
a Few Short Stories of Saadat Hasan Manto
Amitava Kanjilal 202

Intervening Household as a Critical Unit of Research
Malinee Mukherjee 221

Duty Rights and Gandhiji: A Critical Study
Bapi Mondal 233

Language Absorbing Caste Prejudice:
A Study of Select Languages of India
Sujit Malick 244

Humanism and Ethics: From Rabindranath Tagore's Viewpoint
Subrata Das 253

Primary Education in Rural Areas of West Bengal:
Challenges and Prospects
Shyamal Chandra Barman 265

Religious Tolerance Education through
Upanishadic thought in Contemporary India
Bamapada Bauri 278

The Educational Ideals of
Rabindranath Tagore: A Philosophical Review
Santu Kandar 289

Trash and the City: Environmental Review
of Solid Waste Practices in Kolkata
Samik Chakraborty 301

Transformative Impact of Blockchain
Adoption on the Auditing Profession
A. Shanker Prakash 331

Divergence of Indian Stock Market From
Global Market Post-COVID
Bishal Routh & Joy Sarkar 349

A Brief Study of the Dharma in
The Mahabharata, Silappadikaram and Manimekalai
Padmavati Gangopadhyay 371

Role of emulsion type soft nanostructure in drug delivery process
Jayanta Kumar Midya 383

Protection and Deprotection of Alcohols in Organic Synthesis
Kalyan Senapati 393

Colony Growth and Social Drivers of Roost-Site Selection in
Pteropus medius (Temminck, 1825) in West Bengal
Susanta Mallick 420

A Brief Review of Photochromic Spiropyrans
and Spirooxazines and Fulgides and Their Applications
Susovan Mandal 436

A Review on SIR Modelling of Infectious Diseases
Soumendra Nath Ruz 449

Theoretical Chemistry: Is It A Greener
Way of Doing Research in Chemistry?
Anirban Panda 461

Radical Ions as Reactive Intermediates in Organic Synthesis
Sayantan Mondal 471

HR Analytics Research Over the Years: Key Trends,
Emerging Themes, and Future Possibilities – A Bibliometric Review
Sadhna Chauhan 491

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

সুচিত্রা ভট্টাচার্য-এর 'উড়ো মেঘ' : নারীর সামাজিক প্রতিকূলতা ও আত্মমুক্তির প্রয়াস

আকাশলীনা ঢোল *

সারসংক্ষেপ : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'উড়ো মেঘ' উপন্যাসের পরিসরে উঠে এসেছে আধুনিক সময়ের নারীর বিপর্যস্ত জীবনের বিভিন্ন দিক। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে দুই নারী, দেয়া এবং শিউলি। এদের মধ্যে একজন কলকাতার একটি বস্তির বাসিন্দা, অপরজন শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ও স্ত্রী। অথচ, দুই নারীর জীবনকেই কীভাবে গ্রাস করেছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা, সেই বিষয়টিই ঔপন্যাসিক যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন কাহিনি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। আবার, বিপর্যস্ত নারীর সমস্যা দেখিয়েই সুচিত্রা কলম স্তব্ধ করেননি, সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথের সন্ধানও দিয়েছেন তিনি। প্রতিকূলতা কেবলমাত্র দুই নারীর জীবনেরই নয়, সমগ্র বিশ্বজুড়ে চিরকাল এই সমস্যাগুলি দেখা গিয়েছে। ঔপন্যাসিক যেন সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন এখানে।

সূচক শব্দ : প্রতিকূলতা, শ্লীলতাহানি, বিপর্যয়, আত্মমুক্তি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ পরিমণ্ডলে, নারী পরিসরের সন্ধান করতে গিয়ে মনে হতে পারে, তৎকালীন সমাজে নারীর স্বাধীনতা, সামাজিক অধিকার, প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কারণ সেই যুগে নারীর শিক্ষা গ্রহণ, অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকা, স্বাধীন চিন্তাভাবনা করার অধিকার যেমন ছিল, তেমনই স্বামীর সঙ্গে যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণের অধিকারও তার ছিল। এমনকি, নারীর উপনয়ন সংস্কার হত এবং তাকে বেদ পাঠের যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মের বদল

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: dholeakashleena95@gmail.com

ঘটতে শুরু করে। বদলে যেতে থাকে নারীর প্রতি পুরুষের তথা সমাজের মনোভাবও। ধীরে ধীরে নারীর বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে সন্তানের জন্ম দেওয়া, পালন করা এবং স্বামীর অনুগামিনী হওয়া। তার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। মনুর যুগে নারীর উপনয়ন নিষিদ্ধ হয়, বৈদিক মন্ত্র পাঠে তাদের আর অধিকার থাকে না। নারীর জীবনে নেমে আসে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা। এইরকম বহু নারীর জীবনে সামাজিক, পারিবারিক প্রতিকূলতার বর্ণনা উঠে আসে ভারতীয় পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায়। এরপর কেটে যায় অনেকটা সময়, কিন্তু প্রত্যেক সময়ের দিকে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, নারী কোনওদিনই মানুষ হিসেবে সাধারণ মনুষ্যত্বের সম্মান পায়নি। উনবিংশ শতকে এই ঘটনার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সেই সময় ‘কিছু নারীদরদী পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন যাঁরা সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় নারী কিছুটা সুযোগ সুবিধা অর্জন করল। ক্রমে নারী সাংবিধানিক অধিকার পেল, তবে তাও কার্যত ফলপ্রসূ নয়’।[১] কুড়ি-একুশ শতকে জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকটাই বদল এসেছে, ‘সেই সঙ্গে অবশ্যই মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতিও পাল্টাচ্ছে’।[২] কিন্তু, এই সময়পর্বেও কি নারী, পুরুষের সঙ্গে মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা পাচ্ছে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি সত্ত্বেও তার প্রতি অসাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি কি সত্যিই বদলেছে? এই প্রশ্নই যেন উঠে এসেছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০-২০১৫) ‘উড়ো মেঘ’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। যেখানে আধুনিক নারীর জীবনকে গ্রাস করেছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা। এখন প্রশ্ন হল, আলোচ্য উপন্যাসের পরিসরে নারীকে ঠিক কী কী ধরনের সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল? সেখান থেকে সে আত্মমুক্তির পথের সন্ধানই বা করেছিল কীভাবে? কিংবা, সে কি সেই পথের সন্ধান আদৌ পেয়েছিল? বিষয়গুলি আলোচনার অবকাশ রাখে।

আলোচ্য উপন্যাসের পরিসরে মূলত দু’জন নারীর সামাজিক প্রতিকূলতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এর একদিকে রয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেয়া এবং অপরদিকে রয়েছে শিউলি নামের এক হত-দরিদ্র পরিবারের সন্তান। দুজনেই আধুনিক সময় ও সমাজের প্রতিনিধি। এই দুই নারীর জীবনের সামাজিক প্রতিকূলতা বর্ণনার মধ্যে দিয়েই উপন্যাসের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

'উড়ো মেঘ' উপন্যাসের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে পুরুষের বহুগামিতার প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে। টমাস গ্রিন নামে জনৈক ব্যক্তি একসঙ্গে পাঁচজন স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ঘর করছিলেন। কিন্তু, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উটা প্রদেশের এক আদালত তাঁর প্রতি বহুবিবাহের অভিযোগ এনে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলে, বাঁধ সাধেন তাঁর দুই সহধর্মিণী। তাঁরা জানান– 'ওই বহুগামী স্বামীতেই তাঁরা সন্তুষ্ট, ওই স্বামীতেই তাঁরা একনিষ্ঠ'।[৩] আপাতদৃষ্টিতে, এই ঘটনা হাস্যকর মনে হলেও, এর মধ্যে দিয়েই কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতি অনেকখানি ধরা দিচ্ছে পাঠকের কাছে। পুরুষের বহুগামিতার যে ঘটনা প্রাগাধুনিক যুগের সমাজে ঘটে থাকত, আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্যের এক দেশেও প্রায় একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। যদিও ঘটনাটি প্রায় বিরল, তবু সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থানটিও অনেকখানিই পরিষ্কার হয়ে যায় এই ঘটনার সূত্র ধরে। অপরদিকে, তাঁর দুই স্ত্রী-এর সমর্থনের কারণটিও ভেবে দেখা প্রয়োজন। হয়তো, স্বামীর অবলম্বন ছাড়া তাঁদের বেঁচে থাকার আর কোনও পথ খোলা নেই, কিংবা হয়তো তাঁরা সংসার ভাঙতে নারাজ, কিংবা হয়তো তাঁদের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল যে বিবাহিত নারীর জীবনে স্বামীই সর্বেসর্বা, স্বামীই পরমো তপঃ।

পাশ্চাত্যের এই ঘটনার পাশাপাশি ভারতবর্ষে তথা বাংলার বুকেও ঘটে যেতে থাকে বিভিন্ন ঘটনা। প্রায় সময়ই বিভিন্ন জায়গা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় সদ্যোজাত শিশুদের, তার চেয়েও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল অধিকাংশ সদ্যোজাতই কন্যাসন্তান। 'সমাজ এগোচ্ছে, না পিছোচ্ছে?'[৪] এই প্রশ্নই যেন দানা বাঁধে পাঠক তথা আমজনতার মনে।

গৃহস্থ মানুষের মোক্ষ ত্রিবর্গে সীমাবদ্ধ। ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কাম। প্রাচীন সমাজ থেকেই কাম প্রধান পুরুষার্থ হিসেবে গণ্য। জীবনধারণের প্রয়োজনে যতগুলি পেশা সামাজিক দিক থেকে স্বীকৃত, তার মধ্যে পতিতাবৃত্তি আদিমবৃত্তি। এই বৃত্তির উৎস নিয়েই নানা মুনির নানা মত। অর্থ উপার্জন, না কাম-বাসনা পূরণ? শারীরিক চাহিদা নিবৃত্ত করা, না ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া? সে যাইহোক, সমাজসৃষ্ট পতিতা কখনও নিছক পতিতা, অচ্ছুৎ, কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত, কখনও মাঙ্গলিক কর্মে উৎসর্গীকৃত।

পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর 'ভোগ্য পণ্য' রূপ নিয়ে উন্মাদ-উন্মাদনা যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় পাতায় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কাম-বাসনা বিলাসের মত্ততায়

উল্লসিত সমাজ নারীর রূপ, যৌবন, শরীর ও কলাকে ভোগ্যবস্তুর মতো ব্যবহার করেছে যুগে যুগে। বহুগামী মনের অধিকারী মানুষ নারীকে পণ্য করে আলাদা বৃত্তির জীব করে রেখেছে। আর নারীকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে কখনও অর্থের অভাবে, কখনও বা তাকে বাধ্য করা হয়েছে এই পথ বেছে নেওয়ার জন্য। এই সকল নারীরা বেশ্যা, পতিতা কিংবা গণিকা। সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে তাদের অংশগ্রহণ অনভিপ্রেত। অর্থাৎ যে নারী একবার এই পথ দিয়ে হেঁটেছে, বা বলা ভাল হাঁটতে বাধ্য হয়েছে, তারই জীবনে ঘনিয়ে এসেছে বিপর্যয়। কালিমালিপ্ত নারীর কালিমামুক্ত হওয়ার কোনও পথই খুলে রাখেনি সমাজ। এই সকল বিপর্যস্ত নারীদের কথা বিশ শতকের সাহিত্যে বারবারই উঠে এসেছে। 'উড়ো মেঘ' উপন্যাসের শিউলির জীবনেও ঘনিয়ে এসেছিল এমনই বিপর্যয়।

পূর্ব কলকাতার এক বস্তি অঞ্চলে শিউলিদের বসবাস ছিল। কিংবা 'ঠিক বস্তি নয়, আধা বস্তি। ছত্রিশ ঘর এক উঠোনও বলা যায়'।[৫] তার মা কানন লোকের বাড়ি-বাড়ি রান্নার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এছাড়া, ছোটখাটো কিছু কাজও তাকে করতে হত সংসার চালানোর জন্য। শিউলির বাবার মৃত্যু হয়েছিল অনেক বছর আগেই। এহেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান শিউলি যখন ষোল বছরের কিশোরী, তখন শ্যাম নামে এক সমাজবিরোধী যুবকের প্রতারণার ফাঁদে ভুল করে পা দিয়ে ফেলে সে। প্রেমের প্রলোভনে ভুলিয়ে শ্যাম, শিউলিকে নিয়ে পাড়ি দেয় আরব সাগরের তীরে। মুম্বইয়ের এক নিষিদ্ধ পল্লীতে শ্যাম বিক্রি করে দেয় শিউলিকে, প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিউলিকে বাধ্য করা হয় এই কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য। এরপর শিউলির ওপর চলতে থাকে নারকীয় অত্যাচার। বারবার শ্লীলতাহানির শিকার হয় সে। অবশেষে, দুই সপ্তাহ পরে একজন নেপালি মেয়ের সাহায্যে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় সে।

অতীতকে ভুলে নতুন জীবন শুরু করতে চায় শিউলি, কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ। শিউলির দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে প্রতিবেশীদের তির্যক দৃষ্টি, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথকে অমসৃণ করে তোলে। এরপর, সংবাদপত্রে এই ঘটনা প্রকাশিত হলে সমাজে তাদের মুখ দেখানোই দুষ্কর হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে, চলতে থাকে দুষ্কৃতীদের শাসানি ও পুলিশের অত্যাচার। এই সমস্ত ঘটনায় মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কানন একদিন আত্মঘাতী হয়। সমাজ থেকে চ্যুত, অনাথ, সহায়-সম্বলহীন শিউলি আশ্রয় পায় দেয়া নামের এক সাংবাদিকের বাড়িতে। কিন্তু, সেখানেও সে স্বস্তি পায়

না। দেয়া বাদে আর সকলেই যেন তির্যক কথায়, আকারে-ইঙ্গিতে, আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে থাকে যে– 'হাজার বার সাবানকাচা করলেও এঁটো মেয়ের কলঙ্ক ধোয় না'।[৬] এরপর, সম্ভবত শিউলিকে কেন্দ্র করেই বাড়িতে কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তির ঘন ঘন আনাগোনা শুরু হয়। এদের মধ্যে দেয়াদের বাড়ির পরিচারিকা লক্ষ্মীদির জামাইও রয়েছে। এছাড়াও, প্রতিবেশীদের অহেতুক কৌতূহল, অশ্লীল মন্তব্য অস্বস্তি বাড়িয়ে দিতে থাকে। এইরকম পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে এবং শিউলিকে মুক্তি দিতে দেয়া তার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে। এই কাজে দেয়াকে সাহায্য করে বন্ধু ঋতম। কিন্তু, শেষপর্যন্ত শিউলির কাতর প্রার্থনায় দেয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শিউলি থেকে যায় দেয়াদের বাড়িতেই। এরপর কেটে যায় আরও অনেকগুলো দিন, আসে সৌম্য-দেয়ার বিবাহবার্ষিকীর রাত। সেই রাতে বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা শিউলিকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর রসালো আলোচনা শুরু করে। এর ফলে, সৌম্য শিউলির ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ে, তার উপস্থিতির কারণেই সৌম্য-দেয়ার সুখের নীড় ভেঙে খানখান হয়ে যেতে দেখে, শিউলি সেই রাতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। শিউলি আবার হারিয়ে যায় জনঅরণ্যের ভিড়ে।

শিউলির পাশাপাশি আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেয়ার জীবনের পরিণতিও অবাক করে পাঠককে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান দেয়া শিক্ষিতা এবং চাকুরিজীবী, পেশায় সে সাংবাদিক। নিজের কাজে একাগ্রতার অভাব নেই এতটুকু। খবরের কাগজের অফিসে সে স্বেচ্ছায় রাতের ডিউটি বেছে নেয়। কিন্তু, একজন মহিলার এই সদিচ্ছা ও সাহসিকতায় যেন অসন্তুষ্টই হয় সহসম্পাদক অশেষ দত্তগুপ্ত– 'মেয়েদের ইভিনিং শিফট করা নিশ্চয়ই অশেষদার পছন্দ নয়। এবং ভাবছে দেয়াই নিয়মটা চালু করাল'।[৭] অবশ্য, কাজের প্রকৃতি ও একঘেয়েমির কথা ভেবে দেয়াই সম্পাদকের কাছে একটা পরিবর্তনের আবেদন জানিয়েছিল। নবীনা সাব এডিটারের এমন আব্দার শুনে প্রবীণ সাংবাদিক রণেন সমাদ্দার কৌতুক বোধ করে বলেছিলেন—

> 'নিউজ পেপারের চাকরি মানে কি শুধুই রোমাঞ্চ, অ্যাঁ? মনে রেখো, সংবাদপত্র আদতে এক বৃহৎ সংসার। একটা বড় সংসারে কম খুঁটিনাটি কাজ থাকে! মেয়েরা ইনবর্ন গৃহিণী, খুঁটিনাটিগুলো তারাই ভাল সামলাতে পারে। ডেইলি কলামের একটাতেও সামান্য গলতি থাকলে কাগজকে কত চিঠি খেতে হয় জানো!'[৮]

তবে, দেয়ার মারফতই তাদের অফিসে একটা পরিবর্তন এল। 'দেয়াকে কাজ

দিয়ে রণেনদাও নিশ্চয়ই বুঝেছেন মেয়েদের আর এলেবেলে করে রাখার মানে হয় না। দেয়া সেটা প্রমাণ করেছে। হ্যাঁ, দেয়াই'।[৯]

এ হেন একনিষ্ঠ, কর্মমুখর দেয়ার কাছে শিউলির জীবনের বিপর্যয়ের খবর পৌঁছে দেয় ঋতম। শিউলির ঘটনা দেয়াকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আর তার মনে হতে থাকে যে, এই ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে পুলিশ-প্রশাসন তথা সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে। সেই কারণেই, ঋতমকে সঙ্গে নিয়ে দেয়া পৌঁছে যায় শিউলিদের বস্তিতে, তাদের সঙ্গে দেখা করে, শিউলির মুখ থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রেকর্ড করে এবং তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে। ঘটনাটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই সবক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। একদিকে যেমন দেয়ার লেখার প্রশংসা হয় সর্বত্র, অপরদিকে পুলিশের তৎপরতাও বাড়ে। কিন্তু এর ফলে শিউলির জীবনে নতুন করে বিপদ নেমে আসে। সত্য ঘটনা জানতে বাকি থাকে না প্রতিবেশীদের কারোরই। এইরকম পরিস্থিতিতে মানসিক স্থিরতা বজায় রাখতে না পেরে শিউলির মা কানন আত্মঘাতী হয়। অথচ, সকলের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, দেয়ার জন্যেই কাননের এই পরিণতি। তাই, নৈতিক দায়িত্বের কথা মাথায় রেখেই শিউলির দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় দেয়া, আশ্রয় দেয় নিজের বাড়িতে। কিন্তু, সেখানেও শিউলি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে না। এর পাশাপাশি হারিয়ে যেতে থাকে দেয়ার স্বাচ্ছন্দ্যও। শিউলিকে সকলেই সন্দেহের চোখে দেখে, তার মতো অসহায় মেয়েকে ঘরে স্থান দেওয়া সত্ত্বেও সকলের কাছে অপমানিত হতে থাকে দেয়া। শিউলিকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঋতমের সাহায্য নেয় দেয়া, ডায়মন্ড হারবারের কাছে একটা হোমে শিউলির থাকার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে। কিন্তু, শেষমুহূর্তে বেঁকে বসে শিউলি, তার মনে হতে থাকে এই দুনিয়ায় দেয়াই তার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী, একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। দেয়াকে আঁকড়ে ধরেই সে বাঁচতে চায়, দয়ালু হৃদয়সম্পন্ন দেয়াও পারে না তাকে দূরে সরিয়ে দিতে। ফলে, আবারও শুরু হয় সংঘাত, নিত্যদিন কর্মক্ষেত্রে, বন্ধুমহলে দেয়াকে হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও, তার এই কাজের প্রশংসা অনেকেই করে থাকে, তবু তাদের বাচনভঙ্গির মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে থাকে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর। আবার অনেকের মনে হয়, রাতারাতি নিজেকে বিখ্যাত করার জন্যই দেয়া এই কাজ করেছে। ধীরে ধীরে সৌম্য এবং দেয়ার দাম্পত্য সম্পর্কেও চিড় ধরতে থাকে এই ঘটনার সূত্র ধরেই। অপরদিকে, শিউলিকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব ঋতম নিলে, তাকেও সন্দেহের বশে অপমান করে সৌম্য। ফলে,

দেয়া-ঋতমের বন্ধুত্বের সম্পর্কেও আসে শিথিলতা। এরপর, দেয়া-সৌম্যর বিবাহবার্ষিকীর রাতে তাদের বন্ধুরা শিউলিকে নিয়ে অশ্লীল আলোচনায় মশগুল হলে তা সৌম্যর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এইরকম পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ সৌম্য শিউলিকে ‘বেশ্যা’ সম্বোধন করলে, দেয়াও ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সৌম্যর প্রতি বাক্যবাণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যাঘাত হানে। সৌম্যও তাকে জানিয়ে দেয়– ‘আমার কথা শুনে থাকতে পারো তো থাকবে, নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব’।[১০] এই ঘটনার পর শিউলি সেই রাতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরদিন দেয়া তাকে খুঁজতে বেরোয় পথে, সঙ্গে নিজেকেও।

বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও শিউলিকে কোথাও খুঁজে পায় না দেয়া। ‘ইচ্ছে করে হারিয়ে গেলে আর কি শিউলিদের সন্ধান পাওয়া যায়?’[১১] কিন্তু, শিউলিকে খুঁজে না পেলেও সংসারজীবনে নিজের অবস্থান আবিষ্কার করতে পারে দেয়া। দাম্পত্য-জীবনে তার ভূমিকা কতটুকু, তার নিজের ইচ্ছা; ইচ্ছার আদৌ কোনও দাম আছে কিনা সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় দেয়ার কাছে। মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যে সংসারটাকে সে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে, সেই সংসার থেকে দেয়াকে বিতাড়িত করার কথা ভাবতে সৌম্যর বাঁধে না। আসলে, সৌম্য কোনদিন দেয়ার বিশ্বাসটাকেই সম্মান করতে পারেনি, সৌম্যর প্রতি দেয়ার বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে– ‘আমার বিশ্বাসটাকেই যদি তুমি সম্মান করতে না পারো, তাহলে মিছিমিছি সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে কী লাভ?’[১২] সে আরও বলে– ‘ভালবাসাও ক্ষয়ে যায়, ভালবাসাতেও পলি পড়ে। তখন যা থাকে, তা হল অ্যাডজাস্টমেন্ট। বোঝাপড়া। পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে শেখা। ওই বোঝাপড়াই আবার আস্তে আস্তে একটা নতুন ধরনের ভালবাসার জন্ম দেয়’।[১৩] দেয়া যেন নিজেকে এবং সৌম্যকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তাদের ক্ষেত্রে এই বোঝাপড়া ছিল একতরফা। দেয়া সৌম্যর ওপর নির্ভর করতে পারলেও, সৌম্য দেয়ার ওপর নির্ভর করতে পারেনি। বিয়ের প্রথম থেকেই সৌম্যর চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দিয়ে এসেছে দেয়া। সৌম্যর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নিজের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু তার নিজের কোনও চাহিদাই বিশেষ মূল্য পায়নি সংসারে। আধুনিক সময়ের নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনেও স্বামীই হয়ে উঠেছে সর্বেসর্বা।

এই ধরনের প্রতিকূলতা যে কেবল দেয়ার জীবনেই এসেছে, তেমনটা নয়। দেয়া

ও শিউলির পাশাপাশি আলোচ্য উপন্যাসের পরিসরে আরও অনেক নারী চরিত্রের সমাগম হয়েছে এবং তাদের জীবনকেও গ্রাস করেছে ছোটবড় সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা। এই ধরনের প্রতিকূলতা দেখা গিয়েছিল দেয়ার সহকর্মী জয়শ্রীর জীবনে, যেখানে জয়শ্রী রাতের ডিউটি বেছে নিতে দ্বিধা বোধ করে শ্বশুরবাড়ির রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে। ঋতমের স্ত্রী শ্রাবণী কলেজের অধ্যাপিকা, বোহেমিয়ান চরিত্রের ঋতম বাঁধাধরা কাজকর্ম করার থেকে সাহিত্যচর্চাতেই বেশি আগ্রহী। অর্থাৎ এককথায় ঋতমদের সংসার চলে শ্রাবণীর উপার্জিত অর্থেই। এইরকম পরিস্থিতির জেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ঋতমের মা অতসী। ঘরে-বাইরে হাজার মানুষের হাজার রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে শ্রাবণীও কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগে কিংবা হয়তো সমাজই তাকে হীনমন্যতায় ভুগতে বাধ্য করে। অর্থাৎ আধুনিক নারী হওয়া সত্ত্বেও চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে মেয়েরা আজও যে তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না, তা স্পষ্ট হয়ে যায় এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ঋতমের স্বগতোক্তিতেও তা স্পষ্ট– ‘নাহ্, মেয়েরা পারে না! মেয়েরা এখনও পারে না। সৌম্য যদি ঋতম হত, দেয়াও কি একই হীনমন্যতায় ভুগত? হয়তো’।[১৪] দেয়ার দাদার স্ত্রী মহুয়া উচ্চশিক্ষিতা হলেও, কিছুটা সাংসারিক চাপের কারণেই উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিতা। দেয়ার মা তার পুত্রবধূর পড়াশোনা করার বিষয়টিকে খুব একটা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। ‘কিংবা হয়তো ফিলজফি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে জীবনভর সংসার ঠেলতে হল বলে মার মনে কোনও গোপন বেদনা রয়ে গেছে। বউকে খাঁচায় আটকে দুঃখটা উশুল করতে চায়’।[১৫] হয়তো সাংসারিক কারণে নিজেকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল একদিন, সেই ত্যাগই স্বীকার করাতে চায় দেয়ার মা তার পুত্রবধূকে দিয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক বিবাহিতা নারীকেই কিছু না কিছু সহ্য করতে হচ্ছে, কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হচ্ছে, কিছু না কিছু বদলে ফেলতে হচ্ছে। এই সকল উদাহরণ থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে– ‘মেয়েদের এই বদলটাই কি বিয়ে?’[১৬] আবার ঋতম তার একটি বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থানটিকে অনেকখানিই স্পষ্ট করে তোলে। সে তার দিদির চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, এই দুনিয়ায় নারীর নিজস্ব বলতে কিচ্ছু নেই, এমনকি নিজের বাসস্থানও নেই। তার আছে ‘শ্বশুরবাড়ি’ এবং ‘বাপের বাড়ি’, কিন্তু নিজের বাড়ি কোথায়? পিতৃতন্ত্র নির্ধারিত এই নিয়মকে আজন্মকাল ধরে নির্দ্বিধায় মেনে চলেছে নারী সমাজ। আসলে, ‘পিতৃতন্ত্রটা যে কীভাবে মজ্জার ভেতর ঢুকে আছে, সেটা মেয়েরাই বুঝতে পারে না’।[১৭]

এই ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা যে কেবল বিবাহিতা নারীর জীবনকেই গ্রাস করে, তেমনটা নয়। অবিবাহিতা কিশোরীর জীবনকেও গ্রাস করতে পারে এই ধরনের প্রতিকূলতা, যার জ্বলন্ত উদাহরণ হল শিউলির জীবনের বিপর্যয়। আবার শিউলির জীবনের বিপর্যয় যে কেবল ষোড়শী বালিকার জীবনেই আসে বা আসতে পারে তেমনটা নয়, যে কোনও নারীর জীবনেই যে কোনও সময়ে নেমে আসতে পারে যে কোনও ধরনের সামাজিক প্রতিকূলতা। তা-ই যদি না হয়, তাহলে কীভাবে দেয়ার বাড়ির পরিচারিকা লক্ষ্মীদি শিউলির জীবনের দুর্ঘটনাকে নিজের ও তার দুই কন্যা সন্তানের জীবন দিয়ে অনুভব করতে পারল? আর কীভাবেই বা দেয়ার মতোই স্নেহ অনুভব করল শিউলির প্রতি?

আলোচ্য উপন্যাসের পরিসরে মূলত দু'জন নারীর বিপর্যস্ত জীবনের কাহিনি বর্ণিত হলেও এই ঘটনা যে কেবল দু'জন নারীতেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। আসলে, শিউলি এবং দেয়া, দুজনেই সমসাময়িক সময়ের প্রতিনিধি। তাদের জীবনের ঘটনা তাই সমকালীন সময় ও সমাজকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট। ঔপন্যাসিক সুচিত্রা এখানে একজন নারীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন অপর এক নারীর হাতে। কিন্তু, এর ফলে শিউলি এবং দেয়া দুজনেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছে প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছে। শিউলির জীবনের বিপর্যয়ের জন্য যে শিউলি কোনওভাবে দায়ী নয়, কিংবা এই ধরনের দুর্ঘটনার জন্য যে কোনও নারীই কোনওভাবে অপরাধী নয়, তা যেন বুঝে দেখার চেষ্টাই করে না সমাজ। এমনকি, যে সকল নারী এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি, তারাও অনেক সময় বুঝে দেখার চেষ্টা করে না যে এই বিপর্যয় তাদের জীবনেও কখনও আসতে পারে। সমাজবিরোধীদের এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদে সোচ্চার হতেও বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি উপন্যাসের পরিসরে। কিন্তু একজন অসহায়, বিপর্যস্ত নারীকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে, অস্পৃশ্য করে দিতে তাদের এতটুকু বাঁধে না। আসলে পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত নিয়ম-সংস্কার তাদের মজ্জায়-মজ্জায় এমনভাবেই প্রোথিত যে, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ তাদের আর খোলা নেই। আবার, এমনটাও হতে পারে যে এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে সমাজ তাকে কঠোরভাবে দমন করতে বদ্ধপরিকর। দেয়ার জীবনের পরিণতি থেকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। সব ধরনের সংস্কারের ঊর্ধ্বে গিয়ে দেয়া শিউলিকে আশ্রয় দেয় নিজের বাড়িতে। আর এই ঘটনার সূত্র ধরেই পরিবারের অন্দরে নিজের অবস্থানটা

তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে– 'নারী তুমি কেউ নও। যতই তুমি আধুনিকা সাজো, তুমি সেই একটি খোটায় বাঁধা গোরু'।[১৮] অর্থাৎ সময় যতই আধুনিক হোক না কেন, মেয়েদের জীবন-যাপন 'পিতৃতন্ত্র' নামক বিশেষ ব্যবস্থার অধীনেই। 'এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে মেয়েদের চিন্তাভাবনা, চলাফেরা, পোশাক-আশাক, আড্ডা-গল্প, হাসি-কান্না নিয়ন্ত্রিত হয়'।[১৯] এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের প্রয়োজনমতো নারীকে ব্যবহার করবে, প্রয়োজনমতো সম্মান করবে, প্রয়োজনমতো দমন করবে। এর অন্যথা হলেই নারী হবে প্রতিকূলতার শিকার। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, সর্বত্রই অবহেলিত নারীরা, সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে তাদের প্রতি অসাম্যের দৃষ্টি। তাদের প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের সঠিক বিচার থেকে তারা বঞ্চিত হয় বারবার, বিচারের বাণী যেন কেঁদেই চলে নীরবে নিভৃতে।

'উড়ো মেঘ' উপন্যাসের পরিসরে কেবল নারীর সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার দিকটি দেখিয়েই ঔপন্যাসিক লেখনী স্তব্ধ করেননি, সেখানে নারীদের আত্মমুক্তির প্রয়াসও লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই প্রয়াস যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছে শিউলির মধ্যে, তেমনই লক্ষ্য করা গিয়েছে দেয়ার আচরণের মধ্যে দিয়েও। সমাজ যখন শিউলিকে পতিতা বলে অপসৃত করে তখন শিউলি আশ্রয় পায় দেয়াদের বাড়িতে, প্রথমে আড়ষ্টতা থাকলেও পরে শিউলি অনেকটাই নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তাদের বাড়িতে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে সে করে আত্মমুক্তির সন্ধান। কিন্তু, তার জীবনে আবারও নেমে আসে বিপর্যয়, দেয়া-সৌম্যর সুখের সংসার তার জন্যেই ভেঙে যাচ্ছে দেখে সে আবার পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে, দেয়া ও সৌম্যকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতেই হয়তো সে এমন একটা কাজ করে বসে, হয়তো সে নিজেকেও গ্লানির হাত থেকে মুক্তি দিতেই চায়, সেইসঙ্গে খুঁজে দেখতে চায় নিজেকেও। শিউলি আত্মমুক্তির সন্ধান করেছিল কিনা, সে ইঙ্গিত অবশ্য স্পষ্ট নয়, কিন্তু দেয়া যে আত্মমুক্তির সন্ধান করেছিল এবং শেষপর্যন্ত একটা দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিল, তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের পরিসরে। শিউলি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দেয়া তাকে খুঁজতে বেরোয় পথে, অনেক খুঁজেও তাকে কোথাও না পেলে ব্যর্থ মনোরথে বাড়ি ফিরে আসে দেয়া এবং সৌম্যকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, সে আর সৌম্যর সঙ্গে থাকবে না। কারণ, সংসারে নিজের অবস্থান দেয়ার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিউলির মতো অসহায় মেয়েকে ঘরে আশ্রয় দিয়ে দেয়া যে কোনও অন্যায় করেনি সেই বিষয়ে দেয়া নিশ্চিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেয়াকে

প্রতি মুহূর্তে হাজারও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সহ্য করতে হয় অপমান। তবু, সে সবকিছু সহ্য করে নিয়েছিল পরিবারের অন্দরে তার সম্মান আছে এই কথা ভেবে। কিন্তু, যেদিন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সংসারে কেবল সৌম্যর চাওয়া-পাওয়া, সৌম্যর সিদ্ধান্তর মূল্য রয়েছে, সেদিনই দেয়া উপলব্ধি করতে পারল এই সংসারে সে মূল্যহীন। সৌম্য চায় তার এবং দেয়ার ভালবাসাটা হবে নিঃশর্ত, কিংবা সেটা হবে কেবল সৌম্যর নিজের শর্তে, দেয়ার কোনও গুরুত্বই নেই সেখানে। তাই, দেয়া নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে এবং জানিয়ে দেয় যে সে আর সৌম্যর সঙ্গে ঘর করবে না। এই ঘটনার পরেও সৌম্য দেয়ার চলাফেরার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করে, দেয়াকে পরামর্শ দেয় 'বাপের বাড়ি' থেকে ঘুরে আসার জন্য। কিন্তু, দেয়া তাকে জানিয়ে দেয়—

> 'আমি কোথায় যাব না যাব, তুমি ঠিক করে দেবে?...; আমিই যাব সেটা ধরে নিচ্ছ কী করে? ...তুমি চলে যেতে পারো। সব সময়ে মেয়েদেরই ঘর ছাড়তে হবে তার তো কোনও মানে নেই। এ সংসার তুমি একা গড়োনি। এটা যতটা তোমার বাড়ি, ততটাই আমারও। এখানে আমি আবার একটা শিউলিকে নিয়ে আসতে পারি, তেমন হলে আবার আর একটা... তোমার না পোষালে তুমি...'[২০]

দেয়ার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারী কেবল সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার শিকার হওয়ার জন্যই পৃথিবীতে অবস্থান করে না, প্রয়োজনে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদীও হতে পারে। সকল নারীর পক্ষে সবসময় হয়তো তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, একইরকম মানসিক দৃঢ়তা হয়তো সকলের থাকে না, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে হয়তো সবাই বেরিয়ে আসতে পারে না, কিন্তু নারী যে নিজের মুক্তির সন্ধান করতে পারে এবং নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে সক্ষম হতে পারে, সেই বার্তাই যেন ঔপন্যাসিক দিতে চেয়েছেন 'উড়ো মেঘ' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১) রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী, 'প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১৯৪

২) ঐ

৩) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'উড়ো মেঘ অলীক সুখ', আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ মার্চ ২০১৪, পৃ. ১৫৫
৪) ঐ, পৃ. ১২৩
৫) ঐ, পৃ. ১৩৬
৬) ঐ, পৃ. ১৮৪
৭) ঐ, পৃ. ১১৯-১২০
৮) ঐ, পৃ. ১২০
৯) ঐ, পৃ. ১২১
১০) ঐ, পৃ. ২৬০
১১) ঐ, পৃ. ২৬১
১২) ঐ, পৃ. ২৬৩
১৩) ঐ
১৪) ঐ, পৃ. ২১২
১৫) ঐ, পৃ. ১৬২
১৬) ঐ, পৃ. ১৪০
১৭) ঐ, পৃ. ২০৪
১৮) ঐ
১৯) রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী, 'প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬, পৃ. ৯
২০) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'উড়ো মেঘ অলীক সুখ', আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ মার্চ ২০১৪, পৃ. ২৬৪

গ্রন্থপঞ্জি :

১) নবেন্দু সেন, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ মে ২০১৬
২) রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী, 'প্রসঙ্গ: মানবীবিদ্যা', উর্বী প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬
৩) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'উড়ো মেঘ অলীক সুখ', আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ মার্চ ২০১৪

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' : এক নাগরিক জীবনের রূপায়ণ

দিলরুবা খাতুন *

সারসংক্ষেপ : বিশ শতক, বিশ্বায়নের যুগ– পণ্যায়ের যুগ, ভোগবাদ পুঁজিবাদের যুগ। মানুষ অর্থের পিছনে ছুটতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে তার অবসর, হারিয়ে ফেলে বিবেক, নীতিবোধ, মূল্যবোধ। মানুষের মেরুদন্ড থেকে শুরু করে সবকিছুই যেন অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। তাই সুবিধাবাদী মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের এই ছবি ধরা পড়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে ভরা স্টেশন চত্বরে প্রকাশ্যে রমিতার শ্লীলতা হানি করে চারজন যুবক। জনতা সিনেমার দৃশ্য দেখার মতোই নীরব হয়ে দেখতে থাকে। তবে রমিতাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে ঝিনুক। তারা থানায় ডায়েরি ও করে। শেষ পর্যন্ত রমিতার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ রমিতাকে করতে দেয় না তার আপনজনেরাই। ঝিনুকের প্রতিবাদকেও কেউ সমর্থন করে না। তাকে শেষ পর্যন্ত চরিত্রহীন বলে প্রতিপন্ন করা হয়। এই অন্তর দহনে দগ্ধ হয়েছে রমিতা ও ঝিনুক।

সূচক শব্দ : আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদ, অবক্ষয়, নীতিহীনতা, পুঁজিসর্বস্ব, মেরুদণ্ডহীনতা, ক্ষমতার অপব্যবহার।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) বিশ শতকের এক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বিশ শতকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের দৌলতে এসেছে পুঁজিবাদ, ভোগবাদ। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতি ছেড়ে মেধাকে সম্বল করে পুঁজিবাদের বাজারে নিজেকে

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বলরামপুর কলেজ, বলরামপুর, পুরুলিয়া।
e-mail: dilrubakhatun41190@gmail.com

বিক্রি করেছে। এই আত্ম বিক্রয়ে এলো অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি। কিন্তু মানুষ হারিয়ে ফেলল নিজের নীতিবোধ, বিবেক, মানবিকতা। প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় মানুষ দৌড়াচ্ছে শুধু আরো বেশি টাকা উপার্জনের আশায়। সে টাকা যদি অসৎ পথে আসে, তাতেও কোন বিবেকবোধ বাধা দেয় না। সন্তান সাহচর্য আর সময়ের পরিবর্তে পাচ্ছে টাকা, লাগাম ছাড়া ইচ্ছা পূরণ। ফলে উচ্ছৃংখল জীবনযাপন তরুণ প্রজন্মের, যাদের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। আর এই অস্থির সময়ে কলকাতা শহরে ঘটে যাওয়া এক অশোভন ঘটনাকে অবলম্বন করে নির্মিত উপন্যাস 'দহন'।

সময়ের এই স্বরলিপিকে ধারণ করে 'দহন' উপন্যাস হয়ে উঠেছে সমকালের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ন। বিশ্বায়নের, পণ্যায়নের যুগে নারীর শরীরও যেন এক পণ্য। তাই নারীকে অর্ধনগ্ন করে বিজ্ঞাপনে, সিনেমায় টিভি শো-এ। মুক্ত আমোদ প্রমোদে অশ্লীল টিভি শো অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পায়। লেখিকার কথায়– 'পাঁচ সাত বছর আগেও এ ধরনের দৃশ্য ঘরে বসে দেখতে নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ জাগত। এখন সব জলভাত'[১] পুঁজিবাদী পৃথিবীতে সুখ পাওয়ার আশায় মানুষ টাকার পিছনে ছুটে চলে। এই ছুটে চলার না আছে শেষ, না আছে অবসর। তার উপার্জনের টাকায় পরিবারের অন্যান্যদের চাহিদা পূরণ হলেও তার কোন সুখ থাকে না। যাকে ভোর রাত্রে কাজে বেরিয়ে গভীর রাতে ঘরে ফিরতে হয়, তার জন্য হাত-পা ছড়িয়ে সুখে থাকা কথাটা যেন একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা। এই উপন্যাসে ঝিনুকের বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলে উপার্জনের আশায়। তাঁর ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটার বিনিময়ে পরিবারের প্রয়োজন মিটলেও সে কি আদৌ সুখী? ঝিনুকের ভাবনায়...

> 'যার জীবনে কাঠবিড়ালির ঘাসের নিচে বাদাম লুকানোর মনোরম দৃশ্য দেখার অবসর নেই সে কিসের সুখী। যে মানুষ দুপুরে গঙ্গার বুকে কোনদিন কোটি তারার ঝলকানি দেখার অবকাশ পাই না তার কোথায় সুখ।'[২]

পুঁজিবাদ আর পণ্যায়ন মানুষকে বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্বেষী করে তোলে। তাই স্টেশন চত্বরে প্রকাশ্যে মানুষের ভিড়ের মাঝেও যখন চারজন যুবক রমিতার শ্লীলতাহানি করে তখন জনতা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। যেন কোন সিনেমার শুটিং চলছে। কেউ সাহস করে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। ভিড়ের মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠলেও যেন জ্বলে উঠেই নিবে যাচ্ছে। মাঝ বয়সী এক লোকের মন্তব্য জিন্স পরা মত্ত যুবকের লাথিতেই পলকে স্তব্ধ। 'প্রতিপক্ষ হীন মানুষের জঙ্গলে নির্ভীক

বীরের দল এবার উল্লাসে মেতে উঠেছে'।[৩] ঝিনুক একটু দূর থেকে এসব দৃশ্য দেখে প্রথমে হতবাক হয়ে যায়। তারপর সে এগিয়ে এসে তার ভারি ব্যাগ এলোপাথারি ঘুরিয়ে যুবকদের মারতে থাকে। ঝিনুক ও আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। তবুও সে কোনক্রমে রমি তাকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করে। উপস্থিত জনতার দিকে চেয়ে তীব্র ঘৃণায় ঝিনুক চেঁচিয়ে ওঠে। 'আপনারা এতগুলো লোক হাঁ করে দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সকলের চোখের সামনে একটা মেয়েকে এভাবে...'[৪]

রমিতার স্বামী পলাশ হাঁপরের মতো হাপিয়ে উঠে বলতে থাকে নোংরা, নোংরা হয়ে গেছে শহরটা 'অবয়বহীন ভিড় টাকে হিংস্র চোখে দেখছিল ঝিনুক। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনেক তো মজা দেখলেন এবার অন্ততঃ থানায় চলুন'।[৫] কিন্তু কেউ তাদের সঙ্গে থানায় যায় না। পলাশ-রমিতাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় ডায়েরী করে ঝিনুক।

যেখানে বিবেক, মানবিকতার অপমৃত্যু সেখানে ঝিনুকের এই মানবিক কাজে খবরের কাগজ থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে প্রচুর অভিনন্দন আসতে শুরু করে। অভিনন্দনের জোয়ারে গা ভাসাতে থাকে ঝিনুক নিজেও। সেও বেশ আত্মগর্ব অনুভব করে। সে ভুলে যায় রমিতার খবর নেওয়ার কথা। ঝিনুকের বাবা-মা ও গর্ব অনুভব করে। তবে ঝিনুকের ঠাকুমা ঝিনুকের মাকে বলে–

> 'বারবার ওকে বেপরোয়া বাহাদুর কেন বলছ বৌমা? সাংঘাতিক বাহাদুরির কি কাজ করেছে ঝিনুক?...
>
> ...ওদিন এর থেকে কম আর কি করতে পারতো ঝিনুক? একটা স্বাভাবিক মানুষের যা করা উচিত ঝিনুক তো তাই করেছে।'[৬]

নাগরিক জীবনে যেখানে মানুষ নিজেরটুকু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না সেখানে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যায় দেখাটাই স্বাভাবিক। মেরুদন্ড না থাকাটাই স্বাভাবিক।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে দাঁড়িয়ে সন্তানের অপরাধ ঢাকতে ক্ষমতার প্রভাব খাটায় অভিভাবকেরা। উচ্ছৃংখল যুবক সমাজ তাই অপরাধ করতে ভয় পায় না। কারণ পিতা মাতার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য। রমিতার শ্লীলতাহানি করে যে চারজন যুবক, ঝিনুকের বর্ণনায় তাঁরা–

> 'এখন এক ধরনের ক্লাস তৈরি হয়েছে না, দামি দামি জামা কাপড় পরে, দেদার টাকা ওড়ায়, টকা টক ইংরেজি বলে মোটরসাইকেল মারুতি নিয়ে, ফুর্তি মেরে

বেড়াচ্ছে... রাস্তাঘাটে এরকম ছেলে আজকাল প্রচুর দেখতে পাবেন।'[৭]

পিতা-মাতার অর্থ উপার্জনের নেশায় তাদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সন্তানরা। বিনিময়ে তাদের দিচ্ছেন বিলাসিতা, প্রচুর টাকা। স্কুলের ছোট্ট শিশুর পকেট থেকেও ঝিনুক পায় ১০০ টাকা। অভিভাবককে এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ করলে তিনি বলেন– 'আমার ছেলের পকেটে ৫ টাকা থাকবে কি ৫০০ টাকা থাকবে সেটা দেখাও কি আপনাদের বিজনেস।'[৮]

বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে নারী চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে কর্ম জগতে পা রেখেছে। চাকরি করছে, অনেক ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ করছে। কিন্তু নারী কী সত্যি স্বাধীন হতে পেরেছে? তার উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার সত্যিই কি তার রয়েছে? এই প্রশ্নই বারবার ঘুরপাক খেয়েছে 'দহন' উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে ঝড় বৃষ্টির রাতে ভরা স্টেশন চত্বরে লোকজনের সামনেই রমিতার শ্লীলতাহানি করে চারজন যুবক। তার স্বামী পলাশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকেও মারধর করা হয়। জনতা সেখানে নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে। সেই যুবকরা রমিতাকে কিডন্যাপিনের চেষ্টাও করে। কোনভাবে ঝিনুক বাঁচিয়ে নেয় রমিতাকে। এরপর ঝিনুকের কথা মতো তারা থানায় ডায়েরিও করে।

কিন্তু এই থানায় ডায়েরি করা নিয়ে রমিতার শ্বশুরবাড়িতে আপত্তি ওঠে। তাদের কাছে রমিতার সম্মানের চেয়ে তাদের বংশ মর্যাদা বড় হয়ে ওঠে। রমিতার শাশুড়ি বলে ওঠে আমরা তো জামা কাপড় সিনেমা থিয়েটার শপিং কোনো ব্যাপারে রমিতার স্বাধীনতায় হাত দিই না, সেই মেয়ের কি উচিত ছিল না থানায় রিপোর্ট লেখাতে যাওয়ার আগে একবার আমাদের কথা ভাবা। তার স্বামী পলাশও এক বিছানায় শুয়ে ও রমিতার বুকের গরগর আওয়াজ শুনতে পায়নি, রমিতার ক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ লাগানো দূরের কথা। ওই মস্ত যুবকদেরকে থানায় আইডেন্টিফাই করতে যাওয়ার কথা রমিতাকে সে জানায়নি, তাকে নিয়েও যায়নি। সে থানায় যেতে বিরক্ত বোধ করেছে– 'ভদ্রলোকের ছেলেদের রোজ রোজ থানায় যেতে ভালো লাগেনা। পুলিশের কাছে বারবার স্টেটমেন্ট দিতেও না।'[৯]

ঝিনুক থানায় এসে তদন্ত করে কেস ঠিক মতো এগোচ্ছে কিনা। এতে বিরক্ত হয় পলাশ। রমিতা পলাশের চেয়ে শ্রবণাকে বেশি ভরসা করে। শ্রবণা তার বউকে রক্ষা করেছে যেটা সে পারেনি এটাই তার মেল ইগোতে লাগে। পলাশ শ্রবণা সম্পর্কে

বলে– 'মিনিমাম ফেমিনিন ডিগনিটিটা নেই। থানায় আবার পুলিশকে চাপ দিচ্ছিল কিডন্যাপিং চার্জটাকে ভালোভাবে স্ট্রেস দেওয়ার জন্য।'[১০]

রমিতা আচমকাই বলে ফেলে– 'ভুল কি বলেছে? কিডন্যাপিংই তো করতে চেয়েছিল ওরা। মোটরসাইকেলে তুলতে যায়নি?'[১১]

এতে পলাশের চোখ হয় কুটিল, সে হয়ে ওঠেন নির্মম– 'এখনো বুঝি ছেলেগুলোর ছোঁয়া ভুলতে পারোনি? পলাশের কণ্ঠ ঘাতকের মত নির্দয়। মত্ত হস্তির দাপটে চূর্ণ করছে রমিতার প্রতিরোধ। রমিতা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। পোড়া কাঠের মত পড়ে থাকা তার শরীরটার উপর পৌরুষ বর্ষণ করে চলেছে পলাশ। উন্মাদের মত বিড়বিড় করে চলেছে দেখি কোন শ্রবণা সরকার তোমাকে বাঁচাতে পারে। দেখি। দেখি।'[১২] –এখানে যেন পলাশের সঙ্গে ওই যুবকগুলোর আদতে কোন তফাৎ নেই।

রমিতা শ্বশুরবাড়ির লোক চাই না শ্লীলতাহানির মতো সেন্সেটিভ ঘটনা নিয়ে কোর্ট কাছারি হোক। তারা এমনভাবে রমিতাকে দেখে যেন সব দোষ রমিতারই। তার মাসি শাশুড়ির কথায়– 'তোমরা আজকালকার মেয়েরা একটা কথা মানতে চাও না। নিজেদের সম্মান নিজেদের হাতে। কোর্ট কাছারিতে গিয়ে একগাদা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অপমানের কথা ঘোষণা করলে এমন কিছু সম্মান বৃদ্ধি হয় না। নিজেদেরই সামলে সুমলে চলতে হয়।'[১৩] রমিতাকে বাধ্য করা হয় কোর্টে মিথ্যা বয়ান দিতে। ছেলেগুলোকে দেখে শাস্তি দেবার প্রচন্ড ইচ্ছা মনে পোষণ করেও তার শ্বশুরের উকিল বন্ধুর শেখানো বুলি তাকে আওড়াতে হয়। ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেও বলতে হয় তিনি অন্ধকারে তেমন কাউকেই দেখতে পাননি। তার নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ তাকে করতে দেয় না তারই শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

অন্যদিকে ঝিনুক যিনি রমিতার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত তার পরিবার কিংবা ভালোবাসার মানুষ কাউকেই পাশে পাননি। ঝিনুকের বারবার থানা কিংবা কোর্টে যাওয়া নিয়ে তাদের আপত্তি। তাদের মনে হয় 'মেয়েমানুষ' হয়ে এতটা করা ঠিক নয়। ঝিনুকের মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে– 'লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরি করতে দেওয়া হয়েছে, তাতেই কি তুমি পুরুষ মানুষের সমান হয়ে গেলে নাকি?'[১৪]

ঝিনুকের ভালোবাসার মানুষ তুনীরও বলেছেন– 'এ কেস থেকে তুমি নিজেকে

অ্যালুফ করে নাও ঝিনুক। কার না কার নোংরা একটা কেসে এত বেশি নিজেকে জড়িয়ে ফেলা তোমাকে মানায় না ঝিনুক।' তুনীর শুধুমাত্র একটা প্রমোশন পাওয়ার লোভে ঝিনুককে তার লড়াই থেকে সরে আসার কথা বলেছে।'[১৫] তবুও অসম্ভব মনের জোর নিয়ে ঝিনুক কোর্টে গিয়েছে সাক্ষী দিতে। কিন্তু কথার মারপ্যাঁচে আসামী পক্ষের উকিল তাকে চরিত্রহীন বলে প্রমাণ করেছে। ঝিনুকের ঠাকুমা মৃণালিনী দেবী ঝিনুককে কঠিন বাস্তবের কথা বলে– 'হ্যাঁ তোরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন, মিলিটারিতে যাচ্ছিস, হিমালয়ে উঠছিস, পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখছিস, চাকরি করছিস। তবু বুকে হাত দিয়ে বলতো সত্যি কতটা ছাড় পেয়েছিস তোরা? এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই জমি পাবি তোরা?'[১৬]

আর কোন মেয়ের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারলেও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবে না তারই বাড়ির লোক। ঘটনাটি চেপে দেওয়া হয় মেয়েটিরই নামে কলঙ্ক রটার ভয়ে। উপন্যাসে তাই লেখিকার প্রশ্ন– 'কোন পুরুষবাহিত অনভিপ্রেত ঘটনায় কেন শুধু মেয়েদের গায়েই কালি লাগে? মেয়েরা কী? মন বিহীন মস্তিষ্ক বিহীন শুধুই একটা শরীর? একটা জঠর? গর্ভাশয়?'[১৭] বিশ শতকে আমরা বাহ্যিকভাবে আধুনিক হলেও আমাদের ভেতরে যেন বয়ে চলেছে মধ্যযুগীয় এক পঙ্কিল স্রোত। তাই রমিতার শ্লীলতাহানি নিয়ে ঝিনুকের স্টাফ রুমের কোন কোন শিক্ষিকাই তার পোশাক-আশাক নিয়ে আলোচনা করে। জানতে চায় তার পোশাক উত্তেজক ছিল কিনা? আর রমিতার শাশুড়ি, যিনি চালচলন পোশাক আশাকে আধুনিক হলেও তিনি মনে করেন মেয়েদের গায়ে একটা দাগ লাগলেই সে আজন্ম খুঁতো হয়ে যায়। আবার ঝিনুকের বন্ধু বিশাখা চাকরি পেয়ে গেলেও তার প্রেমিক এখনও বেকার হওয়ায় তাদের বিয়েটা হয় না। বিশাখা বলে– 'যতই মুখে প্রগতির ঝান্ডা ওড়াক না কেন বউয়ের টাকায় খেতে তার বাঁধবে।

নাগরিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে সাপের মত জড়িয়ে রেখেছে অর্থের লোভ। এই অর্থের পিছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে ফেলছে বিবেক নীতি মূল্যবোধ। আর প্রগতির হাওয়া যেন আমাদের বাহ্যিক পরিবর্তনটাই এনেছে বাস্তবে মানসিকভাবে আধুনিক হয়ে উঠতে পারিনি। এই বাস্তবতাই দহন উপন্যাসের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন' -পৃষ্ঠা-৭
২) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা -১৭
৩) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা -২৮
৪) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-২৮
৫) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-২৯
৬) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা৪২
৭) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৩২
৮) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-১০৪
৯) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৫৬
১০) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৫৬
১১) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৫৭
১২) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৫৭
১৩) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-১৩৫
১৪) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৮৮
১৫) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-১২৮
১৬) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-১৬৬
১৭) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, 'দহন'-পৃষ্ঠা-৮২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১) বন্দ্যোপাধ্যায় কুনাল সম্পাদিত, কথানদী সুচিত্রা (সুচিত্রা স্মারকগ্রন্থ), পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪
২) চক্রবর্তী রামী, কথাসাহিত্যে নারী পরিসর ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৩।
৩) ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, কুড়ি একুশ শতকের নারী ও ঔপন্যাসিক, আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪
৪) ভট্টাচার্য সুচিত্রা, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬
৫) ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮
৬) রায় অলোক, কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২

‘তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী’র আলোকে মুঘল যুগে কাশ্মীরের পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক দিকের একঝলক

মীরসাহেব আনসারী *

সারাংশ : মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বকালে (১৬০৫ খ্রি.-১৬২৭খ্রি.) বহুবার কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তাঁর পঞ্চদশ অভিষেক বছরে (১৬২০) তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় ছিলেন। তাঁর আত্মকথা ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী’তে তিনি কাশ্মীর নিয়ে বিশদে লিখেছেন।এটি মুলত ফারসীতে লেখা এবং এর অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় হয়েছে। এই স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর অভিষেকের উল্লেখসহ বিভিন্ন ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, গাছ-গাছালি ও নানান প্রাণীর কথা উল্লেখ করেছেন। সুবা কাশ্মীরের বারমুলা, শ্রীনগর, কিস্তাওয়ার শহরের ও সেখানকার আবহাওয়ার বর্ণনা এবং নানান পাহাড়, নদী, ঝর্ণার উল্লেখ করেছেন। সেখানকার তুষারপাত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা লিখেছেন। বিভিন্ন বাগান, সেখানকার নানা ফুল ও ফল এবং ফসলের কথাও জানা যায়। তিনি লিখেছেন কাশ্মীরে যে কতরকম ফুল ফোটে তা গুনে শেষ করা যায় না। ওখানকার যব, গম, মসুর ও নানান শস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাফরানের উৎকর্ষতা, এছাড়া বাদাম, আঙ্গুর, আপেল নাশপাতি উৎকৃষ্ট মানের পাওয়া যায়। অন্যদিকে কাশ্মীরিদের খাদ্যাভাস, পোশাক, তাদের দেবদেবী ও রীতিনীতির কথাও জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেছেন। শালীমার সহ বিভিন্ন বাগান এবং ডালহ্রদের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। জলাধারে নানান পরিযায়ী পাখির দেখা মিলত। এছাড়াও তিনি সেখানকার বন্য প্রানী যেমন— চিতা, হরিণ, নীলগাই ,পাহাড়ি ভেড়া ও ছাগলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সর্বোপরি কাশ্মীরের আবহাওয়া মনোমুগ্ধকর, তার বহুল বর্ণনা তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে আমরা জানতে পারি।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জে কে কলেজ, পুরুলিয়া।
e-mail: mirsaheb21@gmail.com

সূচক শব্দ : কাশ্মীর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, তুষারপাত, আপেল, পরিযায়ী পাখি, নানা ফুল, মনোমুগ্ধকর, আবহাওয়া।

ভূমিকা : ভারতের উত্তরে অবস্থিত ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সকল পর্যটকের মনকে আকৃষ্ট করে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সূত্র থেকে তার প্রমান মেলে। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে কাশ্মীরের রাজবংশ ও এই উপত্যকা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। এটি 'বাহার-উল-অস্মার' নামে ফার্সিতে অনুবাদ করান কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিন (রাজত্বকাল ১৪১৮-১৪৭০খ্রি.)। এছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনের অজস্র গ্রন্থ আছে যেগুলি কাশ্মীর সম্পর্কে আলোকপাত করে। যেমন; কাশ্মীরি পণ্ডিত বিলহনের চৌরপঞ্চাশিকা, গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা' ইত্যাদি। আধুনিক বহু পণ্ডিত ও গবেষক কাশ্মীর সম্পর্কে নানা দিক নিয়ে গবেষণা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুমতাজ আহমেদ নুমানি তাঁর থিসিস পেপার "The Ecology and Environment of Kasmir (১৫৮৬-১৮৪৭ A.D)"-এ কাশ্মীর নিয়ে বহু নতুন তথ্য তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে সেখানে 'বন্য পশু ও মুঘল যুগে শিকার' এ বিষয়টির উপর নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। উল্লেখ্য, এখানে মুঘল বাদশাহদের লেখনিতে এবং বিশেষ করে বাদশাহ জাহাঙ্গির তাঁর স্মৃতিতে সেই সময়ের কাশ্মীরকে কি রুপ দেখেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনের কাশ্মীর আর চারশত বছর আগের কাশ্মীরের পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত একটা তুলনা মুলক ধারনা করতে পারবেন। শুধু তাই নয় সেই সময়েও কাশ্মীর যে জান্নাতময় ছিল এবং এই জায়গাটি শক্তিশালী শাসক মাত্রই পেতে চাইতেন তা সমসাময়িক তথ্য থেকে ফুটে ওঠে। যাইহোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় হল কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ কেমন ছিল তা উপলব্ধি করা। বিশেষ করে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭খ্রি.) কাশ্মীরের প্রতি অতি আগ্রহী ছিলেন এবং সেখানকার রুপের টানে প্রায় ঊনিশবার কাশ্মীরে যান। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই- জাহাঙ্গীরী'তে তিনি কাশ্মীরকে নিয়ে বিশদে লিখেছেন। এটি মুলত ফারসীতে লেখা এবং এর অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় হয়েছে। এই স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর অভিষেকের উল্লেখসহ বিভিন্ন ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কাশ্মীরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অনেক বেশি ছিল। সেখানকার রাস্তা-ঘাট, পাহাড়- পর্বত, নদ-নদী, উদ্ভিদ ও প্রানী-জগত আগ্রহের সাথে প্রত্যক্ষ

করেছেন। এই প্রবন্ধটি মূলত তাঁর স্মৃতি-শাস্ত্র থেকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগের কাশ্মীর একজন শাসকের চোখে কেমন ছিল তা ফিরে দেখবো।

সুলতানি যুগের বিখ্যাত কবি ও সভাসদ আমীর খসরু কাশ্মীর সম্পর্কে লিখেছেন— 'গার-বার-রু-ই-যামীনস্ত; হামীনাস্ত, হামীনাস্ত, হামীনাস্ত।' অর্থাৎ কোথায় জান্নাত থাকলে, এখানেই আছে। আমরা কোরানে বর্ণিত জান্নাতের কথা জানি; সেখানে বলা হয়েছে জান্নাতে আছে ছায়াবহুল বৃক্ষ, ঝরনা, সুমিষ্ট ফল, পাখি আর হুর (সুন্দরী রমণী)। হয়তো কাশ্মীরেও তিনি বা তাঁরা এ গুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। যাইহোক, উল্লেখিত সময়ে সেখানকার পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ 'তুজুক-ই-বাবরি'তে এই রাজ্যটি সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'About this procession of men no one has been able to give authentic information in reply to our enquiries and investigations. So far people have been saying that they call these hill-men Kas. It has struck me that as a Hindustani pronounces Shin as Sin and as Kashmir is the one respectable town in these mountains, no other indeed being heard of Hindustanis might pronounce it Kashmir.'[1]

অন্যদিকে পারস্য ভাষায় 'মীর' শব্দে বোঝায় পাহাড় আর 'কাস' শব্দে বোঝায় পাহাড়ের বাসিন্দা। এই অর্থে পাহাড়ের বাসিন্দা। এছাড়াও তিনি লিখেছেন; এখানকার অধিবাসীদের প্রধান ব্যাবসায় হচ্ছে কস্তুরী, পার্বত্য গাইয়ের লেজ, জাফরান, তামা ও সীসা। উল্লেখ্য, কাশ্মীর আফগানদের আধীনে ছিল দীর্ঘদিন। জয়নাল আবেদিন এখানকার খ্যাতনামা সুলতান ছিলেন। আইন-ই-আকবারি থেকে জানা যায়; বাবর যখন হিন্দুস্তান জয় করেন তখন কাশ্মীরে মহম্মদ শাহ্ রাজত্ব করছিলেন, বাবর সেনাপতি প্রেরন করে কাশ্মীর জয় করেন। কিন্তু কাশ্মীরিরা তাদের শাসন করতে দেয় নি।পরে হুমায়ুন মিরজা হায়দরকে কাশ্মীরে পাঠান তিনি দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় জয় করেন।[2] পরে হুমায়ুনের নির্বাসিতকালে তারা আবার মুঘল আধীনতা আস্বীকার করে। ১৫৮৬ খ্রি. সম্রাট আকবর আফগান উইসুফ শাহকে পরাস্ত করে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আকবরও কয়েকবার কাশ্মীরে যান, এসময় পিতার সাথে পুত্র সেলিমও (জাহাঙ্গীর)

পরিদর্শনে সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী ‘তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরীতে’ কাশ্মীর নিয়ে যা লিখে গিয়েছেন তার চিত্র অপূর্ব, বিশেষ করে একজন খাটি ভারতীয় হিসাবে আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে প্রতিটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন।তাঁর চোখে এখানকার পাহাড়, খরস্রোতা নদী, ঝরনা, হ্রদ, বাগবাগিচায় নানান ফুল ও ফল, পাখি এবং পাহাড়ি জীব-জন্তু সবমিলিয়ে যেন জান্নাত নেমে এসেছে মর্ত্যে। এখানকার মনোহর আবহাওয়ার কথা সত্যি অসাধারন।

তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরীর আলোকে কাশ্মীরের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য :

জাহাঙ্গীর তাঁর পিতা সম্রাট আকবরের সাথে কাশ্মীর গিয়েছিলেন আর তখন থেকেই কাশ্মীরে তাঁকে বার বার যেতে হয়েছে প্রকৃতির টানে। তিনি কাশ্মীর যাওয়ার দুটি পথের কথা লিখেছেন এবং যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। তবে ভীম্বর ও পাকলীর রাস্তায় ছিল উত্তম। ভিম্বরের রাস্তা কম হত কিন্তু বরফে ঢাকা থাকত কিন্তু পাকলির পথে বসন্তের সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যেত।[3] জাহাঙ্গীর আকবারনামার নাম উল্লেখ করে লিখেছেন; ‘শেখ আবুল ফজলের হিসাবে কাশ্মীরের দৈর্ঘ্য কিষানগঙ্গা থেকে কম্বরবর পর্যন্ত ১২০ ক্রোশ আর প্রস্থ ১০ থেকে ২৫ ক্রোশ।[4] তবে ‘আইন-ই-আকবরি’তে আবুল ফজল লিখেছেন হিন্দুস্থান থেকে এই সুবায় প্রবেশের ছাব্বিশটি পথ আছে। তবে ঐ দুটি পথেই উত্তম কারণ এই পথে অশ্বারোহণেই যাওয়া যায়। এছাড়া আকবর টীরাপাঞ্জালের পথে তিনবার কাশ্মীর গিয়েছিলেন। সেখানে সম্রাটের আদেশে রাস্তা, বাগান,কাঠের সেতু, মসজিদ,ও প্রাসাদও নির্মিত হয়েছিল। কাশ্মীরের মূল রাজধানীর নাম শ্রীনগর এবং ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর উৎসস্থল বীরনাগ নামক হ্রদ ও পাহাড়ি ক্ষেত্র, এটি রাজধানী থেকে ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে এবং সম্রাটের আদেশে সেখানেও বাড়ী ও বাগান নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া ঝিলাম নদীতে সেই সময় পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি চারটি সেতু ছিল। কাশ্মীরিরা এগুলিকে ‘কদল’ বলে। সম্রাট উল্লেখ করেছেন সুলতান সিকান্দার লোদী এখানে বিরাট একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন।[5]

কাশ্মীর উপত্যকা মূলত দক্ষিণ পশ্চিমে পীর পাঞ্জাল রেঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত এবং আনুমানিক ১৩৫ কিমি দীর্ঘ ও ৩২ কিমি প্রশস্ত। এখানকার প্রধান নদী ঝিলাম আর বৃহত্তম হ্রদ ওয়ালার। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন; ‘এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায় ঝরনাধারা ও স্রোতস্বিনী থেকে। সবচেয়ে সুন্দর হল লার উপত্যকা। এটি

শিহাবুদ্দিনপুর গ্রামের পাশে ঝিলামের কিনারা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ তাঁর সময়ে ঐ নামের গ্রামটি ছিল এবং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ জায়গাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম ছিল বলেই তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ওই গ্রামে একটি জমিতে সোজা ও খুব বড় বড় একশটি চিনার গাছ এবং জায়গাটি খুবই চমৎকার ছিল। আইন-ই-আকবারিতে ঝরনা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে; রেবন শহরে একটা ঝরনা আছে, এদেশের লোকেরা বিশ্বাস করে যে এইখান থেকেই প্রথম জাফরানের বীজ নির্গত হয় এবং এজন্য এদেশের লোকেরা এই ঝরনায় দুধ ঢেলে পুজা করে। অন্যত্র বলা হয়েছে তিব্বত সীমান্তে ছত্রকূট নামক পর্বতে সাপের আবাসভূমি। অর্থাৎ কাশ্মীরে এরূপ সেই সময় অনেক লোককাহিনী প্রচলিত ছিল বা আছে– এই পাহাড়, নদী, ঝরনাগুলিকে কেন্দ্র করে। জাহাঙ্গীর এই রকম একটি মীথের উল্লেখ করেছেন– মুসারান নামক স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন এসময় বরামূলার বনিকরা তাঁকে সম্মান জানাতে এসেছিলেন তখন তিনি জানতে চাইলেন এরকম নামের কারন কি? তদুত্তরে তারা জানান, হিন্দি ভাষায় শূকর কে বলে 'বরাহ' আর মুলার অর্থ 'স্থান'। এই মিলিয়ে হয়েছে বরাহমূলা বা শুকরের স্থান। আসলে হিন্দু ধর্মের দশাবতারের মধ্যে বরাহ একটি। এই জন্যই বারমুলা নামক স্থানের নামটি বর্তমানেও আছে। এসব লেখার মূল উদ্দেশ্য হল এখানকার প্রাকৃতিক বস্তু অর্থাৎ পাহাড়-নদী, ঝরনা এগুলির ধর্মীয় গুরুত্ব। তবে এখানকার নদী গুলি খুব খরস্রোতা, বিশেষ করে ঝিলাম। জাহাঙ্গীর লিখেছেন তাঁর সময়ে এক সেনাপতি ডুবে মারা গিয়েছিলেন, এমনকি যুদ্ধের হাতি পর্যন্ত এর জলে স্থির থাকতে পারে না। তিনি সুউচ্চ এনেকগুলি ঝরনার কথা লিখেছেন যেগুলি ছিল মনমুগ্ধকর। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন– 'এই রাস্তার ধারে অত্যন্ত উঁচু চমৎকার একটি জলপ্রপাত আছে। অনেক উঁচু থেকে ওটি নেমে এসেছে। এমন সুন্দর জলপ্রপাত রাস্তার ধারে দেখা যায়নি। আমি ওখানে একটু বেশি সময় ছিলাম এবং একটা উঁচু স্থান থেকে মন ও চোখ ভরে তার সৌন্দর্য দেখে নিলাম'। (There is a waterfall on this road, very high and fine. It flows down from a high place. No other waterfall of such beauty was seen on the road, I delayed a moment at it, and filled my eye and heart with gazing on it from a high spot.) আসলে জাহাঙ্গীর একজন প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন, প্রকৃতির রূপ-লাবণ্য উপলব্ধি করতে পারতেন, আর সেই টানেই তিনি বার বার কাশ্মীর যেতেন। এছাড়া তাঁর নির্দেশে সেখানে বেশ কয়েকটি কৃত্রিম ঝরনাও নির্মিত হয়েছিল। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরি'তে দুটি ঝরনার

উল্লেখ করেছেন যেগুলি হিন্দুদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল; তা হল– 'সন্ধ্যাবারি' ও 'সত্যবারি'। এছাড়া 'কুকুরনাগ' ঝরনার জল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ই মিটত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে বলে রাখি যে মুঘলেরা ভারতে বিশুদ্ধ ও পবিত্র জল হিসাবে গঙ্গা জলের উল্লেখ করেছেন বার বার। আইন-ই আকবরিতে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে মুঘল হারেমে ও রাজকীয় রান্নাঘরে নিয়মিত গঙ্গার জল ব্যবহৃত হতো। এজন্য মুঘলদের জন্য গঙ্গায় নির্দিষ্ট ঘাট ছিল ও তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। ডাল হ্রদের তীরে আকবর প্রাসাদ বানিয়ে ছিলেন আর সেটির নব নির্মাণ জাহাঙ্গীর করেন। সেখানে বাগান, প্রাচীর ও রাস্তাঘাট তিনি বানান। তিনি লিখেছেন; শহরের পাশেই 'কুহীমারান' পাহাড়, তাকে হরিপর্বতও বলে, এর পূর্বদিকে ডালহ্রদ এবং এর আয়তন সাড়ে চার-ক্রোশ। তাঁর কথায়, 'আমার পিতৃ-দেবার হুকুমে ওখানে পাথর ও চুন দিয়ে একটা সুদৃঢ় কেল্লা তৈরি হয়েছিল'। এই স্থানটি জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় ছিল। এছাড়া উলার হ্রদটি ছিল আরও চমকপ্রদ, এখানে নানান স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির দেখা মিলত। ঝিলামের উৎস 'বীরনাগ' নামক প্রস্রবণ টির কিনারাগুলি তিনি পাথর দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। আবার এখানে খাল কেটে সামনের একটি বাগানে জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন এই স্থানটি এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো যে সারা পৃথিবীর পর্যটকরা এমন মনরম স্থান কমই দেখে থাকবে। জানা যায় ডাল হ্রদের মাঝে একটা সৌধ ছিল, যা সুলতান জায়নাল আবেদিন বানিয়েছিলেন। প্রায় হাজার খানেক নৌকা করে পাথর নিয়ে গিয়ে মাঝখানে একটা সমতল ভুমি তৈরি করে তা বানান হয়েছিল। এখানে অজস্র নৌকা জলাশয়গুলির বাহার বাড়িয়ে তোলে। জাহাঙ্গীরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই শহরে ও উপকণ্ঠে প্রায় পাঁচ হাজার সাতশত নৌকা এবং সাতহাজার চারশত মাঝি-মল্লা ঐ সময় কাজ করত। এছাড়া হ্রদের পথেই বেশির ভাগ লোক চলাচল এবং শস্যাদি ও জ্বালানি কাঠ নিয়ে যাওয়া-আসা করত।

কাশ্মীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল এর নানান ফুল ও ফল। জাহাঙ্গীরের ভাষায় 'কাশ্মীর চীর বসন্তের একটি উদ্যান'। উইলিয়াম ফিঞ্চ যিনি ১৬০৮-১১খ্রি. ভারতে আসেন, তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে লিখেছেন—

> "The city is strong, seated on the river Bahat (Jhelum), the countrie is a goodly plaine, lying on the mountains, some 150c. in length and 50c.

in breadth, abounding with fruits, graine, saffron, faire and white women.”

বাদশাহ লিখেছেন, এখানকার জল উৎকৃষ্ট, নানা জাতীয় পুষ্প সর্বদায় প্রস্ফুটিত থাকে।দুনিয়ার মধ্যে এমন সুন্দর ও উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। গৃহের ছাদেও পুষ্পিত লতাপল্লবে আবৃত থাকে। যেদিকে তাকান যায় কেবল সবুজ রঙের খেলা, আর ফুলের বাহার, এখানে মনের খেয়ালে জন্মায় লাল গোলাপ, বেগুনী ফুল আর নারগিসাস। মাঠে ময়দানে রয়েছে অসংখ্য ফুল আর তার সৌরভ। বসন্ত ঋতুতে পাহাড়ে আর সমতলে সবস্থানে ভরে উঠে ফুলে; টিউলিপ ফুল আলোক শিখার মত দেখায়। জাহাঙ্গীর এই মনোরম দৃশ্যের অনুভূতি কবিতার ছন্দে লিখে গিয়েছেন।

‘উদ্যান পরীরা (ফুল) চমৎকার উজ্জ্বল রূপের,
তাদের গণ্ড সমূহ দীপশিখার মতো দীপ্তিময়;
ওদের ডাটা গুলির শিরে রয়েছে সুগন্ধময় কুঁড়ির বহর;
এ যেন প্রিয়জনের হাতের কালো কবচ।
সদাজাগ্রত, সৌরভ-বিচ্ছুরক বুলবুল পাখি
সুরাপায়ীদের তৃষ্ণাকে আরো বাড়িয়ে তোলে;
প্রতিটি নির্ঝর ধারায় পাতিহাঁস ঠোঁট ডুবিয়ে দিচ্ছে
এযেন সোনার কাঁচি দিয়ে রেশমী কাপড় কাটা।
কত শত ফুলকারী গালিচা, কত তাজা গোলাপের কুঁড়ি।

আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরিতে’ও এখানকার ফুলের বাহার ও মনোরম দৃশ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে—

“The flowers are enchanting and fill the heart with delight. Violet, the red rose and wild narcissus cover the plains. To enumerate its flora would be impossible. Its spring and autumn are extremely beautiful”

এছাড়া এখানকার সবচেয়ে দামী হল জাফরান। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন; শহরের দশ ক্রোশ দূরের পামপুর গ্রামটি জাফরানের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর আর কোথায় এত জাফরান উৎপন্ন হয় কিনা তাঁর জানা নেই। তিনি একবার তাঁর পিতার সাথে কাশ্মীর গিয়েছিলেন আর সেই সময় ছিল জাফরানি ফুলের মরশুম এবং এ

বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। মূলত জাফরানের ডাটা চার আঙুলের মত হলেই তার ফুল ফোটে। ফুলে পাপড়ি থাকে মাত্র চারটি, তাদের মাঝখানে বের হয় সরু সূতার মত নাল, ফুলের মতো এগুলির রঙ হয় কমলা আর এগুলিই হল জাফরান। তিনি লিখেছেন এগুলির ফলনের জন্য চাষের দরকার নেয়, সেচের দরকার নেয়, কেবল খণ্ড খণ্ড ঢেলা মাটিতেই জন্মে। কাশ্মীরে তিনি কোথাও কোথায় এক ক্রোশ পর্যন্ত জমিতে জাফরান উৎপন্ন হতে দেখেছেন। এখানে যে সমস্ত ফুল গুলি সেসময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেগুলি হল– গোলাপ, নারগিসাস, বুলানিক, লভরপুস (পুস-ই আলিউল উসুম)। এসমস্ত ফুলের আকৃতি ও রঙের কথাও লিখেছেন। কাশ্মীরে অসংখ্য ফুলের দেখা মিলে যা গুনে শেষ করা যায় না। উস্তাদ মনসুরকে দিয়ে তিনি প্রায় একশোর বেশি রকমের ফুলের চিত্র আঁকিয়ে ছিলেন। মন্দির বা মসজিদের চত্বরে নানা রকম ফুলের দেখা মিলত। জামি মসজিদের ছাদে তিনি চমৎকার জুয়াসী অর্থাৎ কালো টিউলিপ ফুল দেখেছিলেন। এছাড়া শহর থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যেও অজস্র পুষ্পরাজি দেখা যেত।তিনি এই সৌন্দর্য এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন; 'তিলা থেকে ভকরা পর্যন্ত সমস্তটা আমি মাঝ নদী দিয়ে এসেছি, এবং সবটাই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। পুরো জঙ্গলই ছিল পীচ ফুলের রঙের মত রঙিন করবী ফুলের রাশি।'এছাড়া হাথিয়া নামক স্থানে পলাশ ফুল লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন; 'পলাশ ফুল দেখতে এমন সুন্দর যে চোখ তা থেকে ফেরানো যায় না।' (On this road many palas trees were in blossom …It has no scent,…It is so beautiful that one canót take one's eyes off it.) জাহাঙ্গীর নৌকা যোগে ডাল হ্রদে বেড়িয়েছেন আর পাশেই শালিমার আর ফক গার্ডেনে ফুলের বাহার দেখেছেন। অনেক ফুলের নামই তিনি জানতেন না তা তিনি স্বীকার করেছেন। যেমন, তিনি লিখেছেন; আয়েশাবাদ উদ্যানে তিনি এমন একটা গাছ দেখেছিলেন যাতে প্রচুর ফুল ফোটে, ফুলগুলি বেশ বড় ও সুন্দর।

কাশ্মীরের ফল সম্পর্কে তিনি তিনি লিখেছেন; এখানকার সর্বাপেক্ষা রসালো ফল হচ্ছে অসকন, এবং এটি একটু টক ধরনের। আলুবালু বা অম্লচেরির থেকে আকারে ছোট ও স্বাদে উৎকৃষ্ট। এটি একজন চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় একশটি খেতে পারে। তিনি এটির নতুন নামকরন করেন, খুশকুন। সাধারণত এটি খরাসানের পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়। এছাড়া শাহ আলু বা চেরি এখানকার বেশ উত্তম, নূর আফসান বাগানে এগুলির খুব ফলন দেখেছিলেন। এসরত অফসান বাগানে তিনি নউবর (নতুন ফল) তিনি দেখেছিলেন, যেগুলি তিনি স্বহস্তে পেড়ে সুরাপানের সময় খেতেন। তাঁর সিংহাসন

আরোহণের পঞ্চদশ বছরে (তির-এর এলাহি মাসের ৪ঠা বৃহস্পতি বার) কাশ্মীরে থাকাকালীন তিনি নুরআফসান বাগান থেকে প্রায় দুহাজার চেরি তুলেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন কাশ্মীরের সব বাগানে যেন চেরি চাষ করা হয়। এছাড়া তিনি এখানকার দশ-পনের ধরনের ফলের কথা বলেছেন। কিছু ফলের গাছ বাইরের থেকে এনে লাগানো হয়েছিল যেমন; কাবুল থেকে আকবরের সময় মোঃ কুলি অফসর নামক কর্মচারী খুবানি গাছ আনেন। আর জাহাঙ্গীরের সময় খুবই উৎকৃষ্ট মানের খুবানি (Apricot) উৎপাদিত হত। এছাড়া এখানকার নাসপাতি ও আপেল খুবই উৎকৃষ্ট মানের এবং আঙুর প্রচুর পরিমানে জন্মায়। তিনি লিখেছেন, এখানকার আমরুদ ফল মানের দিক থেকে মাঝামাঝি ধরনের হয়। এছাড়া তিনি ফলের উৎকৃষ্টতার বিচারে আঙুর ও বেদানাকে ভাল বলেননি। তিনি প্রশংসা করেছেন কাশ্মীরের তরমুজকে, এছাড়া এখানে ফুটিকে বেশ মিষ্টি স্বাদের ও নরম বলেছেন। তুঁত পাওয়া যায় এখানে তবে খাদ্য হিসাবে উপযুক্ত ছিল না, গুটি পোকার খাদ্য হিসাবে এই গাছের পাতা বেশ উপযোগী বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিতে সেই সময়ের কাশ্মীরে বেশ কিছু পশু-পাখীর উল্লেখ করেছেন যা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, কি কি প্রাণী ছিল। তাঁর জীব-জন্তুদের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল, সেগুলি সম্পর্কে তাঁর উল্লেখগুলি থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন; ওখানে কোন মহিষ নেই আর গাভী-গরুগুলিও আকারে ছোট। সে সময় কাশ্মীরে প্রচুর ভেড়া পাওয়া যেত, তবে সেগুলি লাঙুলহীন। এগুলির মাংস খুবই সুস্বাদু। কাশ্মীরে মুরগী, হাঁস ও পাতিহাঁস, যেগুলি সোনালি, ও অন্য রঙের পাওয়া যেত। পাতিহাঁস ধরে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ছিলেন। এই পার্বত্য অঞ্চল গুলিতে পাওয়া জীব-জন্তুদের মধ্যে ঘন লোম দেখা যায়, যা সাধারনত ঠান্ডার কারণেই হয় বলে সম্রাট জাহাঙ্গীর লিখেছেন।তিনি জানিয়েছেন; কাশ্মীরের নিম্ন অঞ্চল গুলিতে আঁশ ও আঁশহীন দুধরণেরই মাছ পাওয়া যেত। তিনি একবার একটা কস্তুরী মৃগ উপহার পেয়েছিলেন এবং ওর মাংস তিনি কোন দিন খাননি বলে ওটির মাংস রান্না করতে বলেছিলেন। তবে সেটির মাংস অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল বলে উল্লেখ করেছেন— ‘It appeared very tasteless and bad for food. The flesh of no other wild animal is so inferior’.

সুখনাগ হ্রদে তিনি এক জায়গায় বসে নিয়মিত সুরাপান করতে যেতেন, সেখানকার

জলে নানা রকমের জল কুক্কুট দেখেছিলেন। একপ্রকার কালো ও গায়ে সাদা দাগকাটা ‘সজ’ নামক পাখির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। উস্তাদ মনসুর এরকম ‘জলসজ’ পাখির চিত্র এঁকেছেন। ‘পাপিয়া’ নামক এক ধরনের পাখি যা হিন্দুস্থানের সুমিষ্ট কণ্ঠ স্বরবিশিষ্ট, এটি কাশ্মীরে তিনি দেখেছিলেন। এই পাখি কোকিলের মত অন্যের বাসায় ডিম দেয়, এদের ছানাকে ‘ঘউঘাই’ (কপোত জাতীয়) নামক পাখি লালন-পালন করে। কাশ্মীরে বাজপাখি যা ‘শিকারীপাখি’ হিসাবে লোক কাজে লাগায় বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে হিন্দুস্তানের বেশ কিছু পাখি (প্রায় ত্রিশ প্রকার) সেখানে দেখা যায় না তার তিনি তালিকা দিয়েছেন; এর মধ্যে কয়েকটি হল– সারস(কুলঙ্গ), ময়ুর, হাড়গিলা, কোয়েল, ধনেশ। অর্থাৎ জাহাঙ্গীর নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণীকুল সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও আগ্রহ ছিল। এছাড়া কিছু মাংসাশী ও তৃনভোজী পশু কাশ্মীরে দেখা মিলত না যেমন– বাঘ, গন্ডার, বন্য মহিষ, খরগোশ, ছুঁচো ও সজারু। তবে এখানে নীলগাই মেলে না বলে সম্রাট উল্লেখ করেছেন, এমন কি কাকও কম দেখা যায়। আবুল ফজল লিখেছেন, এখানে হাতি ও উটের দেখা মিলে না। গিরঝক ও ভীমবর নামক স্থানে জাহাঙ্গীর কামারঘা অর্থাৎ শিকারবলয় নির্মাণ করে পাহাড়ি ভেড়া সহ প্রায় ছাপান্নটি পশু শিকার করেছিলেন।

মুঘলযুগে কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক দিকের একঝলক :

কাশ্মীরিদের সমাজ, খাদ্যাভাস, পোশাক ও ধর্মীয় রীতিনীতির উল্লেখ পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরের স্মৃতি থেকে। আবুল ফজল এখানকার লোকজন সম্পর্কে লিখেছেন; এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগনের নাম ঋষি । তাঁরা ভগবানের প্রকৃত উপাসক। তারা মাংস খায় না এছাড়া বিবাহ করে না (They abstain from fleshéôé meat and do not marry)। মূলত তিনি একথা গুলি কাশ্মীরের প্রাচীন অধিবাসী ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে লিখেছেন। এছাড়া এখানকার অধিকাংশ মুসলমান সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এখানে প্রায় দুইহাজার ব্রাহ্মণ আছেন। পুরানো সমস্ত লেখায় সংস্কৃত ভাষায় এখানে পাওয়া যায়। আবুল ফজল এখানকার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন; অমরনাথে তুষার নির্মিত মহাদেবের মূর্তি দেখা যায়। অমাবস্যার সময় এখানের গুহায় শীব লিঙ্গ দেখা যায় এবং পনের দিন পূর্ণিমার পর ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনুরূপ বিষয় জাহাঙ্গীরও উলেখ করেছেন যেগুলি আবুল ফজলের লেখার সাথে মিলে যায়। যেমন; এখানকার

ব্যাবসায়ী ও শিল্পীরা আধিকাংশ সুন্নী এবং ব্রাহ্মণরা খুবই সহজ সরল এবং মাংস খায় না। তাঁরা প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বাস করছেন এবং কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলেন। সংস্কৃত লেখায় তাদের বই আছে ইত্যাদি। কাশ্মীর শালের জন্য বিখ্যাত এবং পশম আসে তিব্বত থেকে। তিনি লিখেছেন, কাশ্মীরীরা পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকে না, দীর্ঘ দিন একটাই পোশাক পরে থাকে। তারা ভাত খায় তবে গরম খেতে পছন্দ করে না। এছাড়া যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তারা প্রতিদিন রাত্রির ভাত খানিকটা রেখে দিয়ে পরের দিন খায়। ভাতের সাথে নুন মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস নেয়। আনাজ-সবজি জলে সিদ্ধ করে এবুং স্বাদ বাড়ানোর জন্য নুন মিশেয়ে দেয়। সম্রাট লিখেছেন; কাশ্মীরে নুন ভারত থেকে আসে। এছাড়া কাশ্মীরিদের খাবারে ঘী মিশিয়ে খাওয়ার রীতি আছে। এদের বাড়ি নদীর তীরে হলেও শরীরে একফোঁটাও জল ছোঁয়ায় না। তবে এখানে প্রচুর সংগীতকুশলী ও গুণী লোক আছেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ঢিলে পোশাক পরেন যার নাম 'পত্তু'। পুরুষ মানুষেরা পাগড়িও পরেন। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন— 'এরা নিরন্তর মাঠে- ঘাটে ঘুরে ঘুরে ফলের গাছ পুঁতে বেড়ান যাতে জনসাধারন উপকৃত হয়।'

স্বাভাবিক ভাবেই এই কারনেই এখানে প্রচুর ফল পাওয়া যেত। নিঃস্বার্থ এই মানুষ রূপী ফেরেস্তারাই এই উদ্যান পালনের কাজ করতেন। ফিঞ্চ যিনি ১৬০৮ সালে ভারতে আসেন এবং কাশ্মীরের বাগানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন—

> "The city is strong, seated on the river Bahat (Jhelum), the country is a goodly plaine, lying on the mountains, some 150c. in length and 50c. in breadth, abounding with fruits, grain, saffron, faire and white women"

উল্লেখ্য আমরা ফলের গাছ লাগায় একমাত্র নিজের উঠোনে বা প্রাচীরে ঘেরা বাগানে আর এই কাশ্মীরিরা ফলের গাছ লাগাতেন সবার জন্য মাঠেঘাটে। আমরা ইতিহাস থেকে এটা শিখতে পারি যে, গাছ বা ফলের গাছ যেন নিজের জন্য নয় সকলের জন্য লাগাতে পারি। বাদশাহ আরো লিখেছেন—

> 'বাহ্যতঃ এদের দেখলে মুসলমানদের থেকে আলাদা কিছু মনে হয় না। মূর্তি পূজার সঙ্গে যুক্ত যা কিছু তা সবই অভ্যাস করেন। ইসলামের আগে এখানকার বিরাট বিরাট পাথরের মন্দির গুলি এদের পূর্ব পুরুষরা নির্মাণ করেছেন।'

এই বর্ণনা গুলি থেকে স্পষ্ট যে মুসলমানদের আসার আগে সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল এবং তাদের উচ্চমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরিতে কাশ্মীরের অধিবাসীদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, এখানকার জনবসতিতে লোক সংখ্যা বেশি হলেও দস্যু অথবা ভিক্ষুক নেই বললেই চলে। উল্লেখিত সময়ের কাশ্মীরীরা অন্ন, মৎস্য ও তরকারি আহার করে। এছাড়া, সেখানে যবের প্রচলন ছিল। তবে এখানের লোকেরা বাসী খাবার পছন্দ করে বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছে। আসলে এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকার জন্য খাবার নষ্ট হয় না, ফলে আগের দিনের রান্না খাবার খেতে সমস্যা নেয়।

কাশ্মীরে প্রায় সারা বছর ঠাণ্ডা থাকে এটা আমরা সকলেই জানি। এছাড়া শীতের সময় উপত্যকাগুলি বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন; কাশ্মীরের আবহাওয়া ঠান্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে, এজন্য ঘি তিন-চার দিন ঘরে থাকলেই তার চেহারা বদলে জমাট বেঁধে যায়। তিনি ভুলবাস নামক স্থানে একবার শিবির করে তাঁবু ফেলেছিলেন ঠিক মার্চ মাস (১৬২০খ্রি.) নাগাদ, সেখানে বাদশাহি ফৌজ ও লোক-লস্কর ছিল। সেই সময় প্রচণ্ড তুষারপাত হয়েছিল ফলে রাস্তাঘাট বরফে বন্ধ হয়ে বাদশাহ ও সকলেই বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লোকেরা আগের থেকে ভাগ্যিস তাঁবু বানিয়ে রেখেছিলেন। তাঁবুর মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে হারেমের মহিলাদের ঠান্ডা থেকে বাঁচানো গিয়েছিল। প্রকৃতির কাছে অসহায় বাদশাহ লিখেছেন— 'মহান আল্লাহ্ আমাকে ও আমার লোকেদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এত ধনসম্পত্তি, হীরে জোহরাতের কোন মুল্য নেয়?' (What do worldly goods appear worth to the eye of our magnanimity? We buy the jewel of loyalty at a high figure).

ওখানকার আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা, এজন্য শালের কাপড় খুব বেশি প্রচলিত। সকলেই পশম জাতীয় পোষাকেই পরেন। বাদশাহ লিখেছেন; একবার খুব ঠান্ডার মধ্যে মুতামদ খান ছিলেন, এসময় তিনি নিজের গায়ের জামা পোশাক খুলে তাঁকে দিয়েছিলেন। এছাড়া, বহু সংখ্যক ফকির (হয়তো বা তীর্থযাত্রী) তাঁর সাথে কাশ্মীরের পথে ছিলেন, এত ঠান্ডায় তারা সকলেই মারা যেত এই বেগতিক দেখে তাদের গরমের পোশাক বাদশাহী ভাণ্ডার থেকে দিতে হুকুম করেন। এছাড়া বাদশাহী ফৌজেরা তাদের কাবুলের পথে ছেড়ে দিতে সহযোগিতা করেন।এখানকার জল খুব ঠান্ডা থাকায় লোকেরা নিয়মিত স্নান করে না। জানা যায় তাঁর দলের মধ্যে দুজন ঝিলাম নদীতে স্নান করতে

গিয়ে মারা গিয়েছিল। মোট কথা ভূস্বর্গ ঠান্ডা ও বরফের উপত্যকা, তবে সারা বছর নয় কয়েক মাস, আর বাকি সময় চীর বসন্তের দেশ বলে বাদশাহ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন ।

কিছু ধর্মীয় রীতি রেওয়াজের উল্লেখ মিলেছে 'তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী' থেকে, যেমন উল্লেখিত সময়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেই শান্তিতে বসবাস করতেন। মুসলিমদের মধ্যে সুন্নি সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য ছিল। শবেবরাত উৎসবে ঘরে ঘরে প্রদীপ দিয়ে আলোকসজ্জা করা হত। সম্রাটের একটি বর্ণনা থেকে মনে হয় মুসলিম শাসনের শুরুর দিকে বিয়ের ক্ষেত্রে হিন্দু -মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাধা ছিল না। রাজাউর নামক স্থানে তিনি শিবির ফেলেছিলেন (১৬২০ খ্রি.), আর এরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। হিন্দুদের সঙ্গে রাজাউরের মুসলমানদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং দুই সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহাদি চলত। তবে তিনি তা জানতে পেরে কেবল হিন্দুদের মেয়েদের কেবল গ্রহণের হুকুম দিয়েছিলেন। হিন্দুর ঘরে কন্যা দান করা এক্কেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে এই দ্বিচারিতার কারন অবশ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি জানতে পারেন হিন্দুদের মতোই সেখানকার হিন্দু নারীরা মৃত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জনের ন্যায় নিজ স্মামীর কবরে সমাধিশয়নে শায়িত হয়ে জীবনদান করতেন। সম্রাট শিবির চলা কালিন জানতে পেরেছিলেন যে, এরূপ একটি দশ- বারো বছরের মেয়েকে তার স্মামীর মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি লিখেছেন—

> "Taking them is good, but giving them, God forbidæ I gave an order that hereafter they should not do such things, and whoever was guilty of them should be capitally punished."

উল্লেখ্য, সমাজের এই বর্বরোচিত প্রথা আকবর বন্ধ করার চেষ্টা করলেও তা বন্ধ করতে পারেননি। এছাড়া ঝিলাম নদীকে এখানকার অধিবাসীরা পবিত্র জ্ঞানে পূজো করত। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে (যা ছিল ঝিলামের জন্মোৎসবের দিন) নদীর তীর বরাবর রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালানো হত। জাহাঙ্গীর নিজে এরকম একটি দিনে নৌকা যাত্রা করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছেন যেন এটি শবেবরাতের রাত্রি ।

উপসংহার :

একটি গ্রন্থে এইভাবে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সহ পরিবেশ ও সমাজ, সাংস্কৃতিক দিক বর্ণিত হয়েছে আর আমরা পাঠক হিসাবে তার উপলব্ধি করছি মাত্র। তবে বাস্তবিকই— এই মনোরম পরিবেশের কথা বিভিন্ন তথ্য থেকেও প্রমানিত। আমির খশরু থেকে সকলেই কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। যে দেশ জাফরানের, যে উপত্যকা বরফের, যে রাজ্য আপেল আর আঙ্গুরের আর তার হ্রদ আর বাগান নয়নাভিরাম তা সত্যি জান্নাতময়। কোরআনে বর্ণিত জান্নাত, ঝরনা, পাখি, বৃক্ষ আর হুর অর্থাৎ সুন্দরী রমণী এই চারটিই এখানে বিদ্যমান ছিল (শাসকের চোখে)। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিটি শক্তিশালী শাসক মাত্রই এই স্থানটি নিজের অধীনে রাখতে চাইতেন, যা মুঘলদের কাছে তার ব্যাতিক্রম হয়নি। আর সম্রাট জাহাঙ্গীরের চোখে আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগের ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে দেখার সৌভাগ্য আমরা লাভ করছি। আধুনিক প্রজন্ম জানুক সেই সময়কার গ্রন্থ গুলি মধ্যযুগের কাশ্মীরের সাথে আমাদের যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছে, কয়েক হাজার কিমি দূরের আমাদের আকাঙ্ক্ষার চীর বসন্তের কাশ্মীরকে। ভারত মাতার মুকুট ধারিণী মস্তক, যা চিরকাল ভারতের মূল ভূখণ্ডের শাসকদের অধীনেই থাকতো।

সূত্রনির্দেশ :

1. Zahiruddin Babar, Babur-Nama, tr. A.S. Beveridge, Low Price Publication, Delhi,1921, p.484.
2. Allami,Abul Fazal, Ain-I-Akbari, tr. H.S. Jarrett, Asiatic Society, kol,1868 vol-2, pp.384-85.
3. Alam, Jahangir, Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir, tr. A. Rogers & H. Beveridge, Atlantic pub, New Delhi,1909, vol-2, pp.151-52.
4. Ibid, p.149.
5. Ibid, p.150
6. Tuzuk, vol-1, p.89
7. Tuzuk, vol-2, p.138
8. Ibid, p.142

9. Foster, William, ‘Early Travels in India (1583-1619)’, Munshiram Manoharlal pub, New Delhi,1921, p.169.
10. Tuzuk, vol-2, pp.152-53.
11. Ibid, vol-1, pp.92-93.
12. Tuzuk, vol-2, p.168.
13. Ibid, p.160
14. Ibid, p.174.
15. Enayatullah Khan & Mohammad Parwez, ‘Man and Wildlife in Mughal India: Jahangir and Nilgaw hunt’Vidyasagar University Journal of History, Vol.2,2013-14, pp.187-194.
16. Ain-I-Akbari, vol-2, p.355.
17. Tuzuk, vol-2-p. 155.
18. Early Travels in India,(1583-1619), William Foster, Munshiram Manoharlal pub, New Delhi,1921, p.169.
19 . Ibid, p. 158.
20. Ain-I-Akbari, vol-2, pp. 355-56.
21. Tuzuk, p. 140.
22. Tuzuk, vol-2,p. 192.

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

পায়েল কুন্ডু *

সারসংক্ষেপ: বীরসন্ন্যাসী, সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ কিংবা দার্শনিক বিবেকানন্দের পরিচয় ব্যতীত শিক্ষাবিদ হিসাবেও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা বর্তমান সমাজ ও সভ্যতায় এক বিরাট স্থান দখল করে রয়েছে। শিক্ষা বলতে তিনি কেবল প্রচলিত পাঠ্যক্রম নির্ভর কিংবা তথ্যভিত্তিক শিক্ষাকে বোঝেননি। তাঁর কাছে 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা আগে থেকেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ' অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষা কোন বাহ্য আরোপিত বিষয় নয়। এই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ তৈরি করা, মানুষকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা। এমনকি স্ত্রী শিক্ষার ওপরেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কেননা তিনি মনে করতেন সমাজে যত সমস্যার মূলে রয়েছে প্রকৃত শিক্ষার অভাব। তাই নারীকে যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তবে তাদের নিজেদের সমস্যা তারা নিজেরাই সমাধান করতে সমর্থ হবেন। সেই জন্য তিনি বারবার নারীদের আত্মনির্ভরশীল বা স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। কেননা প্রচলিত শিক্ষায় কেবল আর্থিক উন্নয়ন হয় মাত্র, এটিকে আত্মিক উন্নয়নের রূপ দিতে হবে। অর্থাৎ তিনি সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নে শিক্ষাকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন। এখানেই বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার অভিনবত্ব।

মূলশব্দ: সমাজসংস্কার, শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, পাঠ্যক্রম, অস্পৃশ্যতা, শিল্পকলা, মাতৃভাষা।

বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, তা এক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সমাজের সর্বত্রই বিরাজমান এক প্রকার হতাশা, অবক্ষয় ও অনৈতিকতার বাতাবরণ। সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রায়শই একই চিত্র।

---

* সহকারী অধ্যাপিকা, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ, নদীয়া।
e-mail: payelphilo19@gmail.com

এছাড়াও কুসংস্কার, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীজাতির অনাদর শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজ নয়, বর্তমান ভারতের সমস্যা বটে। সমগ্র মানব জাতির মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে অজ্ঞতার অন্ধকারে। বিবেকানন্দ মনে করতেন, এই ঘোরতর সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে শিক্ষায়। তাঁর দুচোখে যে ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন একমাত্র শিক্ষাই পারে সেই ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে। কেননা শিক্ষাই হল ব্যক্তি তথা সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের মার্গ।

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কিত নানান ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তবে, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণায় রয়েছে যথেষ্ট অভিনবত্ব। কেননা, শিক্ষা কী তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'Education is the manifestation of perfection already in man'[১] অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বর্তমান তারই প্রকাশ। মানুষের ভিতর যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবন বিদ্যমান না থাকত, তাহলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনো জ্ঞানী ও শক্তিমান হতে পারত না। অর্থাৎ, জ্ঞান বাইরে থেকে আরোপিত কোন ব্যাপার নয়। মানুষ যখন তার নিজের মনের ওপরকার আবরণ সরিয়ে দিতে পারে তখনই তার আত্মজ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, অন্যভাবে বলা যেতে পারে সাধারণ অর্থে শিক্ষা হয়। ভাবনার আত্মীকরণ যখন সমস্ত দেহ-মন জুড়ে হয় তখনই শিক্ষা সার্থক হয়। তাই স্বামীজী শিক্ষার আর একটি সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "Education is the nervous association of certain ideas"[২] অর্থাৎ শিক্ষা হল কতকগুলি ভাবের স্নায়বিক অনুষঙ্গ।

শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "End of all education, all training should be man making"[৩] অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষ তৈরি করা। তিনি মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে জোর করে জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। প্রকৃত শিক্ষা কখনোই তথ্য ভিত্তিক হতে পারে না। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীর জীবন গঠন করা, তাকে মনুষ্যত্বের অধিকারী করা ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলা। শিক্ষাকে তিনি মানুষ তৈরি করার, জীবন দানের ও চরিত্র গঠনের মাধ্যম মনে করতেন। তাঁর মতে, শিক্ষার প্রথম সোপান হল সমন্বয়, মস্তিষ্ক, মাংস পেশী, হৃদয় ও সব বৃত্তির সমান পরিপুষ্টি সাধন। এর জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা (concentration)। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই একাগ্রতা গড়ে তোলার উপায় হিসাবে

নির্ধারণ করলেন আত্মসংযমী জীবন যাপনের আর্দশকে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ছাত্রজীবনে আবশ্যক। এই একাগ্রতা গড়ে তুলতে পারলে মনে আত্মপ্রত্যয় জন্ম নেবে, শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে। স্বামীজী শ্রদ্ধার একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'প্রাচীন ধর্ম মতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক, নতুন ধর্ম বলে, নিজেকে যে বিশ্বাস করেনা, সেই নাস্তিক।'[৪] পাঠ্যক্রম রচনার মূলনীতি প্রসঙ্গে স্বামীজী বার বার জাতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। জনসাধারণকে জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভর, কর্মক্ষম, স্বাধীন ও যুক্তিশীল হয়ে ওঠে। তাই স্বামীজী পাঠ্যক্রমে স্থান দিলেন শুধু প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান নয়, শিক্ষার্থীকে জানতে হবে পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সঙ্গীত ও হস্ত শিল্প অবশ্যই থাকবে। শরীরচর্চার ওপর স্বামীজী সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। কারণ স্বাধীন, কর্মকুশল সুস্থ শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় শিক্ষার্থী সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠবে, এটাই তো প্রকৃত শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ। স্বামীজীর মতে, শিক্ষকের কাজ শুধু তথ্যপরিবেশন করা নয়, শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশে সহায়তা করা। তিনি দরিদ্র জনসাধারণ, ক্ষুধার্ত জনসাধারণ ও সমাজের ব্রাত্য জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার কথা বলেন– যা হবে উপযোগী শিক্ষা, বাস্তব শিক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা। এই জনশিক্ষার দায়িত্ব দিতে চাইলেন যুবকসম্প্রদায়কে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, মানুষের পক্ষে বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব নয়, তাই বিদ্যালয়কে পৌঁছে দিতে হবে তাঁদের কাছে। স্বামীজীর ভাষায় 'মহম্মদের কাছে পর্বত না এলেও মহম্মদকে পর্বতের কাছে যেতে হবে'।[৫]

শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে স্বামীজী বলেছেন সমাজে নারীদের আগে শিক্ষা দিতে হবে, তবে তো দেশের তথা ভারতের কল্যাণ। যে সমাজে নারীরা বা মেয়েরা অবহেলিত সেই সমাজ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে উনি বলেন যে, একটি ডানায় ভর করে পাখি যেমন উড়তে পারে না তেমনি জাতির পক্ষে শুধু পুরুষ উন্নত হলে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, উভয় মিলিত ভাবে জাতি গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করলে তবেই জাতির উন্নতি সম্ভব। বেদান্ত দৃষ্টিতে তিনি বলেন, আত্মাতে কোন নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। তাই সমাজে শিক্ষা অর্জনে পুরুষের মতোই নারীর সমান অধিকার। তিনি বলেন আমাদের মহান জাতির মর্যাদা লাভ করতে হলে নৈতিক ও সামাজিক

গ্লানি ও দুর্বলতা অবশ্যই দূর করতে হবে। নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন–

> 'Educate your women first and leave them to themselves— then they will tell you what reforms are necessary for them. In matters concerning them– who are you'।[৬]

যে জাতি নারীদের যথাযথ সম্মান প্রদান করতে পারে না, সেই জাতির কস্মিনকালেও উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি ঘোষণা করেছেন 'হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী'[৭]। নৈতিক আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা হল স্বামীজীর নারীশিক্ষার প্রধান হাতিয়ার। তিনি আদর্শরূপে পবিত্র সীতার চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, নারী সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে পণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নারীরা নিজেদের সংগঠিত করতে পারে। বিবেকানন্দ নারীশিক্ষার পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন। তার মধ্যে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার সাথে সাথে ঘরকন্যা, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন, শিল্পকলা প্রভৃতি শিক্ষাও থাকবে। তাছাড়া, বিবেকানন্দ নারীশিক্ষার পাঠ্যক্রমে ধর্মদর্শন, সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, মাতৃভাষা ও অল্পবিস্তর ইংরেজি চর্চার কথা বলেন অর্থাৎ সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের সঠিক ভাবে নারীরা যাতে অভিযোজন করতে পারে, তার জন্য পাঠ্যক্রমে যা যা রাখা দরকার সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে সকল শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কথা বলেছেন। ধর্ম মানে প্রচলিত পুজো উপাসনা সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম মানে আত্মবিশ্বাস বা আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জাগ্রত হলে মানুষ আর ভাগ্যের হাতে অসহায় আত্মসমর্পণ করবে না। একেই তিনি ম্যান মেকিং এডুকেশন বলেছেন, মানি মেকিং নয়। নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন নারীদের আগে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা প্রয়োজন কারণ নারীর ওপর নির্ভর করে আছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নারীরা যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তবেই তার সন্তান-সন্ততিকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবে ফলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।

> 'Women will work out their own destinies, much better, too, than men can ever do for them. All the mischief to women has come because men undertook to shape the destiny of women.'[৮]

শিক্ষাই কেবলমাত্র মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ও সৃজনশীলতার উন্মেষের মধ্যে দিয়ে সমাজে মেয়েদের নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে। শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যা চরিত্র গঠন ও মানসিক শক্তি উন্নতকরণের মধ্যে দিয়ে সমাজে নারীদের নির্ভীক ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, এর ফলে সমাজের যেকোন নিপীড়ন থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারে। স্বামীজি বলেছেন, মেয়েদের অনেক গুরুতর সমস্যা আছে, আমাদের মত দেশে সমস্যা হল পরাধীনতা ও পরনির্ভরশীলতা। তিনি বলেছেন নারীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে দাও, তারপর তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই করে নেবে। নারী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি মেয়েদের আত্মনির্ভর বা স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর অভিনবত্ব এইখানেই যে, তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারে নারীদের এগিয়ে আসার কথা বলেছেন। পরবর্তিকালে আমরা দেখি তাঁর এই কাজে অর্থাৎ নারীশিক্ষা প্রবর্তন ও নারী শিক্ষার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা।

শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, তিনি শিক্ষাকে কেবল কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান না, এমনকি তাঁর শিক্ষা নির্দিষ্ট কোন বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়– তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই একথাই স্পষ্ট। শিক্ষা বলতে যদি, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বর্তমান তারই প্রকাশকে বোঝায় তবে এই প্রকাশ যেকোন মুহূর্তে, যেকোন বয়সে হতে পারে। তিনি একটি সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলেছেন, চকমকি পাথরের মধ্যে আগুন জ্বলার সম্ভাবনা থাকে বলেই ঘর্ষণের ফলে তার থেকে আগুন বেরিয়ে আসে; আগুন বাইরে থেকে তার ওপর আরোপ করা হয় না। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণও বলতেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। স্বামীজী বলেছিলেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, Arise! Awake and stop not till the goal is reached'।[১] আর এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সেটি হল জীবনোপযোগী ও সময়োপযোগী শিক্ষা। স্বামীজী যে শিক্ষার কথা বলেছিলেন সেটা প্রত্যেকটা মানুষের, প্রত্যেকটা দিনের উপযোগি শিক্ষা। তাঁর শিক্ষা ছিল আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হবার শিক্ষা। যে শিক্ষা শুধুমাত্র একটি যুগে আবদ্ধ নয়। আজ থেকে ৫০০০ বছর পরেও যদি মানুষের অস্তিত্ব থাকে তাহলেও স্বামীজীর শিক্ষার ধারা সমান ভাবে বহনীয় হবে। স্বামীজীর প্রত্যেকটা বাণীই আমরা যতবার পড়ব ততবারই একটা নতুনত্বের আভাস পাব। তাই কাউকে যদি প্রকৃতপক্ষে

শিক্ষিত বলতে চাই তবে তাকে সব দিক থেকে উপযোগী হতে হবে। স্বামীজী তাই বলেছেন, 'Education is all round development'[১০]। সুতরাং এই দিক থেকে স্বামীজী সব সময়ই এগিয়ে থাকবেন।

স্বামীজী যে সময়ে দাঁড়িয়ে এই শিক্ষার কথা বলেছিলেন তখন আমাদের দেশ পরাধীনতার ছায়াবৃত্তে আবৃত ছিল। কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে অগ্রণীর ভুমিকাও নিচ্ছে, আমরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পাচ্ছি। তবুও যতটা শিক্ষার বিস্তার হবার কথা তা হয়নি নতুবা স্বামীজী যে শিক্ষাকে মানুষ গড়ার শিক্ষা বলতেন সে শিক্ষার প্রবর্তন আজও ঘটেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, যেখানে শিক্ষা কেবল পুস্তকী শিক্ষা, ডিগ্রি অর্জনের শিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে রাজনীতি ও ভ্রান্ত শিক্ষানীতি, যা মানুষ তৈরি হতে দিচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ে পড়েছে হতাশ, দিশাহীন, আশাহীন। আর এই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হলে আমাদের, স্বামীজী যে আদর্শ গুলির কথা বলেছেন সেগুলি যতটা সম্ভব মেনে চলা দরকার। অর্থাৎ এই দিশাহীন ছাত্র সমাজকে আশার আলো দেখাতে পারে স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর রচনা। আর এই পথে এগোলে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২. পৃ. ৩১৪।

২. Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda (vol.-4). Advaita ashram, October 2007. pp-212.

৩. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩. পৃ. ১১৫।

৪. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, জানুয়ারি ২০০২. পৃ. ১৭৫-৭৬।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩. পৃ. ৩৩৪।

৬. Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-6). Advaita Ashram– 2013. pp- 29.
৭. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২. পৃ. ১৯৪।
৮. Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda (Vol.8). Advaita Ashram, 2013. pp-19.
৯. স্বামী বিবেকানন্দ. বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড). উদ্বোধন কার্যালয়, আগস্ট ২০০২. পৃ. ৬১।
১০. স্বামী বিবেকানন্দ. বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড). উদ্বোধন কার্যালয়. ডিসেম্বর ২০০২. পৃ. ১২১।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, জানুয়ারি ২০০২।
২. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, মে ২০০২।
৩. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৩।
৪. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২।
৫. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ২০০১।
৬. স্বামী বিবেকানন্দ, আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, অক্টোবর ২০০৭।
৭. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, জানুয়ারি ২০১৬।
৮. Swami Vivekananda. Complete Works of Vivekananda (Vol-6). Advaita Ashram, 2013.
৯. Swami Vivekananda. Complete Works of Vivekananda (Vol-8), Advaita Ashram, 2013.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস *

সারসংক্ষেপ: পরিবেশের ইতিহাস চর্চা সাম্প্রতিক ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস লিখন তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সেখানে সাহিত্যিক উপাদান পর্যাপ্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। সাহিত্যিক উপাদান যে কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজের প্রতিক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করে। সাহিত্য সমাজ-সংস্কৃতির দর্পণস্বরূপ। কাজেই প্রাচীন ভারতের মানুষের পরিবেশ চেতনার সম্যক আভাস সাহিত্যের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে ক্রমশ পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র তথা প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদদের ভাবনাচিন্তা লক্ষ করা যায়। যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে মানুষ পরিবেশকে কীভাবে উপলব্ধি করত, তার প্রতি কেমন ব্যবহার করত এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। সংখ্যা ও বৈচিত্র্য উভয় দিক দিয়েই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগত উপাদান সুপ্রচুর। তাই প্রাচীন ভারতের নির্দিষ্ট কিছু সাহিত্যকে চিহ্নিত করে এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিগ্রন্থের উপর আলোচনা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা অন্বেষণের প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: প্রাচীন ভারত, রাষ্ট্রগঠন, সাহিত্য, পরিবেশ সচেতনতা, বন ও বন্যপ্রাণী।

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। e-mail: aniruddhabiswas780@gmail.com

পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ রক্ষণের ভাবনা প্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই সচেতনতা ও ভাবনার প্রতিফলন যথেষ্টভাবে ঘটেছে। পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি কোথাও প্রচ্ছন্ন আবার কোথাও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের যা পরিবেষ্টন করে আছে তাকেই পরিবেশ বলা হয়। পরিবেশ মূলত চারটি উপাদানে বিভক্ত– মাটি, জল, বাতাস এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী। মাটি, জল ও বাতাস নিয়ে গড়ে উঠেছে যে পরিবেশ তাকে বলা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ; আর উদ্ভিদ আর প্রাণী নিয়ে গঠিত পরিবেশকে বলা হয় জৈবিক পরিবেশ।[১] পরিবেশের এই দুটি উপাদান-ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনও একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। মানুষও তাই উদ্ভিদ, প্রাণীকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সংরক্ষণ বলতে ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখা বোঝায় এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত বহু বিষয়ই গাছপালা, পশুপাখি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে।[২] মানুষ ও পরিবেশ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একে অন্যকে সংরক্ষণ এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

মানুষ যে তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিল, তার বহু প্রমাণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও মননের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা, সংবেদন ও সংরক্ষণের এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। বৈদিক সাহিত্য সম্যক পর্যালোচনা করে M. Vannucci দেখিয়েছেন যে, জীবজগৎ ও পরিপার্শ্বের প্রতি এক আশ্চর্য সম্মাননায় বৈদিক মনস্মিতা বাঙ্ময়।[৩] বৈদিক সাহিত্যে এক সহমর্মী অবস্থানের প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস ও পশু সংহারের বিরুদ্ধে এখানে উচ্চারিত হয়েছে নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির ইঙ্গিত যা সম্ভবত পরিবেশ সচেতনতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সংযত জীবনচর্যা গড়ে তোলারই আন্তরিক প্রয়াস।

পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে আর্য সংস্কৃতি ক্রমশ পূর্ব দিকে বিস্তারলাভ করে। ভারতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ নাগাদ লোহার ব্যবহার শুরু হয়। লোহার হাতিয়ার ও আগুনের সাহায্যে মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির গহন অরণ্য পরিষ্কার করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষিকাজের আওতায় আনা সম্ভব হয়। পরবর্তী বৈদিক এবং বৈদিকোত্তর যুগ থেকে স্থায়ী বসতি এবং কৃষির বিস্তারের জন্য অরণ্যের উপর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। অরণ্য ধ্বংস করে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার প্রসার দেখা যায় মহাভারতের 'আদিপর্বে' বর্ণিত

খান্ডব বন পোড়ানোর কাহিনীতে। বর্তমান হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে পান্ডবদের নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হয়েছিল এই খান্ডব বন পুড়িয়ে।[৪] পরবর্তীকালে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার ক্রম প্রসারের ফলে বন ও বন্যপ্রাণীর উপর হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়।

সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা[৫] মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে নগরগুলির সূচনা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ বলে ধরে নিয়েছেন। স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ ও বসতি বিস্তারের আগে অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকার কারণে এই অঞ্চলে ঘন অরণ্য সৃষ্টি হয়েছিল। ঘন অরণ্য ও তা পরিষ্কারের আলেখ্য শতপথ ব্রাহ্মণে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ) উল্লিখিত বিদেঘ মাঠবের কাহিনীতে (১.৪.১, ১৪-১৭) খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বর্তমান হরিয়ানা থেকে উত্তর বিহার পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথের এই কাহিনীটি যেমন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের সময় থেকে ভারতে অরণ্য বিনাশের সূচনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার কাল থেকেই অরণ্যদাহন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নতুন কৃষিভূমি সৃষ্টির পর্ব আরম্ভ হয়ে যায়, যার ফলশ্রুতি গাঙ্গেয় নগরায়ণ। কৃষি উৎপাদনের কৌশলগত প্রকরণে পরিবর্তন এসে যাওয়ায় (লোহার ব্যবহার) গাঙ্গেয় উপত্যকায় জনস্ফীতি ও জনপদ প্রসারের প্রবণতাকে সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আলোকে যথার্থভাবে নির্ণয় করেছেন রামশরণ শর্মা, দিলীপকুমার চক্রবর্তী, বিজয়কুমার ঠাকুর প্রমুখ ইতিহাসবিদ। বস্তুত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন যুগের লক্ষণ বহন করে এনেছিল।

অরণ্য পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ প্রক্রিয়া যদিও সেই সময়কার বস্তুজীবনের চাহিদা ছিল, কিন্তু কালক্রমে এই প্রয়োজন পরিবেশের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে থাকে এবং ভবিষ্যতে বাস্তুতন্ত্রকে আরও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে ভেবেই সম্ভবত প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদরা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের রক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন। প্রাকৃতিক সম্পদের সুমিত ব্যবহার, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম, উদ্যান-উপবন ও পশু-প্রাণীর রক্ষা, পরিবেশ সংবেদন ও প্রাকৃতিক নির্মলতা সম্পর্কিত চিন্তাচেতনা তার সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থিত জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যেও।[৭] পরিবেশ সচেতনতার ঐতিহ্য এখানেও প্রতিফলিত।

বন ও বন্যপ্রাণীদের উপর আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি ক্রমশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাওয়া যায় মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত শকুন্তলা আখ্যানটিতে।[৮] এই কাহিনী অনুযায়ী

দুষ্মন্ত একদিন সসৈন্যে মৃগয়ায় যান এবং শিকারে হাতি, বাঘ, হরিণ সহ বহু বন্যপ্রাণী ক্ষতবিক্ষত ও নিহত হয়। আর ধ্বংস হয় অসংখ্য গাছপালা। এভাবে পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপের বিষয়টি উঠে আসে। মৃগয়া তথা শিকার মূলত রাজার আমোদ-প্রমোদ বা সময় কাটানোর জন্য সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিকারের মাধ্যমে অরণ্যের প্রাণীদের প্রতি যে বর্বরোচিত মনোভাব প্রকাশিত হত তা নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে দুষ্যন্তের মতো রাজার মৃগয়াজনিত ধ্বংসলীলাকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে আক্রমণ করতেও শাস্ত্রকাররা পিছপা হননি, যা তাঁদের পরিবেশ রক্ষার প্রতি সচেতনতাকেই চিহ্নিত করে।

কৃষির বিস্তার জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল বলেই অরণ্যের ধ্বংস সাধন অনিবার্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে নগরের বিস্তারের ফলে এই ধ্বংসের পরিমাণ বাড়তে থাকে আর এই কারণেই রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াতে অরণ্য সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে উত্তর ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই কালপর্ব থেকেই 'দ্বিতীয় নগরায়ণ'[৯] প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, যা কালক্রমে নতুনভাবে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার সূত্রপাতকেও চিহ্নিত করে। জাতকের কাহিনীগুলি থেকেও বনজ সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার বিষয়ে প্রভূত ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১০] জাতকের[১১] কাহিনীগুলিতে যে নগরের দিকে কাঠ বোঝাই গোরুর গাড়ির যাত্রার কথা পাওয়া যায় তা মূলত নগরগুলিতে গৃহনির্মাণ ও জ্বালানির প্রয়োজনে কাঠের ব্যাপক ব্যবহারকেই চিহ্নিত করে।

প্রাচীন ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় রাষ্ট্র ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা পরিবেশ যেহেতু ব্যবহারিক বিষয় সেহেতু একে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এর প্রায়োগিক দিক ব্যতীত পরিবেশচর্চা অর্থহীন। আর এখানেই এসে পড়ে রাষ্ট্র তথা শাসক শ্রেণীর ভূমিকা। মৌর্য যুগে জনপদের বিস্তার অব্যাহত ছিল। নতুন নতুন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটানো হত; যার বর্ণনা অর্থশাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। আর এসব কারণে অরণ্য পরিষ্কার করতেই হত। কুমরাহারে মৌর্যকালীন কাঠের তৈরি রাজপ্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে কাঠের ব্যাপক ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নগরায়ণের প্রকল্প মৌর্য শাসকদের হাতে পেয়েছিল এক নতুন মাত্রা। মগধকে

কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নন্দ রাজারা নিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন হয়েছিল মৌর্য রাজত্ব পর্বে। মৌর্যরাই প্রথমে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১২] কৃষি, বাণিজ্য ও অপরাপর সম্পদের জন্য জনপদ সম্প্রসারণ মৌর্যদের এক সুসংবদ্ধ প্রয়াস।[১৩] মৌর্যযুগের সার্বিক সম্প্রসারণ ও কেন্দ্রীকরণ নীতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বহুবিধ সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম ছিল পরিবেশ সঞ্জাত সমস্যা ও সংকট। অর্থশাস্ত্রে যার আভাস পাওয়া যায়।

মৌর্যকালীন আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্কে নিশ্চিত রেখাপাত করেছিল। মৌর্য কেন্দ্রীকরণ ও অরণ্যবাসীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের[১৪] ফলে প্রকৃতি সংরক্ষণের আদি পরম্পরা যেমন ব্যাহত হয়েছিল তেমনই প্রশাসনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত দোহন প্রক্রিয়াও হয়ে উঠেছিল তীব্র। বন উচ্ছেদ, স্থাপত্যকর্মে ব্যাপক কাঠের ব্যবহার, গোধন রক্ষার প্রয়োজনে চারণভূমির প্রসার ও তৃণগুল্ম সম্পদের সংকোচন ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা করলে এ ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিবর্তিত ও বিপন্ন বাতাবরণে বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং পরিবেশের সুস্থতা অর্জন সম্পর্কে চৈতন্যোদয় অর্থশাস্ত্রে সুতীব্রভাবে ঘোষিত। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বনজ সম্পদের বর্গীকরণের কথা।[১৫] কৌটিল্য এদের বিশ্লেষণ করেছেন অর্থকারী উপযোগিতার নিরিখে। একদিকে অরণ্যকে ধ্বস্ত না করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে তিনি আগ্রহী, অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। এই দ্বিমুখী ভাবনা অর্থশাস্ত্রকে দিয়েছে এক ভিন্নতর মাত্রা।[১৬]

কৌটিল্য বন সৃজনের পরামর্শ দিয়েছেন। কর্ষণের অযোগ্য ভূমিকে রাজা বনে পরিণত করাবেন। বনসৃজনের ফলে বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণের বাসস্থানস্বরূপ বনের সৃষ্টি হবে। পশুদের আশ্রয় মৃগবনের সৃষ্টি হবে। দ্রব্যবন রাজাকে সমৃদ্ধ করবে। হস্তীবনও রাজার প্রয়োজনে লাগবে। তৎকালীন যুগে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর অন্যতম ছিল হস্তী। কাজেই এই সমস্ত বনের সৃষ্টি পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক। কৌটিল্য বিভিন্ন প্রকার বনের রক্ষার কথা বলেছেন।

অরণ্যকে তিনি বিভাজন করেছেন চার ভাগে, যথা: দ্রব্য বন, হস্তী বন, মৃগ বন ও পশু বন বা অভয়ারণ্য।[১৭] দ্রব্য বন থেকে আহরিত সম্পদ সযত্নে রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন

তিনি। গজ-বাহিনী মৌর্য সমরযন্ত্রের স্তম্ভ বিশেষ। তাই হস্তী বনের সুরক্ষায় তিনি তৎপর। গজসম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে বিশিষ্ট আরণ্যক পরিবেশ প্রয়োজন, নগরায়ণের দুর্বার গতি যেন তাকে বিঘ্নিত না করে সেদিকে তিনি সতর্ক। হস্তী গণনা ও কঠোর সুরক্ষার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং হস্তীবধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ রূপেই ঘোষিত। রাজকীয় মৃগয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট মৃগবন ছিল। মৃগ বনে নিয়ন্ত্রিত শিকারের প্রস্তাবও অভিনব। অশোকের প্রত্নলেখ থেকেও জানা যায় যে শিকার বিনোদন থেকে তিনি সরে আসছিলেন এবং শিকার নিয়ন্ত্রণ নীতি ক্রমশ কঠোর হয়ে ওঠে। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিবর্তনকে কেবলমাত্র বৌদ্ধ অহিংসা নীতির প্রভাব দিয়ে বোধহয় ব্যাখ্যা করা যায় না। এর পিছনে সক্রিয় ছিল প্রাণী সংরক্ষণের গূঢ় বাস্তববোধ, মৌর্য প্রেক্ষিতে যা হয়তো ছিল আবশ্যিক।[১৮]

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে[১৯] পশুদের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে সংরক্ষিত বন বা অভয়ারণ্যের উল্লেখ করেছেন। এখানে সামুদ্রিক মাছ, চক্রবাক, বকপাখি, ডাকপাখি, রাজহাঁস, লালবর্ণের রাজহংসী, রঙিন পাখি, ময়ূর, টিয়া ইত্যাদি পাখি ও আরও অন্যান্য প্রাণীকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এইসব প্রাণীদের আহত বা হত্যা করলে শাস্তির বিধান তিনি দিয়েছিলেন। উপরোক্ত প্রাণীগুলির অস্তিত্ব সম্ভবত বিপন্ন হওয়ার শঙ্কা ছিল। তাই কৌটিল্য বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এরকম ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য ঘোষিত অভয়ারণ্যের ধারণা বিভিন্ন প্রজাতি পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চেতনা থেকেই সঞ্জাত। আরক্ষিত প্রাণীবধ গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য হয়েছে এবং অভয়ারণ্যের শান্তি ও স্থিতি যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয় তার জন্য প্রশাসনকেও তিনি সজাগ করেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুধাবন করলে উদ্ভিদ, জীবজগৎ ও বাতাবরণ রক্ষার তীব্র সচেতনতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শুধুমাত্র জনসাধারণকে সতর্ক করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যেমন অরণ্যাধ্যক্ষ, চারণভূমির রক্ষকদেরও তিনি দায়িত্ব পালনে শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই সময় রাষ্ট্র অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কুপ্যাধ্যক্ষের উপর দ্রব্য বন রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এছাড়াও হস্তীবনের জন্য হস্তীবনাধ্যক্ষের পদ ছিল। হস্তীবনের অধ্যক্ষ নাগবনপাল বা বনরক্ষীদের সাহায্যে হস্তীবন রক্ষা করবেন। রক্ষীরা হস্তীঘাতী যে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবেন।[২০] কোনও ব্যক্তি যদি আগুন ধরিয়ে দ্রব্যবন বা হস্তীবনের

ক্ষতিসাধন করে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে আছে।[২১] এইসব নির্দেশগুলি অবশ্যই পরিবেশের অন্যতম উপাদান পশুদের জীবন রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অর্থশাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে ক্ষুদ্র পশুকে কাষ্ঠ অথবা অন্যকিছু দিয়ে আঘাত করলে এক বা দুই পণ জরিমানা দিতে হবে। রক্তপাত ঘটালে দিতে হবে দ্বিগুণ। বড় পশুর ক্ষেত্রে এই অপরাধের জন্য দিতে হবে এর দ্বিগুণ এবং চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে।[২২] মাছ ও পাখিদের অত্যাচার করলে অপরাধীকে ২৬ পণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। সূনাধ্যক্ষের দায়িত্ব ছিল মাংস ক্রয়-বিক্রয়ের উপর লক্ষ্য রাখা। কোনও গোবৎস, ষণ্ড এবং দুগ্ধবতী ছিল অবধ্য। এদের হত্যা করলে বা অত্যাচার করে হত্যা করলে জরিমানা নির্দিষ্ট ছিল ৫০ পণ।[২৩] যেসব মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্য রাজার আদেশে অভয় লাভ করেছে এবং রাজকীয় বনে বাস করছে সেগুলিকে যারা রন্ধন করবে, প্রহার করবে ও তাদের প্রতি মারণাদি হিংসা প্রদর্শন করবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে। যে যে প্রাণীকে রক্ষা করতে বলা হয়েছে তার একটি তালিকা কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি দণ্ড নির্দিষ্ট করেছেন।

নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় নগর উদ্যানের উপযোগিতা ছিল। নগর উদ্যানে ফল ও ফুলসমন্বিত এবং ছায়াপ্রদানকারী গাছ কাটতে কৌটিল্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং জরিমানার বিধান দিয়েছেন। বৃক্ষসম্পদ যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। বৃক্ষসম্পদ রক্ষা ও বৃক্ষের উপযোগ বিষয়ে আলোচ্য সময়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস করা হচ্ছিল।

অরণ্য ও প্রাণীরক্ষাকেন্দ্রিক অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক আলোচনা, বিধি ও নির্দেশনামার সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল অশোকের রাজত্বপর্বে। প্রশাসনিক ঘোষণার দ্বারা তিনি যেভাবে উদ্ভিদ ও জীবজগৎ এবং পরিবেশ রক্ষার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বিচার দাহনের মাধ্যমে বন বিনাশের বিরুদ্ধে যেমন তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনই নতুন বনসৃজনের প্রতিও ছিল তাঁর প্রভূত প্রেরণা।[২৪] 'সোশ্যাল ফরেস্ট্রি' বা সামাজিক বনসৃজনের যে প্রয়োজন আজ গভীরভাবে অনুভূত হয় তার আধারশিলা সম্ভবত নিহিত আছে মৌর্যকালীন পরিবেশমুখী ভাবনায়।[২৫] অশোক নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ এনেছেন দূর অঞ্চল থেকে। বৃক্ষরোপণের

মাধ্যমে শুধু বাতাবরণ অনুকূল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, ছায়াময় তরুরাজি দিয়ে নান্দনিক শোভনতাকেও তিনি বৃদ্ধি করেছেন।

মৌর্যকালীন মনন ও নীতিতে পরিবেশ সচেতনতা ও সংবেদন সম্ভূত এক বাস্তববোধ ও জীবনমুখী দর্শনই প্রতিবিম্বিত। কৌটিল্যের পরিবেশ সৌহার্দ্য মনন কেবলমাত্র বন ও প্রাণীরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনের মান রক্ষা ও উন্নতির ভাবনায় এর বিস্তার ছিল বহুমুখী। মহামারীর প্রাদুর্ভাবে আবহাওয়া দূষণ সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা ছিল প্রকট।[২৬] রোগের প্রারম্ভ মাত্রই প্রশাসনকে সতর্ক না করে দিলে চিকিৎসকের শাস্তি প্রাপ্য- এই ছিল তাঁর কঠোর মনোভাব। খাদ্য সামগ্রীর মানরক্ষায় তিনি আপসহীন। বাস্তু নির্মাণ নির্দেশনা লঙ্ঘন করে যথেচ্ছ ও অপরিকল্পিত ভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গৃহ নির্মাণ, অপ্রতুল জলনিকাশি ব্যবস্থা ও ঘন জনবসতির তিনি তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। পথে-ঘাটে আবর্জনা নিক্ষেপ, জল দূষণ, তীর্থস্থানের পরিচ্ছন্নতা হানি তাঁর দৃষ্টিতে দণ্ডণীয় অপরাধ। অর্থাৎ কৌটিল্যের পরিবেশ বান্ধব চেতনা অর্থশাস্ত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

জলসম্পদকে রক্ষা করার বিষয়ে সচেতনতাও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। কৌটিল্য জলদূষকের শাস্তির বিধানের মাধ্যমে জলদূষণ নিবারণের কথা ভেবেছেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে জলাধার বা বাঁধগুলির সংযোগ থাকার ফলে এগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণীত হচ্ছিল। আর বাঁধ ধ্বংসকারীদের উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হতে থাকে।[২৭] সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত জলাধারগুলির অবৈধ ব্যবহার বা রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে কোনও জলাশয় বা নদীকে নিয়ন্ত্রণ জরিমানাযোগ্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হত।[২৮] এভাবে পরিবেশের অন্যতম উপাদান জল সংরক্ষণের উদ্যোগ কৌটিল্য গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত এটাকে মৌর্য রাষ্ট্রের প্রয়াস হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষার ভাবনা কৌটিল্যের পরিবেশ সচেতন মননে স্থান পেয়েছিল। সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত পথে আবর্জনা ছড়ালে দণ্ডের বিধান ছিল।[২৯] নগরের মধ্যে বিড়াল, কুকুর, নকুল, সাপের মৃতদেহ ফেলে রাখলে অপরাধীর ৩ পণ দণ্ড হত।[৩০] এই সমস্ত শাস্তিবিধান করা হয়েছে, যাতে মানুষ এইভাবে পরিবেশকে দূষিত না করে। অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাও যে সুস্থ পরবেশ গড়ে তোলার অন্যতম মাপকাঠি তা অর্থশাস্ত্রকার অনুধাবন করেছিলেন।

নগর বা জনপদ নির্মাণ বিষয়ে কৌটিল্যের সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো। গৃহনির্মাণ বিষয়ে কৌটিল্যের নির্দেশ থেকে মনে হয় যে তিনি পরিবেশ রক্ষা ও সৌন্দর্য বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি যথেচ্ছভাবে গৃহনির্মাণ অনুমোদন করেননি। অর্থশাস্ত্র-য় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দু'টি সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যুদ্ধে ব্যবহৃত বিষাক্ত ধোঁয়া ও পশুপাখির সাহায্যে আবহাওয়া দূষণ সম্পর্কে কৌটিল্য সজাগ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১] কৌটিল্য একদিকে বলেছেন যে, সমর অভিযানে রাজাও যেন এসব কৌশলের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ করেন, কারণ ভবিষ্যতে সেই অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর তার জনগণ যুদ্ধজনিত মারাত্মক ব্যাধিতে পীড়িত হলে দায়ী হবেন রাজাই।

দৈব দুর্বিপাকে কখনও কখনও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে। এই ব্যাপারে কৌটিল্য সচেতন ছিলেন। দৈবী বিপদ থেকে রক্ষার জন্য রাজা সচেষ্ট থাকবেন।[৩২] প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজা বীজ এবং খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার নির্মাণ করে প্রজাদের অনুগ্রহ করবেন। এছাড়া অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে রাজা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করবেন।[৩৩] এইভাবে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিকারের কথা বলেছেন। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিঘ্ন বা দূষণ এবং তার থেকে নিস্তারের উপায়ের খোঁজ করেছেন। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় রাষ্ট্র তথা চিন্তাবিদরা সচেতন ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদের ঔষধি গুনাগুণ তথা অন্যান্য কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা যে ক্রমেই বাড়ছিল তা ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি গ্রন্থগুলির বিবরণ থেকেই প্রমাণিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ ধর্মশাস্ত্রে বিবিধ বিষয়ে উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। গাছের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখের পাশাপাশি গাছ বিনষ্ট করার বিপক্ষে মনু বহুবার মত প্রকাশ করেছেন। তিনি ঔষধি নষ্ট করা, জ্বালানি কাঠের জন্য অপরিণত গাছকে বিনষ্ট করার বিপক্ষে।[৩৪] ফলদানকারী বৃক্ষ ছাড়াও গুল্ম, লতা ইত্যাদি ছেদন করলে অন্যায় হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দিয়েছিলেন মনু।[৩৫] মনুস্মৃতিতে মনু বিধান দিয়েছেন যদি কেউ ফলের গাছ, গুল্ম, দ্রাক্ষালতা বা পুষ্পপ্রদানকারী উদ্ভিদ কাটে তাহলে তাকে এক হাজার বৈদিক শ্লোক উচ্চারণ করতে হবে। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছিল। যে কোনও পুষ্ট ফল বা ফুলের ক্ষতি করলেও শাস্তিদানের ব্যবস্থা মনু রেখেছিলেন। কোনও গাছকে আঘাত করলে তার উপকারিতা বিচার করে জরিমানা আরোপ করা হত বলে জানা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যও অযথা বৃক্ষ,

লতা, গুল্ম ইত্যাদি নষ্ট করার জন্য অনুরূপ শাস্তি বা দণ্ডের বিধান দিয়েছেন।[৩৬] স্মৃতিকার বিষ্ণুও একই অপরাধের জন্য শাস্তির সুপারিশ করেছেন। পরিবেশ রক্ষায় উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা স্মৃতিশাস্ত্রে এভাবেই স্বীকৃত হয়েছে।

উদ্ভিদের পাশাপাশি পশুসম্পদ রক্ষার বিষয়েও তৎকালীন স্মৃতিকাররাও সচেতন ছিলেন। স্মৃতিগ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পশু পীড়নের বিরুদ্ধে মনু শাস্তির বিধান দিয়েছেন।[৩৭] একই ভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের কথাও বলা যায়। বিষ্ণু সংহিতায় শাস্তির বিধান কঠোরতর।[৩৮] বস্তুত প্রাচীন ভারতে পশুদের প্রতি একটি স্বাভাবিক মমত্ববোধ গড়ে উঠেছিল। যার পরিচয় পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্র এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে পশুনির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুশাসনের মধ্যে। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিকারেরা পশু পীড়নকে গভীর অপরাধ বলে মনে করতেন।

মৃগয়ার উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েও শুক্রাচার্য তাঁর শুক্রনীতিতে[৩৯] নিষ্ঠুরতার জন্য শিকার পরিত্যাগ করতে বলেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুকরণে, কার্যত সারসংক্ষেপ রূপে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে যে কামন্দকের নীতিসার রচিত হয়, তাতে কামন্দক রাজকীয় মৃগয়া বা শিকারযাত্রাকে একটি ব্যসন বলেছেন। এই ব্যসনকে শুধুমাত্র ক্রীড়া হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। এই ব্যসনে আসক্ত না হতে উপদেশ দিয়েছেন এবং শিকারের সমস্ত আইনকে যথাযথ মানতে বলেছেন।[৪০] অর্থাৎ মৃগয়া ব্যসনের মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণীদের উপর যে আঘাত নেমে আসে তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস এই সমস্ত সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদরা তুলে ধরেছিলেন।

এছাড়া মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য জলদূষণকারীর জন্য শাস্তির বিধান করেছেন। জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং জলসম্পদ রক্ষার বিষয়েও প্রাচীন শাস্ত্রকাররা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। আর এই কারণেই রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার মধ্যে জল সংক্রান্ত আইনগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছিল। কেউ জলাধার ভাঙলে তাকে জলে ডুবিয়ে অথবা শিরশ্ছেদ করে মারার বিধান দিয়েছিলেন মনু।[৪১] যাজ্ঞবল্ক্যও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪২] অপর স্মৃতিগ্রন্থকার বিষ্ণুর মতে সেতুভঙ্গকারীকে রাজা প্রাণদণ্ড দেবেন।[৪৩] শাস্ত্রীয় এই বিধিবিধানগুলির বাস্তবিক প্রয়োগ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এগুলির পরিবেশগত তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

রাজতান্ত্রিক তথা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আশ্রিত জটিল রাষ্ট্র উত্তর ভারতে এবং পরে দাক্ষিণাত্যে দেখা দেওয়ায় আদর্শ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে

আলোচনা ও বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ হতে থাকে। অর্থশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। জল, গাছপালা, বনভূমি ও পশুদের সুরক্ষা সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে প্রাচীন চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি এভাবেই শাস্ত্রীয় বিধির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যে মানুষের চিন্তাধারার প্রতিফল দেখা যায়। পরিবেশ সচেতনতা প্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পরিসর বিশাল। এই সুবিশাল সাহিত্যে কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, কোথাও বা কিছুটা ইঙ্গিতের আকারে আবার কোথাও স্পষ্টভাবে পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে উদ্ভিদ ও অরণ্যের সংরক্ষণ এবং পশুপাখিদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছে। কৌটিল্য বৃক্ষ ও পশুপাখির রক্ষা-ই শুধু নয়, বনসৃজনের পরামর্শও দিয়েছেন। বন্যা, অনাবৃষ্টি, মহামারি প্রভৃতি যেসব প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশ দূষিত হয় তা প্রতিকারের উপায়েরও নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীকালের সাহিত্যেও পরিবেশ সচেতনতার প্রতিফলন দেখা যায়।

কুষাণদের সময় নগরায়ণের তুঙ্গী অবস্থায় পোড়া ইটের বহুল ব্যবহারের দরুন বিপুল পরিমাণ বৃক্ষচ্ছেদন সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালেও গাঙ্গেয় অববাহিকায় ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অরণ্য ধ্বংস করে কৃষির সম্প্রসারণ পূর্বেকার মতোই চলছিল।[৪৪] এই ঘটনাগুলি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল বলেই ধারণা করা যায়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জনপদের সম্প্রসারণের পাশাপাশি চারণভূমির প্রয়োজনেও অরণ্য পরিষ্কার করা হত, যা সম্ভবত আলোচ্য পর্বে বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে রচিত বৃহৎসংহিতা'য় উল্লিখিত বরাহমিহিরের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। এখানে তিনি প্রকৃতিক বিপর্যয়ের উল্লেখ করেছেন, যদিও সেগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্রে। প্রথমত, নদী অববাহিকায় নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে নদীর পাড় পলি ধরে রাখায় ব্যর্থ হওয়ার ফলে বারংবার বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটবে।[৪৫] দ্বিতীয়ত, তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে ভূমি-অরণ্য অনুপাতে পরিবর্তন ঘটায় নদীর প্রবাহ বিপর্যস্ত হবে[৪৬], যার ফলে জলজ ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটবে[৪৭] এবং জলাধার ও হ্রদ শুকিয়ে যাবে।[৪৮] তৃতীয়ত, অরণ্য সংহারের ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে এবং দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। কাজেই মনে হয় যে আলোচ্য পর্বে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন সম্পর্কে বরাহমিহির অবগত ছিলেন। গুপ্ত শাসনকালে মধ্যগাঙ্গেয় অববাহিকায় পর্যাপ্ত অরণ্যের হ্রাসপ্রাপ্তি

বিপদসংকেত বহন করে এনেছিল এবং তার প্রভাবও সম্ভবত অনুভূত হয়েছিল। বৃহৎসংহিতা'য় সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশটি দুর্ভিক্ষের, বত্রিশটি খরা বা অনাবৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদরা নানারকম শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আরোপ করে পরিবেশ সুরক্ষার মূল উপাদান জল, বৃক্ষ, বন ও বন্যপ্রাণীকুলকে রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন। যার প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্যে। পরিবেশ রক্ষার চিন্তাভাবনার সঙ্গে অর্থনীতির ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকলেও প্রাচীন ভারতীয়রা তাদের জীবনধারণের পদ্ধতির সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তেমনি পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্যোগও রাষ্ট্র তথা শাসক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই নয়, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনাতেও পরিবেশের গুরুত্বকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করা হতে থাকে। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তৎকালীন মানুষের পরিবেশ সচেতনতার সম্যক পরিচয় প্রতিফলিত হয়।

সূত্রনির্দেশ:

১। কল্যাণ চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, ভারতের বন ও বন্যপ্রাণী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. x.

২। Mahesh Rangarajan, India's Wildlife History,An Introduction, Permanent Black, Delhi, 2001, pp. xii-xiv.

৩। M. Vannucci, Ecological Readings in the Veda, D.K. Print World, New Delhi, 1994, p.52.

৪। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত (সারানুবাদ), রাজশেখর বসু (অনূ.), এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি., কলকাতা, ১৪১৮ ব., 'আদিপর্ব', 'খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায়', পৃ. ৯৭-৯৯। আরও দ্র. কাশীদাসী মহাভারত, পূর্ণচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত, 'আদিপর্ব', 'খান্ডব বন দাহন', ১৩৩২ ব., পৃ. ১১৫-১২০।

৫। রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন (Material Culture and Social Formations in Ancient India), গৌতম নিয়োগী (অনূ.), ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৫।

৬। Vijay Kumar Gupta, Forest and Environment in Ancient India, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 2010, p. 151.

৭। Martin Batchelor and Kerry Brown Seds.V. Buddhism and Ecology, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1994, p. 24, Christopher Key Chapple Sed.V. Jainism and Ecology, Nonviolence in the Web of Life, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi,2006, pp. 6-7.

৮। রোমিলা থাপার, আখ্যানাবলী এবং ইতিহাসের নির্মাণ (Narratives and the Making of History), নূপুর দাশগুপ্ত (অনু.), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৬-১৭।

৯। Romila Thapar, Ancient Indian Social History, Some Interpretations, Orient Longman Private Limited, New Delhi, Reprint, 2004, p.37.

১০। ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনু.), জাতক, প্রথম খন্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৮৪ ব., জাতক সংখ্যা ২৫, ৮১।

১১। তদেব, জাতক সংখ্যা ১১৬, ১৩৯।

১২। B. N. Mukherjee, The Character of the Maurya Empire, J.B. Enterprises, Calcutta, 2000, p.17.

১৩। Romila Thapar, The Mauryas Revisited, K. P. Bagchi & Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 1987, p.14.

১৪। K. A. Nilkantha Sastri Sed.V. Age of the Nandas and Mauryas, Motilal Banarsidass, Delhi, 1952, p.172.

১৫। Arthasastra, 2.17, R. P. Kangle Sed. & tr.V, The Kau?ililya Arthasastra, Pt. II, Motilal Banarsidass, Delhi, Reprint, 2011.

১৬। শুক্লা দাস, 'প্রাচীন ভারতে পরিবেশ সচেতনতা ও সংবেদন: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোকে', শেখর ভৌমিক (সম্পা.), সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা, ইন্দিরা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৭৩-১৭৮।

১৭। Arthasastra, 2.26.

১৮। Sukla Das 'Forest Policy of the Mauryas—An Ecological Perspective', The Quarterly Review of Historical Studies, Vol. 36, Nos. 3-4, 199-97– pp. 22-35.

১৯। Arthasastra, 4.3.

২০। Ibid, 2.2.8.

২১। Ibid,, 4.2.20.

২২। Ibid,, 3.33.19, 26-27.

২৩। Ibid, 3.26.10-11.

২৪। Romila Thapar, Asoka and the Decline of the Mauryas, Oxford University Press, London, 1961, pp. 68-69.

২৫। শুক্লা দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

২৬। Arthasastra, 4.3.

২৭। Ibid, 3.9.28, 4.11.17.

২৮। Ibid, 3.9.31, 3.9.38.

২৯। Ibid, 2.36.26-27.

৩০। Ibid, 2.36.33.

৩১। L. N. Rangarajan Sed.V, Kautilya- The Arthasastra, Penguin Books, New Delhi, 1992, pp. 728-729.

৩২। Arthasastra 4.3.1-2.

৩৩। Ibid, 4.3.17-18.

৩৪। Manu, 11.65— G. Buhler, The Laws of Manu, Clarendon Press, Oxford, 1886.

৩৫। Ibid, 11. 143.

৩৬। যাজ্ঞবল্ক্য, ২.২২৭-২২৯, ২.২৩০-২৩২; সুমিতা বসু (অনূ.) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪০৭ বৃ পৃ. ৩০৫।

৩৭। Manu, 8.286, 297-298— 11.69.

৩৮। Viu, 5.47-50, 52-53— Julius Jolly Str.V, The Institute of Vishnu, Clarendon Press, Oxford, 1880.

৩৯। Benoy Kumar sarkar (tr.), The Sukraniti, Oriental Books, New Delhi, Reprint, 1975.

৪০। Nitisara 15.19-22— Rajendralala Mitra Sed.V, The Nitisara, or The Elements of Polity by Kamandaki, The Asiatic Society, Calcutta, 1982.

৪১। Manu, 9. 279.

৪২। যাজ্ঞবল্ক্য, ১১.২৭৮।

৪৩। Viu, 5. 15.

৪৪। Vijay Kumar Thakur, 'The Post-Kusana Urban Decline in India-Implications of Ecology', Proceedings of Indian History Congress, Warangal, 1992, Vol. 53, pp. 97-105.

৪৫। Brihatsamhita, 19.1, 32.10; V. S. Shastri & M. R. Bhatt Strs.V, Varahamihiraós Brihat Samhita, V.B. Soobbiah and Sons, Bangalore, 1946.

৪৬। Ibid., 3.16, 19.1, 21, 17.5.

৪৭। Ibid., 5.42.

৪৮। Ibid., 19.21.

ভারতীয় দর্শনে দুঃখ ও দুঃখবোধ: একটি পর্যালোচনা

সুশোভন দে *

সারাংশ: ব্যবহারিক জীবনে দুঃখের অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে দুঃখজয় ও দুঃখনিবৃত্তির সাধনাই ভারতীয় দর্শনচর্চার মূল। চার্বাকভিন্ন প্রায় সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মানবজীবনে আগত দুঃখ, গ্লানি, যন্ত্রণা, শোক প্রভৃতিকে ব্যাপকার্থে দুঃখরূপে চিহ্নিত করে সেই দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তির উপায় নিরূপণ করার অভিপ্রায়েই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তি-বুদ্ধি ও অনুভবের বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে, প্রাকৃত জীবনে সুখ ও দুঃখ উভয়েই অনুভূয়মান— একথা ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বীকার করলেও কেন তাঁরা ব্যবহারিক জীবনে সুখ বা আনন্দের অনুভূতির চাইতে দুঃখের অনুভূতিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন ? ব্যবহারিক জীবনে সুখের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অধ্যাত্মবাদী ও মোক্ষমার্গী ভারতীয় দার্শনিকগণ কেন ব্যবহারিক জীবনকে দুঃখপূর্ণ বলেছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানগুলিতে বিধৃত দুঃখ ও দুঃখানুভূতির স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। তাই ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলিতে কিভাবে ব্যবহারিক জীবনে দুঃখপূর্ণতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং কোন্ ভাবনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখনিবৃত্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই বিষয়ক আলোচনার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হল এই নিবন্ধ।

মূলশব্দ: অধ্যাত্মবাদ, সুখ, দুঃখ, সত্য, মোক্ষ প্রভৃতি।

ভারতীয় দার্শনিক আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা সত্যের অপরোক্ষ (immediate) উপলব্ধি। সত্য জ্ঞান (knowledge) ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য, উভয়

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, দর্শন বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী কলেজ, পুরুলিয়া।
e-mail: deysushovan1983@gmail.com

দর্শনেই সমান গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। ভারতীয় দর্শনে একদিকে যেমন ভ্রান্তজ্ঞানের সাথে সত্যজ্ঞানের পার্থক্য সবিশেষরূপে আলোচিত হয়, তেমনি পরোক্ষ (mediate) সত্যজ্ঞান ও অপরোক্ষ (immediate) সত্যজ্ঞান, এতদুভয় প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের পার্থক্যও প্রায় সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়ে থাকে। বিশেষতঃ সত্যের অপরোক্ষ বা সরাসরি উপলব্ধিই যে দর্শনচর্চার পরম লক্ষ্য, তা অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করেন।

অপরোক্ষ সত্য উপলব্ধির প্রতি এইরূপ অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে ভারতীয় দার্শনিকগণের এইরূপ সত্যনিষ্ঠা ও অপরোক্ষরূপে সত্য অনুসন্ধানের কারণ হল এই যে, প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক (চার্বাক ব্যতীত) মনে করেন যে মানবজীবনে আগত যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-যন্ত্রণার মূল হল মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম। তাই মিথ্যাজ্ঞান দূরীকরণ তথা ভ্রম নিবারণের মধ্যে দিয়ে সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্টের চিরতরে অবসানই মানবের পরম অভীষ্ট বা পরম কাম্য। কিন্তু জগৎ, জীবন ও আত্মস্বরূপ সংক্রান্ত যে ভ্রমজ্ঞান মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখ-গ্লানিতে নিমগ্ন করে রেখেছে তার আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিরন্বয় বিনাশ পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত সত্যজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ দুঃখের দহন কেবল তার নিজের কাছেই অপরোক্ষরূপে অনুভূত হয়, আর সেই অপরোক্ষরূপে অনুভূত দুঃখ যখন সেই ব্যক্তিমানুষের দৃশ্যমান রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি অবলোকন করে অপরাপর ব্যক্তিমানুষ সেই দুঃখ-যন্ত্রণার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নিজ নিজ দুঃখের উপলব্ধি তার নিজের কাছে অপরোক্ষ। আর পরোক্ষ সত্যের জ্ঞান সেই অপরোক্ষরূপে অনুভূয়মান দুঃখ-গ্লানির মোচনে পারঙ্গম হয় না, বরং অপরোক্ষ সত্যজ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়েই মানুষ তার জীবনরহস্য ও স্বস্বরূপের উপলব্ধি করে যাবতীয় দুঃখ-গ্লানির চিরতরে মোচনে সক্ষম হয়। এই সুপ্রাচীনকাল ব্যাপী ভারতীয় দার্শনিক পরম্পরায় পরম তত্ত্ব বা সত্য অপরোক্ষরূপেই অনুসন্ধেয়।

মোক্ষাভিলাষী ও তত্ত্বসন্ধানী ভারতীয় দার্শনিকের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সকলে সদর্থকভাবে গ্রহণ করেন নি। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ে থাকে যে তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবনে দুঃখ, বেদনা, পীড়া, শোক, তাপ ইত্যাদির দিকটিই অধিকতর গুরুত্ব দেন, কিন্তু জীবন তো শুধু দুঃখের নয়, জীবনে আনন্দ-উচ্ছাস,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই আছে। সুতরাং সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মিলিয়েই মানুষের জীবন। প্রাকৃত দৃষ্টিতে এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক আচার্যগণের বিচারধারা অনুযায়ী জীবনে সুখের চাইতে দুঃখই অধিকতর রূপে অনুভূত হয়। অবশ্য যে সকল জীবের সুখ ও দুঃখের পার্থক্যবোধ নেই তাদের পক্ষে এরূপ অবধারণা সম্ভব নয়। আবার যাঁরা অনিবার্য দুঃখপ্রাপ্তির ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে নিয়ত সুখ ও সুখদায়ক বিষয়গুলির প্রতি ধাবমান, তাঁদের কাছে এই অনুভূয়মান জগৎ ও জীবন বড় মনোরম ও মুগ্ধকররূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করেন ব্যবহারিক জীবনে অনুভূত সুখ ও দুঃখের স্বরূপ অবধারণ করলেই সিদ্ধ হয় যে জগৎ ও জীবন সত্যই দুঃখময়। তবে একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে ভারতীয় দর্শন জীবনের দুঃখময়তাকেই চূড়ান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করেনি, বরং অনিবার্য দুঃখসাগর অতিক্রমণ তথা সর্বপ্রকার দুৎখজয়ের সাধনাই ভারতীয় দর্শনচর্চার মূল ভিত্তি। ভারতীয় দার্শনিক আচার্যগণ জীবনে আগত দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় করে সেই দুঃখের পরিসমাপ্তির পথ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং দুঃখ ও নৈরাশ্য ভারতীয় দার্শনিকের কাছে অনিবার্য সত্য হলেও তা জীবনের অন্তিম পরিণতি নয়, বরং দুঃখমুক্তিতেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানে প্রকাশিত দুঃখের স্বরূপ আলোচনার মধ্য দিয়ে দার্শনিক আচার্যগণ কীরূপে প্রাকৃত সুখের পরিবর্তে দুঃখকেই জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাধারার ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের অণুমাত্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বেদপ্রামাণ্যবাদী ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্য দর্শনকে সর্বাধিক প্রাচীন দর্শন বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়। সেই সাংখ্য দর্শনে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণকে সমস্ত বস্তুর মৌলিক উপাদান বলা হয়েছে। এর মধ্যে রজঃ গুণ দুঃখাত্মক-রূপে পরিগণিত হয় বলে সকল জাগতিক বস্তুর মধ্যে দুঃখস্বরূপতা নিহিত আছে, একথা সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার প্রারম্ভেই দুঃখের ত্রিবিধ প্রকার উপস্থাপন করেছেন এবং সেই দুঃখত্রয়ের অভিঘাতে জর্জরিত মানুষের দুঃখনাশের জন্য সাংখ্যশাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপপাদন করেছেন। সাংখ্যকারিকায় উল্লিখিত দুঃখত্রয় হল, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। জ্বর, শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানা রোগবশতঃ যে সকল শারীরিক দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির দ্বারা যে সকল মানস দুঃখ উৎপন্ন হয় সেগুলি আধ্যাত্মিক দুঃখের অন্তর্গত। মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের দ্বারা আগত দুঃখ হল আধিভৌতিক

দুঃখ, আর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির দ্বারা কিংবা যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতির দ্বারা যে দুঃখের সৃষ্টি হয় তার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্যাচার্যের মতে সকল জীব-ই এই দুঃখত্রয়ের অভিঘাতে জর্জরিত, অর্থাৎ জীবনে দুঃখ আছে, এটি অনুভূতিশীল সর্ব জীবেরই স্বীয় অনুভবসিদ্ধ।[১]

সাংখ্যের সমানতন্ত্ররূপে পরিগণিত পাতঞ্জল যোগদর্শনে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ দুঃখ স্বীকৃত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে পাতঞ্জল যোগসূত্রে ও যোগভাষ্যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত ও আলোচিত হয়েছে, যা সাংখ্যের পরিপূরক হিসাবে স্থিরীকৃত হতে পারে। যোগসূত্রকার বলেছেন, 'দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ' (যোগসূত্র, ২/১৫);[২] অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন যোগীর কাছে বিষয়মাত্র-ই দুঃখকর। তাৎপর্য এই যে, যদিও সুখ ও সুখের যাবতীয় উপাদান প্রাকৃতজন বা ব্যবহারিক জীবের কাছে অনুকূলরূপে জ্ঞাত হয়, তা সত্ত্বেও বিবেকবান যোগীর কাছে দুঃখ-ক্লেশের ন্যায় সুখ ও সুখদায়ক বিষয়গুলিও দুঃখরূপেই অনুভূত হয়। সুখ ও সুখদায়ক পদার্থমাত্রের প্রতি এরূপ বিপরীতধর্মী অনুভবের কারণ হিসাবে যোগদর্শনে বলা হয়েছে, বিবেকবান ব্যক্তির দৃষ্টিতে যেকোনো প্রকার ভোগের (সুখ-দুঃখের অনুভূতি) মধ্যেই পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ, এই ত্রিবিধ দুঃখ নিহিত থাকে।[৩] সুখভোগের দ্বারা বারংবার সুখভোগের অভ্যাস তৈরী হয় এবং এর দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রমশঃ চঞ্চল ও অশান্ত হতে হতে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ হয় ও জীবকে অনিবার্য দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হতে হয়। এটিই পরিণাম দুঃখ। আবার সুখলাভের চেষ্টার কারণে জীব জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অন্যের উপকার অথবা অপকার করে, এর দ্বারা ব্যক্তি যে পাপ-পুণ্য সঞ্চয় করে তার থেকে উৎপন্ন দুঃখ হল তাপ দুঃখ। সংস্কার দুঃখের স্বরূপ নিরূপণে যোগভাষ্যে বলা হয়েছে, সুখের অনুভব থেকে সুখ-সংস্কার, আর দুঃখের অনুভব থেকে দুঃখ-সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই উভয় প্রকার সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে সুখ-দুঃখের স্মৃতি হয় এবং সেই স্মৃতি থেকে রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ (বিতৃষ্ণা) উৎপন্ন হয় যা ইন্দ্রিয় ও চিত্তচাঞ্চল্য তৈরী করে ক্রমে দুঃখজনক হয়। এই দুঃখই সংস্কার দুঃখ। অবিবেকী ব্যবহারিক জীব এই সকল দুঃখের প্রতি সর্বদা অনুভূতিসম্পন্ন হয় না, কিন্তু বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন যোগীগণের চিত্ত অত্যন্ত মার্জিত ও সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ হওয়ায় এই সকল দুঃখস্রোত তাঁদের নিরন্তর পীড়া দেয় এবং সুখ ও সুখদায়ক পদার্থের প্রতি বিশেষ বৈরাগ্য উৎপন্ন করে।

বেদপ্রামাণ্যবাদী ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বাদশ প্রমেয়ের একাদশতম প্রমেয় হল দুঃখ। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে দুঃখমুক্তিকে 'অপবর্গ' নামে দ্বাদশতম প্রমেয়রূপে উল্লেখ করেছেন এবং দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধি না হলে অপবর্গরূপ মুক্তির অধিকার জন্মে না বলে অপবর্গের স্বরূপ উল্লেখের পূর্বে দুঃখের লক্ষণ নির্বচন করেছেন এইভাবে, 'বাধনালক্ষণং দুঃখম্' (ন্যায়সূত্র,১/১/২১)।[৪] ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের দৃষ্টিতে 'বাধনা' শব্দের অর্থ হল, পীড়া বা তাপ। যা জীবের কাছে প্রতিকূলরূপে অনুভূত বা জ্ঞাত হয়, ন্যায়ভাষ্যকারের মতে তা-ই হল পীড়া বা তাপ, যার নামান্তর হল দুঃখ। পূর্বোক্ত ন্যায়সূত্রটিতে কথিত 'বাধনালক্ষণ' শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেছেন যে যা দুঃখানুষক্ত তাই দুঃখ। জগৎ-সংসারে সুখ ও দুঃখ, দুই-ই আছে। তবে সর্বদাই সুখ ও সুখদায়ক বস্তুর সাথে দুঃখ কিংবা দুঃখদায়ক বস্তু এসে উপস্থিত হয়। এটি সকলেরই মানস-প্রত্যক্ষঅনুভবসিদ্ধ। একেবারে দুঃখসম্বন্ধশূন্য চিরস্থায়ী সুখ নেই। তাই ব্যবহারিক জীবনে সুখভোগ করতে হলে অনিবার্যভাবেই দুঃখভোগও করতে হয়। সেক্ষেত্রে মুখ্যরূপে অনুভূত দুঃখ ও তার উপাদানগুলির ন্যায় সুখ ও সুখদায়ক বস্তুসকলও মুমুক্ষু বা মুক্তিকামী ব্যক্তির কাছে দুঃখরূপেই প্রতীত হয়। অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্বদাই দুঃখ এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুসমূহকে যেমন মুখ্য দুঃখরূপে ভাবনা করেন, তেমনি সুখ ও সুখদায়ক বস্তুকেও গৌণ দুঃখরূপে ভাবনা করেন ও সেগুলিকে পরিত্যাগের জন্য প্রযত্নবান হন। আর মোক্ষার্থীর এইরূপ অভিপ্রায়কে স্বীকৃতি দানের জন্য মহর্ষি গৌতম সুখকে দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে পৃথকরূপে উল্লেখ করেননি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকরের মতে দুঃখ একুশ প্রকার। দুঃখের আয়তন (ভোগায়তন) শরীর, দুঃখের সাধন (ভোগসাধন) ষড়বিধ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন), এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ষড়বিধ বিষয়, সেই ষড়বিধ বিষয়ে ষড়বিধ বুদ্ধি এবং সুখ হল গৌণ দুঃখ এবং এগুলির সাথে মুখ্য দুঃখ-কে মিলিয়ে সর্বমোট একুশ প্রকার দুঃখ বার্ত্তিককারের মতে স্বীকৃত হয়েছে।[৫]

ন্যায় দর্শনের সমানতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে অবশ্য সুখ ও দুঃখ, উভয়কেই জীবের মানস প্রত্যক্ষগোচর গুণপদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রে স্পষ্টতই সুখ ও দুঃখের ভেদ ঘোষিত হয়েছে, 'সুখদুঃখয়োরর্থান্তরভাবঃ' (বৈশেষিক সূত্র, ১০/১/১)।[৬] জীবাত্মায় অনুকূলরূপে বেদনীয় বা অনুভূত পদার্থ হল সুখ, আর জীবের কাছে প্রতিকূলরূপে জ্ঞাত বা অনুভূত পদার্থ হল দুঃখ। বৈশেষিকমতে সুখ ও

দুঃখ উভয়েই আত্মা ও মনের সংযোগের দ্বারা শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মায় তথা দেহসমন্বিত জীবাত্মায় উৎপন্ন হয়, যার নিমিত্ত কারণ (instrumental cause) হল জীবের কর্মজনিত পাপ-পুণ্য বা ধর্ম ও অধর্ম। পুণ্য কর্ম বা ধর্মাচরণের দ্বারা সুখ, আর পাপ কর্ম বা অধর্মাচরণের দ্বারা দুঃখ উৎপন্ন হয়। ন্যায়-বৈশেষিকমতে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তির পরক্ষণে 'আমি সুখী' কিংবা 'আমি দুঃখী', এই আকারে সুখ ও দুঃখের মানস প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান হয়। সুতরাং স্পষ্টত-ই উপলব্ধ হয় যে সুখ ও দুঃখ পরস্পর পৃথক এবং এতদ্ উভয়ের অনুভূতিও এক নয়। কেবল মুমুক্ষু ব্যক্তির বৈরাগ্যের উৎকর্ষতা সম্পাদনের জন্যই যাবতীয় সুখ ও সুখসাধন (সুখপ্রাপ্তির উপায়) ন্যায় দর্শনে গৌণরূপে দুঃখের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বেদান্ত দর্শনে দুঃখ ও দুঃখের অনুভব বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে, জগতে যা পারমার্থিক বা মূল পদার্থ তা প্রকৃতপক্ষে আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপ পদার্থই হল পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা— যা এক এবং অদ্বিতীয়, সর্বভূতে অন্তঃস্যূতরূপে বিরাজমান বা সর্বব্যাপী, সর্বান্তরযামী, অসীম, অনাদি ও অনন্ত। অনাদিকাল থেকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা (যাবতীয় ভ্রমের সংঘটক শক্তি) ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপতাকে জীবের কাছে আবৃত করে রেখেছে। ব্যবহারিক জীবনে আমাদের যে সুখের অনুভূতি হয়, তা প্রকৃতপক্ষে জীবের স্বস্বরূপতা তথা ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতার ক্ষুদ্র অভিব্যক্তিমাত্র। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের জ্ঞানের উদয় তথা অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি না ঘটে, ততক্ষণ সেই ব্রহ্মানন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। ফলতঃ অজ্ঞানের প্রভাবেই জীবাত্মার দুঃখের অনুভব হয়, দুঃখ কোন মৌলিক পদার্থ নয়। অদ্বৈত বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব অনুযায়ী ভ্রমাত্মক জগৎ বৈচিত্র্যের কারণীভূত অজ্ঞান বা অবিদ্যা থেকে অভিব্যক্ত জীবদেহের অভ্যন্তরবর্তী করণ বা অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত মিলিয়েই অন্তঃকরণ) ধর্ম হল সুখ, দুঃখ, সংকল্প প্রভৃতি। ব্যবহারিক জীবনে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে যখন কোন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয়, তখন অন্তঃকরণ ঐ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বিষয়দেশে বহির্ভূত হয়ে ঐ বিষয় বা বাহ্যবস্তুটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অন্তঃকরণের বিষয়াকার প্রাপ্তিকে বলা হয় অন্তঃকরণবৃত্তি। এই অন্তঃকরণবৃত্তি যদি অনুকূল বা প্রীত্যত্মক বস্তু বিষয়ক হয়, তাহলে সেই বস্তুর দর্শন, প্রাপ্তি প্রভৃতিতে অন্তঃকরণে আনন্দস্বরূপ জীবাত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাকে অদ্বৈত বেদান্তে সুখ বলে। ঐ সময়ে অন্তঃকরণে 'আমি সুখী' ইত্যাদি আকারে যে সুখকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়

তা হল সুখের উপলব্ধি। আর অন্তঃকরণবৃত্তি যদি প্রতিকূল বা দ্বেষজনক বস্তুবিষয়ক হয়, তাহলে সেইকালে অন্তঃকরণে বা হৃদয়দেশে 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি আকারে যে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল দুঃখানুভব বা দুঃখের উপলব্ধি। সুতরাং অদ্বৈত বেদান্তমতে প্রাকৃত সুখ-দুঃখ অজ্ঞানকল্পিত অন্তঃকরণের ধর্ম এবং সুখানুভব ও দুঃখানুবভব সেই অন্তঃকরণের পরিণাম বা অবিদ্যাবৃত্তি।[৭] অর্থাৎ জীবের রোগ, শোক, মৃত্যু, লাঞ্ছনা, অপমান ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখাত্মক অনুভব হল এই অবিদ্যাবৃত্তি। তাই এই মতে, যাবতীয় দুঃখাত্মক অনুভবের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক পরিসমাপ্তির জন্য প্রয়োজন হল অবিদ্যাবৃত্তির নিরোধ যা কেবল সম্ভব হতে পারে অজ্ঞানের নিবৃত্তি বা উচ্ছেদের দ্বারা।

অবৈদিক বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে যে সমগ্র জগৎ ক্ষণিক ও দুঃখস্বরূপ। বুদ্ধদেব-কথিত চতুর্বিধ আর্যসত্যের মধ্যে প্রথমটিই হল দুঃখ (সর্বং দুঃখম্)। বুদ্ধদেবের মতে যে সুখ অনন্তকাল স্থায়ী হয় না, সেই সুখ সুখ-ই নয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত সুখ চিরস্থায়ী নয়, তাই তা দুঃখের নামান্তর। সমগ্র জীবন দুঃখের সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্রে বুদ্ধ মানবজীবনে যত প্রকার দুঃখ আছে সেগুলি আটটি প্রকার বা পর্যায়ভুক্ত করেছেন। যথা, জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ, এবং আসক্তির কারণে উদ্ভূত রূপ (চতুর্ভূত ও তাদের বিকারস্বরূপ দেহ), বেদনা (সুখ-দুঃখের অনুভূতি), সংজ্ঞা (প্রত্যক্ষ), সংস্কার (মানসিক প্রবণতা) ও বিজ্ঞান (চেতনা), এই পঞ্চস্কন্ধও দুঃখ।[৮] সুতরাং বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজীবন এক নিরন্তর দুঃখপ্রবাহ, যেখানে প্রতিটি বস্তু ও ঘটনা এক একটি দুঃখ-তরঙ্গের ন্যায় ব্যক্তিমানুষের কাছে আবির্ভূত হয়। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ বলতে কেবল শারীরিক কিংবা মানসিক পীড়া বা যন্ত্রণাকে বোঝানো হয়নি। বৌদ্ধগণ যখন সমগ্র জগৎ ও জীবনকে দুঃখময় বলেন তখন তাঁরা সমগ্র জগৎ ও জাগতিক বস্তুর যে-কোনরূপ অস্তিত্বকে দুঃখরূপে গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গী যোগ দর্শনে উল্লিখিত বিবেকীর দুঃখভাবনার সাথে বিশেষভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। বৌদ্ধমতে দুঃখ ও দুঃখের জ্ঞান বস্তুতঃ অভিন্ন।

বেদবিরোধী জৈন দর্শন অনুসারেও মন ও ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ব্যবহারের চালিকা তত্ত্ব হল সুখ ও দুঃখ। সুখ বিধেয়াত্মক বা ইতিবাচকরূপে এবং দুঃখ নিষেধাত্মকরূপে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াশীলতার গতিপথের নির্ধারণ করে থাকে। সুখানুভূতিলাভের বারংবার প্রচেষ্টা ও দুঃখানুভূতিকে এড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই জীব ক্রোধ,

মান, লোভ, ঘৃণা, ভয়, রাগ, শোক ইত্যাদি কষায়ের দ্বারা কর্মস্রোতকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিরন্তর দুঃখ-যাতনা ভোগ করে। সুতরাং জৈনমতে দুঃখানুভূতি যেমন জীবের বন্ধনের কারণ হয়, তেমনি জীবের কর্মবন্ধন লাভের অনিবার্য পরিণাম হল দুঃখানুভূতি।

বেদনিন্দুক ও ঘোরনাস্তিক্যবাদীরূপে সুবিদিত চার্বাক দর্শন যখন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিরূপ সুখকে পরমার্থরূপে ঘোষণা করেন তখন তাঁরা কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের দুঃখময়তাকে অস্বীকার করেননি, তবে তাঁরা 'মাছে কাঁটা আছে বলে কি মাছ পরিত্যাগ করব?' —এই জাতীয় চিন্তাকে অবলম্বন করে দৈনন্দিন জীবনে অনুভূয়মান যাবতীয় দুঃখ-গ্লানিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে কিংবা অনিবার্য দুঃখকে জয় করে মানুষের কাছে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিরূপ সুখভোগের দর্শন প্রচার করেছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে জীবনমুখী এবং জীবনযাত্রার উন্নতি তথা অভ্যুদয়ের সহায়করূপে মানুষের কাছে গ্রহনীয় ও অনুসরণীয়রূপে প্রতীত হয়। কিন্তু ভোগসুখের অবধি আছে (তা সে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, যে প্রকার সুখ হোক না কেন) এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ জীবনেরও শেষ আছে। চার্বাকগণও এই অনিবার্য সত্যকে স্বীকার করেন এবং স্থূল দৈহিক মৃত্যুতেই জীবনের আত্যন্তিক পরিসমাপ্তি বলে গ্রহণ করেন। সুতরাং চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার করলে জীবনের অন্তিম পরিণতিকে বিচ্ছিন্নতা, নৈরাশ্য ও অন্তহীন শূন্যতায় পর্যাবসান বলে স্বীকার করে নিতে হয়। অপরদিকে সেই নৈরাশ্যমূলক ভাবনার প্রতিষেধকরূপে মোক্ষবাদী ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানগুলি ব্যবহারিক জীবনে আগত ও অনুভূত বিষয়সমূহের দুঃখাত্মকতা বর্ণন করে সেই যাবতীয় দুঃখের থেকে চিরন্তন পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকের সেই আত্যন্তিক দুঃখহীনতার পথে যাত্রা যেন দুঃখভারে নিমজ্জিত, ক্লিষ্ট ও মলিন জীবন থেকে দুঃখমুক্ত, মৃত্যুঞ্জয় ও আলোকময় নবজীবনের পথে অভিযাত্রা।

অনুরূপ তাৎপর্যেই বেদবাদী মীমাংসকগণ কর্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগের ব্যাখ্যানের দ্বারা জীবনে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের ব্যবস্থাপনা নির্দেশ করলেও উক্তরূপ ঐহিক সুখের সাথে অনিবার্য দুঃখমিশ্রণ ও অস্থায়িত্ব এবং পারলৌকিক সুখ তথা স্বর্গের অনিত্যতা জেনে মানুষকে স্থায়ী ও অবিমিশ্র সুখ বা আনন্দের প্রতি অভিমুখিন করার জন্য ধর্মকর্ম বা কর্তব্যকর্মের বিধান দিয়েছেন। মীমাংসা দর্শনের আধারে রচিত অর্থসংগ্রহ গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার লৌগাক্ষিভাস্কর বলেছেন, 'যাগাদি ধর্ম যে উদ্দেশ্যে বিহিত সেই উদ্দেশ্যে কৃত হলে সেই উদ্দেশ্যের হেতু হয়। ঈশ্বরে ফলসমর্পণবুদ্ধিতে করা হলে তা নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের কারণ হয়'।[৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধ হয় যে দুঃখের অনুভব ও দুঃখজয়ের পন্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানের আবির্ভাব। অবশ্য অনেক ভারতীয় দার্শনিক আচার্যই নিজ নিজ দার্শনিক মতের বিস্তারকালে সর্বদা দুঃখানুভব ও দুঃখমুক্তির ধারণার মধ্যে আলোচনাকে সীমায়িত রাখেননি। অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকগণের দ্বারা বিচারিত বিষয়বস্তুর সাথে দুঃখ ও দুঃখমুক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। একথা সত্য যে ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখমুক্তির ধারণার সাথে প্রাকৃত তথা ব্যবহারিক জীবন সম্বদ্ধ বিষয়গুলি যা মানুষের অভ্যুদয়ের প্রযোজক, সেই সকল বিষয়গুলির আলোচনাও বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতের দর্শনচর্চার লক্ষ্য ছিল সর্বোৎকৃষ্ট জীবনের প্রতি অগ্রসর হওয়া। আর তাই আস্তিক নাস্তিক প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে ব্যবহারিক জীবনে গভীর দুঃখময়তা স্বীকার করে সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করে দুঃখমুক্তি বা মোক্ষের ধারণার অবতারণা করেছেন। তবে ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যবহারিক জীবনে সুখ ও সুখানুভূতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি, কেবল সুখের চাইতে দুঃখের আধিক্য স্থাপন করে দুঃখমুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। ব্যবহারিক জীব যেকোন দুঃখকালীন অবস্থাকে প্রতিকূল বলেই মনে করে এবং সেই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে উপলব্ধ বিশেষ বিশেষ কষ্ট বা যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার সাথে মুমুক্ষুর সর্ব দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তির প্রচেষ্টার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেকোন বিশেষ দুঃখ বা যন্ত্রণার অনুভবকালীন অবস্থায় ব্যবহারিক জীব 'আমার সর্বদুঃখের চিরতরে অবসান হোক', এই প্রকার ভাবনা পোষণ করেন না। একমাত্র পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই 'আমার সর্বদুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি হোক', এই জাতীয় ভাবনার উদয় হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি সমস্যা বা আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। যেকোন প্রকার দুঃখ সাধারণভাবে প্রতিকূলরূপে বেদনীয় হলেও বহু অধ্যাত্মসাধক তপস্যার জন্য নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ বা যন্ত্রণা বরণ করে নেন, কিংবা কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি নানাবিধ শারীরিক কষ্ট গ্রহণ করে থাকেন, আবার কেউ নিছক খেলা দেখানোর জন্য কিংবা প্রায়শ্চিত্য কর্মসাধনের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ-যন্ত্রণা গ্রহণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছার পরিবর্তে দুঃখই অনুকূলরূপে বা বরণীয়রূপে জ্ঞাত হয়। দুঃখের প্রতিকূলরূপে বেদনীয়ত্ব ধর্মটি এই সকল স্থলে অনুপস্থিত বলেই মনে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্যদেব অনুগামী বৈষ্ণব মহাজনগণ মোক্ষ বা দুঃখমুক্তির পরিবর্তে ভক্তি বা ভগবৎ-প্রেমকেই পরমার্থরূপে গ্রহণ করেন এবং যাবতীয় দুঃখ-গ্লানিকে স্বেচ্ছাবরণ করেন ও বহন করে নিয়ে চলেন।[১০] সুতরাং ভারতীয় অধ্যাত্মগগনে সাধনামাত্রেই দুঃখান্তের সাধনা নয়।

উক্ত প্রকার ব্যতিক্রমী স্থলগুলিতে দুঃখের ভাবটি যেরূপে আমাদের কাছে গোচর হয়, তার দ্বারা দুঃখের স্বরূপ-সংক্রান্ত সমস্যাটি আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে। বস্তুতঃ একেবারে মানসিক বিকারগ্রস্ত কিংবা অনুভবশক্তিহীন ব্যক্তি বতিরেকে বিচারশীল মানুষের কাছে দুঃখ সর্বদাই প্রতিকূল বা অনীপ্সিতরূপেই অনুভূয়মান হয়। যাঁরা প্রায়শ্চিত্য কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্বেচ্ছায় দুঃখ-কষ্টকে বরণ করেন, কিংবা যাঁরা মোক্ষাভিলাষী হয়ে মোক্ষসাধনরূপে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ স্বীকার করে তপস্যারত, তাঁরা সকলেই নিজ জীবনে দুঃখনাশের অভিপ্রায়েই সজ্ঞানে দুঃখকে বরণ করেন। চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় দুঃখমুক্তির পরিবর্তে দুঃখকে বরণ ও বহন করার নির্দেশ থাকলেও এরূপ সাধনার সাধ্য হল ভগবৎ বা ঈশ্বরপ্রেমে ঐকান্তিক মগ্নতা যা জীবের ভবযন্ত্রণার অনুভূতির নিবারণ করে অন্তঃকরণের মধ্যে আনন্দ বা মহাসুখের আনয়ন করে প্রকারান্তরে জীবের পূর্ণতা প্রদান করে।

অবিবেকী ব্যবহারিক জীব দৈনন্দিন জীবনে আগত বিশেষ বিশেষ দুঃখের সম্মুখীন হয়ে সেই বিশেষ বিশেষ দুঃখের নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা করেন। অপরদিকে যে সকল বিবেকবান (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর ভেদজ্ঞানসম্পন্ন) মুমুক্ষু ব্যক্তি দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তির ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁরা উক্তরূপ ইচ্ছার দরুন দুঃখ ও দুঃখদায়ক পদর্থের সাথে সাথে সুখ ও সুখদায়ক বা ভোগ্য বিষয়গুলিকেও দুঃখরূপেই ভাবনা করেন। এইরূপ দুঃখভাবনা উত্তরোত্তর জাগতিক বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে অধ্যাত্মপথিককে অনবরত সর্বদুঃখ থেকে মুক্তির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট হওয়ার প্রেরণা দেয়। আর তাই কোন জাগতিক বা সাংসারিক সুখপ্রাপ্তিতে মুমুক্ষু অধ্যাত্মপথিকের কোন তৃপ্তি নেই, সন্তোষ নেই, পূর্ণতা নেই। অধ্যাত্মপথিকের এই অতৃপ্তি ঠিক শারীরিক কিংবা মানসিক দুঃখ বা যন্ত্রণাজনিত নয়। এই অতৃপ্তি সমগ্র জাগতিক অস্তিত্বজনিত এক ধরণের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি যা কেবল মুমুক্ষুর আপন অন্তরস্থ জাগ্রত বিবেকের সাক্ষাৎ অনুভবগম্য হতে পারে। যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্য প্রকরণে এইরূপ দুঃখানুভবের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'সংসারদুঃখপাষাণ-নীরন্ধহৃদয়োপ্যহম।
নিজলোকভয়াদেব গলদ্বাষ্পং ন রোদিমি।।' (১২/২২)১১

অর্থাৎ, আমার হৃদয়স্থ বিবেক ব্যতীত অন্য কেউ পাষাণসম সংসারদুঃখ বা রোদনের কথা বুঝতে পারে না। এই নিদারুণ দুঃখের প্রকৃতিই এরূপ যে ঐহিক ও পারলৌকিক, যে কোন প্রকার ভোগসুখ ও সুখের উপকরণ এই প্রকার দুঃখের উপশম ঘটাতে সক্ষম হয় না। এই প্রকার দুঃখ একবার উত্থিত হলে সংসারের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু একেবারে অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতীত হয়। আর এই কারণে সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসিতে ভরা এই সংসারে জন্মলাভ করেও ভারতের মোক্ষসাধকগণ প্রতিকূলরূপে জ্ঞাত যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তিরূপ নিরাপদ স্থান লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এবং নিরন্তর দুঃখ-শোকের অভিঘাতে জর্জরিত বদ্ধ জীবের পরম পরিত্রাণের জন্য নিজ নিজ উপলব্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নানাবিধ পথ প্রদর্শন করেছেন।

অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকের উক্তরূপ দুঃখভাবনা ও মোক্ষচিন্তা কেবল ভারতীয় দর্শনের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, বরং সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র এবং আরো অন্যান্য কৃষ্টিগত ও বৌদ্ধিক চর্চার শাখাগুলির মধ্যে মোক্ষচিন্তার প্রভাব দৃষ্ট হয়। চরক সংহিতায় সর্বদুঃখের কারণ ও দুঃখের উপশম বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তস্য মূলং সর্বোপপ্লবানাং চ প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিরুপরমঃ প্রবৃত্তির্দুঃখং, নিবৃত্তিঃ সুখমিতি' (৫/৮),[১২] অর্থাৎ, জীবের সকল দুঃখের কারণ হল বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি, আর বিষয়ভোগ-নিবৃত্তি হল দুঃখের প্রশমন বা সুখের কারণ। আদিকাব্য রামায়ণ রচনার উৎস হল শোকরূপ দুঃখ। ক্রৌঞ্চ বধের ঘটনা আদিকবি বাল্মীকির চিত্তে যে স্থায়ী ও সার্বিক শোকের উন্মেষ ঘটায় তা করুণ রসে পরিণত হয়ে শ্লোকাত্মক কাব্যরূপে ব্যক্ত হয়েছিল, একথা সর্বজনবিদিত। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাট্যের প্রয়োজন সম্পর্কে বলেছেন, 'দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্। বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি'।। অর্থাৎ 'এই (নাট্য) সংসারে যারা শোকদুঃখাভিহত, অতিশ্রমকাতর, শোকার্ত ও তপস্বিগণের বিশ্রামজনক হবে'।[১৩]

সুপ্রাচীনকাল যাবৎ অধ্যাত্মমুখী মানুষের এই দুঃখানভূতি, দুঃখসহন ও দুঃখজয়ের মধ্যে দিয়ে পরামুক্তি লাভের এই আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিলাভের অবিরাম প্রচেষ্টার নিদর্শন ভারতীয় সাধু-সন্তগণের জীবনধারার মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবন মূলতঃ ঐহিক কিংবা পারলৌকিক ঐশ্বর্য ও সুখভোগের লক্ষ্যেই পরিচালিত

হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাত্মসাধক ভারতীয় সাধু-সন্তগণের জীবনধারা যুগে যুগে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে প্রাকৃত জনজীবনকে সুস্থ, সংযত ও কল্যাণমুখী করে তুলতে সাহায্য করেছে। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অশেষ আশীর্বাদে ব্যক্তিমানুষের জীবন যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, কৃত্রিম মস্তিষ্ক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৌজন্যে মানুষের কায়িক ও মানসিক কর্মপ্রয়াস অতিসংক্ষিপ্ত, তাৎক্ষণিক ও আন্তর্জালিক যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতিতে মানুষে মানুষে দৈশিক দূরত্ব প্রায় অপসৃত, সুতরাং দৈনন্দিন সুখপ্রাপ্তির প্রভূত উপকরণ আজ মানুষের করায়ত্ত। কিন্তু সুখ বা সুখপ্রাপ্তির এই বিবিধ উপকরণের উপস্থিতি সত্ত্বেও আজও প্রাকৃত বা ব্যবহারিক জীবনে মানুষ সুখী নয়। বিশেষতঃ স্বচ্ছল, শিক্ষিত মানুষের জীবন আজ কর্মের জটিলতাপ্রসূত অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা, উৎকণ্ঠা, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা, অসুস্থতা, অস্বচ্ছতা ও অবিশ্বাসের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। স্বচ্ছল মানুষের ব্যবহারিক জীবনের এই দুঃখপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্নতা সম্পর্কে ব্যক্তিমানুষ যে একেবারে অচেতন তা নয়। এই দুঃখপূর্ণতা থেকে মুক্তির জন্য আজকের স্বচ্ছল মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব, অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এর দ্বারা ব্যক্তিমানুষ হয়ত কিছুক্ষণ নিজের দুঃখপূর্ণ অবস্থাকে তার সচেতন অন্তঃকরণ থেকে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়, তবে আড়ম্বরের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় একটি সরল সত্য বিস্মৃত হয় যে, 'আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর'।[১৪] তাই ব্যবহারিক জীবনে নিরন্তর ভোগের আতিশয্যে মানুষের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রমশঃ চঞ্চল হতে হতে একসময় কার্যক্ষমতা হারায় এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবন এক অন্তহীন একঘেয়েমিতার সম্মুখীন হয় যা মানুষের জীবনকে ক্রমশঃ অর্থহীন, লক্ষহীন কেবল বেঁচে থাকা-তে পর্যাবসান ঘটায়। শুধু তাই নয়, আড়ম্বরপূর্ণ বিলাস-ব্যাসন ও আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্যে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে এক প্রকার অনিবার্য অথচ অবাঞ্ছিত অহংবোধের উন্মেষ ঘটে, যার প্রভাবে মানুষে মানুষে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সংশয় প্রভৃতি প্রাকৃত জীবনের নেতিবাচক দিকগুলি কদর্যভাবে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু স্বচ্ছল মানবজীবনের এই গভীর অসুখ কখনো মানবজীবনের অনিবার্য ও চূড়ান্ত পরিণতি হতে পারে না। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন রোগ ও রোগের উৎসকে চিহ্নিত করে সেই রোগের উৎস নির্মূল করে রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি দুঃখপূর্ণ মানবজীবনকে ক্রমশঃ দুঃখহীনতার দিকে উত্তরণ ঘটাতে হলে প্রয়োজন আমাদের প্রাকৃত তথা ব্যবহারিক জীবনে দুঃখের উৎসমূলের অনুসন্ধান ও সেই উৎসমূলের উৎপাটন। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

'তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ'।।৬৬।।[১৫]

অর্থাৎ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য যেমন নিজেকে ঔষধ-সেবন প্রভৃতি করতে হয়, তেমনি ভববন্ধনস্বরূপ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য পণ্ডিতগণ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করেন।

অধ্যাত্মবাদী তথা মোক্ষমার্গী দার্শনিক পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত নানাবিধ মোক্ষমার্গ মানুষের অন্তরে সেই দুঃখমুক্তির প্রেরণা জাগাতে সক্ষম। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের আচার্যগণ দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তির লক্ষ্যে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং নিজ নিজ যুক্তি-বুদ্ধির পরিকাঠামোগত তারতম্য ও উপলব্ধিগত বৈচিত্র্য অনুসারে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পরভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং জনমানবকে আপন আপন মত ও পথের অনুবর্তী করার প্রচেষ্টা করেছেন। তবুও ভারতীয় দর্শনের বিবিধ প্রস্থানে প্রায় সকল আচার্যই সর্বদুঃখের চিরতরে নিবৃত্তির লক্ষ্যে জগৎ ও জীবনের মূল সত্যে উপনীত হতে চেয়ে আপন অন্তরের প্রতিই দৃষ্টিপাত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আত্মজ্ঞানকেই পরম জ্ঞানরূপে চিহ্নিত করেছেন। কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রাণে এই ভাব জাগ্রত হয়েছিল বলেই ধর্মরাজ (যম)-প্রদত্ত অপরিমেয় ভোগ্য বিষয়কে তুচ্ছরূপে ভাবনা করে সকল ভোগ্যসামগ্রীকে প্রত্যাখ্যান করে নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন। নিগূঢ় আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সর্বদুঃখের নিবৃত্তি আপামর জনসাধারণের কাছে সচেতনভাবে কাম্য বা প্রয়োজনরূপে উপলব্ধ না হলেও আজকের দিনে মানবজীবনের অন্তর্লীন দুঃখপূর্ণতাকে হ্রাস করে মানুষের প্রাকৃত জীবনকে সুস্থ ও কল্যাণমুখী করতে হলেও প্রয়োজন, আত্মানুসন্ধান বা আপন অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত। ব্যক্তিমানুষ যদি নিজের অন্তরের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতিগুলিকে বিশ্লেষণ করে সেগুলির উৎসমূলে পৌঁছতে চেষ্টা করে, তাহলে ক্রমশঃ বাহ্য ও আপাতমধুর বিষয়ের প্রতি অত্যধিক স্পৃহা ও অনিবার্যরূপে আগত দ্বিষ্ট বিষয়ের প্রতি ত্যাগাত্মক মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং এর দ্বারা মানুষ অবাঞ্ছিত অথচ অনিবার্য দুঃখসহনক্ষমতা ও নির্বেদ লাভ করে। এইরূপ নির্বেদপ্রাপ্ত মানুষের যাবতীয় চিত্তমালিন্যকে নির্মঞ্জিত করে তাকে আনন্দনিকেতনস্বরূপ মোক্ষ বা পরমকাঙ্ক্ষিত মুক্তির প্রতি অভিমুখী করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যেই ভারতীয় দার্শনিকের সার্বত্রিক দুঃখভাবনার তাৎপর্য ও প্রকৃত মূল্য নিহিত, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. *ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা*, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ (সঙ্কলিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪-৮

২. *Yoga Philosophy of Patanjali*, Swami Hariharananda Araya, University of Calcutta, 2012, p.143.

৩. *পাতঞ্জল দর্শন*, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ (সঙ্কলিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১০৯-১১৪

৪. *ন্যায়দর্শন*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৩১

৫. ঐ, পৃ. ২৩২

৬. *বৈশেষিক দর্শন*, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯

৭. *বেদান্ত-পরিভাষা*, শ্রীমদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রবিরচিত, লোকনাথ চক্রবর্তী (অনু), সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৭৫-৮৬

৮. *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, ড. সুকোমল চৌধুরী (সম্পা.), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৭-৪৩

৯. *অর্থসংগ্রহ*, স্বামী অলোকানন্দ (অনু.), রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হাওড়া, ২০১৯, পৃ. ১৩৪

১০. *বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য*, ড. ভক্তি দে, নব চলন্তিকা, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১২০

১১. *যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ* (প্রথম খণ্ড), স্বামী অরুণানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৪

১২. *চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা-সমীক্ষা*, ডালিয়া বাঁদুড়ী, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৮৮

১৩. *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৫৯ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮

১৪. *জীবন-স্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৪৮ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৯

১৫. শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-কৃত *বিবেকচূড়ামণিঃ*, স্বামী বেদান্তানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪০

ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মানবাধিকার : সমস্যা ও দৃষ্টিকোণ

রূপসিং টুডু *

সারসংক্ষেপ: লিঙ্গ সমতা শুধুমাত্র একটি মৌলিক মানবাধিকার নয়, পাশাপাশি এটি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধি এবং টেকসই বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি। বিগত কয়েক দশক ধরে এই ধারণার অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু বিশ্ব ২০৩০ সালের মধ্যে লিঙ্গ সমতা অর্জনের পথে নেই। লিঙ্গ সমতা মানব উন্নয়ন ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে। লিঙ্গ সমতার অর্থ হল পুরুষ, মহিলা এবং ট্রান্সজেন্ডার লিঙ্গের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য না করা এবং সমান সুযোগের ব্যবস্থা। অর্থাৎ লিঙ্গ নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সম্পদ, কর্মসংস্থান, নেতৃত্ব, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সুযোগের সমতা। ভারতীয় সংবিধানেও লিঙ্গ সমতার নীতিটি সংযুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার, চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতিতে এবং সংবিধানের অন্যান্য অংশে এর পরিচয় পাওয়া যায়। লিঙ্গ সমতা বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও তবুও লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান যা দেশের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় মানুষকে প্রভাবিত করে। নারী ও ট্রান্সজেন্ডাররাই এই বৈষম্যের অধিক শিকার হয়। লিঙ্গ সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে শুধু নারী নয়, বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার দেরও বৈষম্যর মুখোমুখি হতে হয়। লিঙ্গ নিয়ম, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রথা ও রীতিনীতি বিভিন্ন কারনে নারী এবং ট্রান্সজেন্ডার তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জনজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এই পত্রটিতে ভারতে লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতার সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র আইন প্রনয়ণই যথেষ্ট নয়। তার জন্য দরকার আমাদের সামাজিক কাঠামোর একটি

* রিসোর্স পার্সন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (সাঁওতালি মিডিয়াম), সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম। e-mail: rupsingtudu8@gmail.com

পুঙ্খানুপুঙ্খ বোঝাপড়া। যাতে মহিলা কিংবা ট্রান্সজেন্ডারদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হওয়া যায়। অপ্রয়োজনীয় লিঙ্গ স্টেরোটাইপগুলিও বর্জন করতে হবে যাতে ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ সমতা একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় পরিনত হয়।

সূচক শব্দ : মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা, লিঙ্গ বৈষম্য, ভারতীয় সংবিধান, সরকারি প্রকল্প।

ভূমিকা: লিঙ্গ সমতা মানবাধিকার এবং শান্তিপূর্ণ একটি সমাজের জন্য সমৃদ্ধশালী ভিত্তি। লিঙ্গ সমতা শুধুমাত্র মৌলিক মানবাধিকার নয়, বরং এটি একটি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ ও টেকসই বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন নারী, পুরুষ, সমাজ উন্নয়নের জন্য সমান অধিকার, শর্ত ও সুযোগ এবং তাদের নিজস্ব জীবন গঠনের ক্ষমতা ভোগ করে। অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সম্পদ, কর্মসংস্থান, নেতৃত্বের অবস্থান, রাজনৈতিক কার্যকলাপে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এবং একটি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডারদের সমান সুযোগের ব্যবস্থা। লিঙ্গ সমতার অর্থ এই নয় যে, নারী এবং পুরুষের একই সম্পদ থাকবে, তবে তাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং সুযোগ জন্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত লিঙ্গের উপর নির্ভর করবে না। লিঙ্গ সমতা ব্যক্তিকে ক্ষতিকারক স্টেরোটাইপ থেকে মুক্তি দেয় এবং সামাজিক প্রত্যাশা নির্বিশেষে তার স্বপ্ন অনুসরণ করার ক্ষমতা প্রদান করে। এটি এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলে যেখানে সবাই নিরাপদ, সম্মানিত এবং মূল্যবান বোধ করে। লিঙ্গ ব্যবধান রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩ সালে ভারতের স্থান ছিল ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ১২৭ তম এবং ২০২৪ সালে তা ১২৯ তম স্থানে নেমে আসে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তেনিয় গুতেরস বলেছেন যে, লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন করা আমাদের সময়ের অসমাপ্ত কাজ। তাছাড়া সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন যে, নারী অধিকার নিয়ে বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি আমাদের চোখের সামনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লিঙ্গ সমতার ক্রমবর্ধমান দূরবর্তী লক্ষ্য অর্জনে আরও তিন শতাব্দী সময় লাগবে। লিঙ্গ সমতায় নারী, পুরুষ এবং ট্রান্সজেন্ডারদের চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনা করা হয় এবং সকলকে লিঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কে সামাজিক স্টেরোটাইপ ও কুসংস্কারকে দূরে ঠেলে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে অবগত করা হয়। যদিও এই অধিকারগুলি তাদের জন্য সমভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে তবুও দেশের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান যা মানুষকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। লিঙ্গ

বৈষম্য দ্বারা শুধু নারী বা ট্রান্সজেন্ডাররা প্রভাবিত হয় না, পুরুষরাও সমানভাবে প্রভাবিত। তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম অসমতা অসহনীয় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক। জেন্ডার স্টেরিওটাইপ গুলির জন্য আমরা সবাই প্রভাবিত তবে নিঃসন্দেহে অসমতার জেরে তার থেকে আমাদের দেশের নারী ও ট্রান্সজেন্ডার রা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকার : মানুষ হিসেবে বাঁচতে গেলে এমন একটি সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন যেখানে সে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। এরকম পরিবেশ বা সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করাই হল অধিকার প্রদান করা। সংকীর্ণ অর্থে মানবাধিকার হল একজন ব্যক্তি, মানুষ হিসেবে যে সমস্ত অধিকারগুলি ভোগ করে। অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকেই মানবাধিকার বলা যায়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় তৃতীয় অধিবেশনে মানবাধিকারের 'বিশ্বজনীন ঘোষণা' পত্রটি গৃহীত হয়। এর প্রস্তাবনাতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'জন্মগত ভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারে সমান'। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৫ সালে মানবাধিকারের রূপরেখা তৈরি করে। ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'অধিকারের ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রে বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার অধিকার, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার প্রমুখ অধিকার দাবী করা হয়। ভারত সরকারের মানবাধিকার আইন অনুসারে মানবাধিকার হল– ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত।

১৯৭৯ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভা কর্তৃক নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW) গৃহীত হয়, যা নারীর জন্য অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিল নামে পরিচিত। সম্মেলনের ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কনভেনশনটি স্পষ্টভাবে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং বৈষম্যের অবসান ঘটাতে জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এই সম্মেলন লিঙ্গ ভুমিকা এবং পারিবারিক সম্পর্ক গঠনকারী প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লক্ষ্য করে এবং এটিই হল প্রথম মানবাধিকার চুক্তি যা নারীর প্রজনন অধিকারকে নিশ্চিত করেছে।

লিঙ্গ সাম্য: লিঙ্গ একটি সামাজিক গঠন যা কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীন অনুভূতি,

একজন ব্যক্তি নিজেকে একজন পুরুষ বা একজন মহিলা বা অন্য লিঙ্গ পরিচয় হিসাবে দেখে। উন্নয়নে লিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। এটি কীভাবে মহিলা ও পুরুষের সামাজিক নিয়ম ও ক্ষমতার কাঠামো এবং সুযোগ গুলিকে প্রভাবিত করে তা দেখার একটি উপায়। বিশ্বব্যাপী পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি দারিদ্র্যর সীমার নীচে বসবাস করে। কিশোর (২০০৬) লিঙ্গের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছেন যথা—

১. লিঙ্গ মূল্য নিরপেক্ষ নয়— প্রতিটি লিঙ্গের জন্য অর্পিত ভূমিকা, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা গুলি কেবল আলাদা নয়, তবে পুরুষের ভূমিকা ও অধিকারগুলির সাথে অসম যা সাধারনত মহিলাদের ভূমিকা এবং অধিকারের চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়।

২. লিঙ্গের সাথে ক্ষমতার পার্থক্য জড়িত, ক্ষমতা এবং ক্ষমতার উপর— ক্ষমতার ধারনাটি আইনী ও অনানুষ্ঠানিক অধিকার, সম্পদ অধিগত করা, জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জন, পারিবারিক ও সংস্কৃতিক কার্যক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে। ক্ষমতার উপর বলতে বোঝায় সামাজিক, গৃহস্থালির সম্পদ, সিদ্ধান্ত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদর্শ এবং নিজের ও অন্যের দেহের উপর নিয়ন্ত্রন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীর চেয়ে পুরুষদের ক্ষমতা বেশি, এমনকি নারীদের উপরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

৩. লিঙ্গ স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়, লিঙ্গের ধারণা সামাজিক ভাবে নির্মিত হওয়ায় লিঙ্গের ভূমিকা, অধিকার সামাজিক চাহিদা, সুযোগ এবং প্রত্যাশা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে পারে। লিঙ্গ সমতা একটি সর্বজনীন বিষয়। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল পরিকল্পনার অংশ। লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ক্রমাগত লিঙ্গ বৈষম্যের মূলক আচরণের কারণ গুলিকে চিহ্নিত করে তা মোকাবিলা করার উপর জোর দিচ্ছে।

নারীদের জন্য সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ : লিঙ্গ অসমতার ধারণা শুধু ভারতে নয়, কমবেশি বিশ্বব্যাপী এই ধারণা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজে নয়, পাশ্চাত্য সমাজেও লিঙ্গ অসমতা লক্ষ্য করা যায়। অতীতের দিকে আমরা যদি দেখি বেদ ও উপনিষদে নারীরা সমাজে মা ও দেবী রুপে পূজিত হত। নারীদের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হত। বৈদিক যুগে মেয়েদের যত্ন সহকারে দেখাশোনা করা হত। লিঙ্গ অসমতা ধারনা প্রসঙ্গে বলা যায় এর আবির্ভাব হয়েছে যখন সমাজে পিতৃতান্ত্রিক

ব্যবস্থা গড়ে উঠে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিতকে সুদৃঢ় করার জন্য পুরুষরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। পিতৃতন্ত্রের মূল হাতিয়ার হল পরিবার যেখানে শৈশব কাল থেকে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্যকে বৈধতা দানের চেষ্টা করে। এই বিভেদ এতটাই সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে গ্রথিত যে পরবর্তীকালে যখন একটি শিশু পরিবারের বাইরে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসে, তখন সেখানকার লিঙ্গ বৈষম্যগুলি কোনো সন্দেহ ছাড়াই মেনে নেয়। কারন অনেক সময় এই বৈষম্যকে চিহ্নিত করতেই অক্ষম এবং স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয় যা লিঙ্গ সমতা অর্জনের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জন্মগ্রহণের আধিপত্যাধীন অবস্থান থেকে নারীর সৃষ্টি হয়। মতাদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর থেকেই সূত্রপাত ঘটে লিঙ্গ বৈষম্যের।

পরিবারের মধ্যেও ক্ষমতার স্তরবিন্যাস দেখা যায়। যেখানে নারীর তুলনায় পুরুষকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ছেলেদেরকে আধিপত্য বিস্তারকারী ও আক্রমনাত্মক হতে শেখায়। পরিবারের অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব জোর করে পুরুষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং নারীদের পরিবার দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে, মেয়েদের প্রেমময়, আজ্ঞাবহ ও যত্নশীল হতে শিক্ষা দেয়। বাড়ির কাজ, বাইরের কাজ সর্বক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরুষদের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীলতার জন্য মহিলারা পরিবার থেকে বৈষম্য, বঞ্চনা, হিংসা ও অবিচারের শিকার হন। নারী প্রজননের ক্ষমতা তার নিয়ন্ত্রণের চাবী কাঠিও পুরুষের হাতে থাকে। পরিবারে কয়টি সন্তান কাম্য, পরিবার পরিকল্পনা, কোন বিশেষ সময়ে নারী গর্ভপাত করবে ইত্যাদি প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের হাতে থাকে না। এই সমস্ত অধিকারের জন্য নারীদের নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

একটি সমাজের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার মান মৌলিক সূচক রুপে ধরা হয়। শিক্ষা হল নারী ক্ষমতায়নের মৌলিক দিক। কিন্তু ভারতে অনেক নারীর শিক্ষা গ্রহণ দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যারা প্রতন্ত অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের আয় কম। বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তির জন্য নারীকে তার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রথাগত মানসিকতার ফলে গৃহের কাজে সাহায্যের জন্য, ছোটো ভাইবোন দের দেখাশোনার দ্বায়িত্ব, রান্না করা, জল আনা, বাসন পত্র পরিষ্কার ইত্যাদির কারণে তাদের বাড়িতে রাখা হয়। যার ফলে তাদেরকে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

গার্হস্থ্য সহিংসতা নারীদের বিরুদ্ধে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত যেমন চড়, মারধর, পুড়িয়ে মারা, প্রকাশ্যে অপমান ইত্যাদি। ধর্ষন, যৌন শোষন, শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং, জোর পূর্বক পতিতাবৃতি, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি এগুলি লিঙ্গ সমতা উপলব্ধি কে বাধাগ্রস্থ করে এবং দেশের সামগ্রিক বৃদ্ধি ও জনকল্যাণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ভারত এক আধুনিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো অপকর্ম লক্ষ্য করা যায়। যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এমন অনেক পরিবার আছে যারা কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা বলে মনে করে। এরকম মনে করার কারণ হল প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা যেখানে একটি পুত্রসন্তান বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহন করবে এবং কন্যাসন্তানের অন্য পরিবারে বিয়ে হবে। এটি মনোবিজ্ঞান এবং শারিরিক সত্ত্বা সহ ব্যক্তিদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং মনের অবস্থাকে বিরক্ত করে। সবথেকে দুখঃজনক বিষয় হল যে দেশে দেবীর অনেক রূপ আরাধনা করা হয় সে দেশে ভ্রুন হত্যা বিদ্যমান।

যৌনহয়রানির স্বাভাবিক ধারণা হল নারী তার কর্মস্থলে, পথে, যানবাহনে, বিভিন্ন জায়গায় কথা, ইঙ্গিত ও ফন্দির মাধ্যমে শারীরিক ভাবে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়াকে বোঝায়। ভারতে বিশাখা নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌনহয়রানি মৌলিক অধিকার 'জীবন ও স্বাধীনতার' অধিকারকে লঙ্ঘন করে। নারীদের চলাচলে সর্বদা আতঙ্ক ভীতি কাজ করে। এরকম অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে তা না হলে সভ্যতার বিকাশ ঘটবে না।

সংবাদ পত্র থেকে দূরদর্শন সর্বত্রই পুরুষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞাপন, চলচিত্রে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়। এছাড়া মানব সমাজে জীবনধারা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা ও রীতিনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নারীরা অধিনতা স্থানে বিরাজ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীদের অধিকার স্বীকার করা হয় না।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সাথে শারীরিক, যৌন মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহিংসতা জড়িত। ভারতে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ধারনার মধ্যে রয়েছে গার্হস্থ্য নির্যাতন, ধর্ষন, যৌনভিত্তিক হয়রানি, যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা, জোরপূর্বক বিয়ে এছাড়াও অনলাইন সহিংসতার মধ্যে রয়েছে বেআইনি হুমকি, সহিংসতার জন্য উস্কানি দেওয়া, আপত্তিকর ইমেল বা বার্তা, সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা ইত্যাদি। শুধুমাত্র

যে নারী এ ধরনের শিকার হতে পারে তা নয়, পুরুষরাও এধরনের অপব্যবহার বা শোষণের শিকার হয়। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন শুধু অপরাধই নয়, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনও বটে। তাছাড়া CEDAW স্বীকার করে ধর্ষণের মতো লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নারীর সমতা ও স্বাধীনতার অধিকারকে প্রভাবিত করে।

উন্নত স্বাস্থ্য সমাজ মানুষের সুখ ও কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু। এটি অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। প্রত্যেকে লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বয়স নির্বিশেষে তাদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। অনেক গবেষনায় দেখা যায় যে, সাধারণত মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশি স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলা করে। ভারতে মহিলারা বর্তমানে নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেমন কিশোরী গর্ভাবস্থা, মাতৃমৃত্যু এবং সহিংসতা। এই সমস্যাগুলি অনিবার্যভাবে সমাজের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য জীবনকে প্রভাবিত করে।

ভারতীয় সংবিধান ও লিঙ্গ বৈষম্য: লিঙ্গ বৈষম্যের ধারনার উদ্ভব কতদিন আগে তা বলা মুশকিল। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে বোঝায় যৌন বা লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির সাথে অসম আচরন। ভারতবর্ষর মতো রাষ্ট্রে যেখানে উদারনীতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জনকল্যানকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতির সমাহার লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পরেও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। এই লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় নানা প্রবিধান রয়েছে। সংবিধানে মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য ও নির্দেশমূলক নীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধারায় নারী পুরুষের সমান অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উক্ত ধারাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং ধারা অনুসারে আইনের চোখে সবাই সমান ও আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। এই অধিকারটি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

সংবিধানের ১৫ নং ধারা অনুসারে নাগরিকদের জন্য সম সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ করবে না।

সংবিধানের ১৬ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের ব্যবস্থা। কোনো নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ন,

বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে কোনো একটি কারনের জন্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

সংবিধানের ১৯ নং ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার কে নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে সকল নাগরিক যাতে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ভাবনা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারায় শোষনের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। দাসপ্রথা, স্ত্রী লোককে দিয়ে নীতি বিগর্হিত কাজ করানো, বেগার খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কাজ কর্মের বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নারী, শিশু প্রভৃতির কেনাবেচা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মৌলিক অধিকার গুলি যাতে ক্ষুন্ন না হয় তাই সংবিধানের ৩২, ২২৬ নং ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় উল্লেখিত নির্দেশমূলক নীতি গুলিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সেগুলি হল—

সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৯ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরণ করবে যাতে—

(ক) পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়।

(খ) সমাজের বস্তুগত সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন এমন ভাবে বণ্টিত হবে যাতে সর্বোত্তম জনকল্যান সাধিত হবে।

(গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে জনসাধারণের ক্ষতি না হয় এবং উৎপাদনের উপায় সমূহের কেন্দ্রীকরণ ঘটে।

(ঘ) পুরুষ-মহিলা যেন সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করা হয়।

(ঙ) শিশুরা যাতে সুষ্ঠ পরিবেশে বড়ো হওয়ার সুযোগ পায়। তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুরক্ষিত হয় এবং নৈতিক দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

৪৫ নং ধারা অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদের জন্য মুক্ত ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪৬ নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র, দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতি সাধন করবে এবং যেকোনো সামাজিক অন্যায় ও শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

৪৭ নং ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মান বাড়াবে এবং পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেবে।

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার, নির্দেশ মূলক নীতির মত মৌলিক কর্তব্যের মধ্যেও কয়েকটি কর্তব্য ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ৫১(ক) এর (ঙ) তে উল্লেখ রয়েছে যে, সমাজে সকল প্রকার বিভেদ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করা রাষ্ট্র এবং তার প্রতিটি নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত, শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্বের বিকাশ ও নারী জাতির মর্যাদা হানিকর আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে।

সরকারি প্রকল্প: নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের সম্মেলনে (CEDAW) বলা হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সমতা অর্জনের জন্য সরকারকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সেখানে লিঙ্গ সমতার নিশ্চয়তা এবং দেশকে নারীর পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে নারী ও শিশুকল্যান মন্ত্রক দ্বারা নারীদের সামাজিক, শিক্ষাগত, আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার জন্য একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও – এর লক্ষ্য হল মেয়েদের সুরক্ষা, ভ্রূণহত্যা, কন্যাশিশু হত্যার মতো অমানবিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই ও নারীশিক্ষা প্রচলন।

স্বধার প্রকল্প– এই প্রকল্পটি মহিলাদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র এবং স্বাস্থ্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

STEP– যা মহিলাদের স্ব-কর্মসংস্থান/উদ্যোক্তা হতে দক্ষতা প্রদান করে।

প্রিয়দর্শিনী প্রকল্প– এটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ভিত্তিক প্রকল্প যার দ্বারা মহিলা ও কিশোরী

মেয়েদের ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত হয়।

নির্ভয়া তহবিল প্রকল্প– দেশে নারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে।

এছাড়াও রয়েছে উজ্জ্বলা প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় মহিলা কোশ, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ওয়ান স্টপ সেন্টার, মহিলা হেল্পলাইন প্রকল্প, মহিলা পুলিশ ভলেন্টিয়ার, মহিলা ই-হাট প্রকল্প ইত্যাদি।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, লিঙ্গ সমতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং প্রগতিশীল ও ন্যায়সংগত সমাজের মূল কাঠামো। এটি লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যক্তিদের জন্য সমান সুযোগ, অধিকার এবং দায়িত্বের উপর জোর দেয়। যে কোনো জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য লিঙ্গ সমতা অর্জন একান্ত প্রয়োজন কেন না, এটি ব্যাক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। তাছাড়া যখন সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে তখন এটি উন্নত জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সমান অংশগ্রহন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নত ফলাফল নিশ্চিত করে। ভারত লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ন্যায়সংগত সমাজের দিকে যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। লিঙ্গ ভিত্তিক মজুরি বৈষম্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ, কর্মস্থলে যৌন হয়রানি এবং সামাজিক স্টেরিওটাইপের মতো সমস্যা গুলি অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও লিঙ্গ ভিত্তিক অসম আচরণ বৈষম্যকে আরও স্থায়ী করে তোলে। যে কোনো ধরনের বৈষম্য কোনো জাতির উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে কাজ করে এবং একটি জাতি তখনই সমৃদ্ধি হবে যখন তার সকল নাগরিককে সমানভাবে সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। ভারত সরকারও লিঙ্গ বৈষম্য কমাতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য নানারকম সামাজিক প্রচারণা শুরু করেছে। এর পাশাপাশি সরকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক প্রকল্প পরিচালনা করছে। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক কর্তব্যের মতো বিধানের ভিত্তিতে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্র, সাংবিধানিক নীতি, আইন থাকলেও সঠিকভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব সকলের। তবেই লিঙ্গ সমতা সঠিকভাবে রূপায়ন সম্ভব হবে। তা নাহলে সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব। দায়িত্বশীল

নাগরিক হিসাবে লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সকলকে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। লিঙ্গ সমতা অর্জন শুধু লক্ষ্য নয়– সুন্দর সমাজ গঠনের মূল ভীত।

তথ্যপঞ্জি :

১. হালদার, অমৃতা (২০২১)। নারীবাদ : চিন্তন ও চর্চার ইতিবৃত্ত। কলকাতা : সুহৃদ পাবলিকেশন।

২. মণ্ডল, মলয় (২০২১)। নারীবাদী তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৩. প্রামানিক, নিমাই (২০১৪)। ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা (দশম সংস্করণ)। কলকাতা : ছায়া প্রকাশনী।

৪. মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১৪)। রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব। কলকাতা : সুহৃদ পাবলিকেশন।

৫. মজুমদার, দীপিকা (২০২২)। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব। কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক।

৬. খান, ইয়াসিন (২০২২)। রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্ব ও বাস্তব (সম্পাদনা)। কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৭. মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস (২০১৮)। সমাজতত্ত্ব ও ভারতীয় সমাজ। কলকাতা : প্রগতিশীল পাবলিশার্স।

৮. সেন, সুদর্শনা। ও চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস (২০২৩)। লিঙ্গশ্লিষ্ট সমাজতত্ত্ব। কলকাতা : কে.পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি।

৯. চ্যাটার্জ্জী, শুভ্রজিত (২০২১)। সমাজতত্ত্ব : লিঙ্গ যৌনতা নারী। কলকাতা। লেভান্ত বুকস।

১০. বসু, রাজশ্রী। ও চক্রবর্তী, বাসবী (২০১৬)। প্রসঙ্গ: মানবিবিদ্যা (সম্পাদনা)। কলকাতা: উর্বী প্রকাশন।

৮. Chahal, Sonia. (2019). Gender Equality as a new human right in India. Gap Interdisciplinarities, 2(3), 346-349. https-//www.gapinter disciplinarities.org/ res/articles/(346-349).pdf

৯. Thakur, Kritika. & Singh, Raghubar Prasad. S2022V. Gender equality and Human Rights in India. Retrieved May 22,2025, from https-//www.researchgate.net/publication/361187719_Gender_Equality_and_Human_Rights_in_India

১০. Thakur, Daizy. S2019V. Gender equality and Human rights in India-issues and perspectives. Gap Interdisciplinarities,2(3), 269-275. https-//www.gapinterdisciplinarities.org/res/articles/(269-275).pdf

১১. Sneha, Mahawar. (2023). Gender equality and the Indian Constitution. Retrieved may 23,2025 from https-//blog.ipleaders.in/gender-equality-and the indian-constitution/

১২. Garg, Rachit. (2023). Government policies for gender equality in India. Retrieved may 23,2025, from https-//blog.ipleaders.in/government-policies-for-gender-quality-in-india/

ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসায় পণ্য ও পরিষেবা করের (GST) প্রভাব: সুযোগ, সংকট ও সম্ভাবনা

সাধন কুম্ভকার *

সারাংশ: পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ভারতের কর ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। এই করব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর এর প্রভাব নিয়ে বিস্তর বিতর্ক এবং গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে মূলত ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে GST-এর প্রভাব, বাধা ও সুযোগ, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এবং সরকারী নীতির কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে কীভাবে GST চালুর ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কর সংক্রান্ত জটিলতা, নগদ প্রবাহের সমস্যা, প্রযুক্তিগত বাধা ও প্রতিযোগিতায় চাপের মুখে পড়েছেন। পাশাপাশি কিছু ব্যবসায়ী কীভাবে এই নতুন ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণাটি নীতিনির্ধারক, গবেষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি উপযোগী রূপরেখা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

সূচক শব্দ: GST, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ভারত, কর সংস্কার, অর্থনৈতিক প্রভাব।

ভূমিকা: ভারতের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তির অন্যতম স্তম্ভ হল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ, যা সংক্ষেপে MSME (Micro– Small and Medium Enterprises) নামে পরিচিত। এই খাত দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) প্রায় শতকরা ৩০ শতাংশ এবং রপ্তানির প্রায় শতকরা ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখে এবং এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয় (Nayak,

* রাজ্য সহায়িত কলেজ শিক্ষক (SACT-1), অর্থনীতি বিভাগ, মানভূম মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া। e-mail: sk.economics.mmv@gmail.com

2023)। অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি দীর্ঘদিন ধরে কর কাঠামোর জটিলতা, প্রশাসনিক অসুবিধা ও রেজিস্ট্রেশনের ধীরগতি ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৭ সালের ১ জুলাই থেকে কেন্দ্র সরকার একটি অভিন্ন ও সর্বভারতীয় করব্যবস্থা, পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) চালু করে। GST ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে ভারতের পরোক্ষ কর কাঠামোর বহুস্তরীয় জটিলতা দূর করার চেষ্টা করা হয় (Kumar, 2020; Mukherjee, 2020)। GST চালুর মূল উদ্দেশ্য ছিল 'এক জাতি, এক কর, এক বাজার' গঠন করা। এটি পূর্বের একাধিক কর যেমন ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, সার্ভিস ট্যাক্স, এন্ট্রি ট্যাক্স, কেন্দ্র ও রাজ্য কর মিলিয়ে প্রায় ১৭টি কর বাতিল করে একটি অভিন্ন কাঠামো তৈরি করে (Jain & Sengupta,2021)। কর ব্যবস্থার এই একীকরণ বড় শিল্প সংস্থাগুলির জন্য তুলনামূলকভাবে সুফল বয়ে আনলেও, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিয়েছে (Dutta, 2021)। কারণ এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন ডিজিটাল দক্ষতা, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো, নিয়মিত রিটার্ন ফাইলিং এবং কর সংক্রান্ত সচেতনতা, যা অধিকাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর নেই (Choudhury– 2022)।

বিশেষত ভারতীয় MSME খাতের একটি বড় অংশ এখনও অনানুষ্ঠানিক বা 'ইনফর্মাল সেক্টর'-এর আওতায় পড়ে, যেখানে ব্যবসা পরিচালিত হয় নগদ ভিত্তিতে, কর রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এবং যৎসামান্য ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে (Bhattacharya– 2022)। GST-র আওতায় আসা মানে এইসব ব্যবসায়ীদের জন্য কর নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রবেশ, যা একদিকে যেমন দীর্ঘমেয়াদে সুশাসনের অংশ, তেমনি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বোঝা। উপরন্তু, GST-এর প্রযুক্তিনির্ভর কাঠামো যেমন GSTN পোর্টাল, e-invoicing– input tax credit ইত্যাদি অনেকের কাছেই জটিল ও দুরূহ হয়ে ওঠে (Mandal, 2022)। গবেষণায় দেখা গেছে, GST চালুর প্রথম দুই বছরে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগের মাত্রা ছিল অত্যন্ত বেশি। বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন না করে পরিচালনা করতে চেয়েছে, আবার কেউ কেউ ব্যবসা গুটিয়েও ফেলেছে কর সংক্রান্ত চাপ সামলাতে না পেরে (Deshmukh, 2019, Mitra & Basu– 2021)। তবে একটি ইতিবাচক দিক হলো, যারা কর নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পেরেছেন এবং নিয়মিত কমপ্লায়েন্স বজায় রেখেছেন, তারা বৃহৎ বাজারে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন, সরকারী টেন্ডার ও ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন

করেছেন (Chakraborty- 2022— Dasgupta- 2022)। এতে ধীরে ধীরে কর সংস্কারের প্রতি আস্থা তৈরি হয়েছে এবং GST-এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল, GST চালুর ফলে ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা। এখানে বিবেচিত হয়েছে GST-র প্রযুক্তিগত কাঠামো, আর্থিক প্রভাব, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ, ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বিঘ্ন, সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং সরকারী সহায়তার বাস্তবচিত্র। GST একটি বাস্তবতাসম্পন্ন কর সংস্কার। একদিকে এটি ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা ও কর ফাঁকি রোধে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য নতুন করে তৈরি করেছে কর-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের জটিল জাল। এই দ্বৈত প্রকৃতির বিশ্লেষণেই নিহিত আছে এই গবেষণার তাৎপর্য। সরকারি প্রতিবেদন, NSSO ডেটা, MSME মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট এবং সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে উপসংহার রচিত হয়েছে। এছাড়াও ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষেত্রভিত্তিক সাক্ষাৎকার এবং সার্ভে তথ্য।

ক্ষুদ্র ব্যবসার কাঠামো, গুরুত্ব ও GST বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট: ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি (Small Enterprises) একটি মেরুদণ্ডস্বরূপ ভূমিকা পালন করে। দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে এই খাতটি যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে এবং আঞ্চলিকভাবে উৎপাদনের বৈচিত্র্য রক্ষা করে, তা ভারতের সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসার সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়, যেখানে ব্যবসার মালিকানা, কর্মচারীর সংখ্যা ও পুঁজি বিনিয়োগের সীমা নির্ধারণ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণ করা হয় (Ministry of MSME– 2020)। ২০২০ সালে এই সংজ্ঞা সংশোধন করে বিনিয়োগ এবং বার্ষিক টার্নওভারের ভিত্তিতে নতুন শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একাধিক উৎপাদনশীল ব্যবসা যেখানে ১০ কোটি পর্যন্ত বিনিয়োগ ও ৫০ কোটি পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভার বজায় রাখে, সেগুলিকে 'ক্ষুদ্র' শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণভাবে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি মূলত ৫ থেকে ৫০ জন কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্থানীয় বা আঞ্চলিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল। তবে এদের কার্যক্রম কেবলমাত্র স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। তারা দেশীয় উৎপাদন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বহুক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যেও যুক্ত। বর্তমানে ভারতের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় শতকরা ৪৫

শতাংশ এই খাত থেকেই আসে, যা অর্থনীতির মানবসম্পদ নির্ভরতা তুলে ধরে (Nayak– 2023)। শুধু তাই নয়, ভারতের মোট রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশও এই খাতের অবদানে গঠিত হয়, বিশেষত যেখানে হস্তশিল্প, চামড়া, টেক্সটাইল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং হ্যান্ডলুম পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা রয়েছেন।

ভৌগোলিকভাবে বিচিত্র ভারতে ক্ষুদ্র ব্যবসার বিস্তারও অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশে এই খাতের অস্তিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি এবং রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে এসব ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গুজরাটে ক্ষুদ্র বস্ত্র শিল্প, মহারাষ্ট্রে অটোমোবাইল পার্টস উৎপাদন, পশ্চিমবঙ্গে চামড়া এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, তামিলনাড়ুতে হস্তশিল্প এবং চট শিল্প, এসবই ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এই বাস্তবতা থেকে বোঝা যায়, ক্ষুদ্র ব্যবসা কেবল একটি অর্থনৈতিক ইউনিট নয় বরং আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ধারক ও বাহক হিসেবেও কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের কর কাঠামোয় GST-র মতো একবৃহৎ কর সংস্কারের কার্যকারিতা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। GST, অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা কর, ২০১৭ সালে চালু হওয়া একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি অভিন্ন ও স্বচ্ছ পরোক্ষ কর ব্যবস্থার রূপদান। GST-র আগ পর্যন্ত ভারতের কর ব্যবস্থা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন করের প্রচলন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এক রাজ্যে কোনো পণ্যের ওপর ভ্যাট (VAT) বা প্রবেশ কর (Entry Tax) আরোপিত হত, আবার অন্য রাজ্যে আলাদা হারে সেই পণ্যের ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হত। এই জটিলতা ব্যবসার জন্য এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করত, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে যাদের জন্য একাধিক ফর্ম পূরণ, অনুমতি গ্রহণ ও হিসাব সংরক্ষণ ছিল এক বিরাট বোঝা (Deshmukh, 2019)।

GST-এর অন্তর্ভুক্তি এই বহুমাত্রিক কর ব্যবস্থাকে একটি একক কাঠামোয় রূপান্তর করে, যেখানে CGST (Central Goods and Services Tax), (GST (State Goods and Services Tax) ও IGST (Integrated Goods and Services Tax) এই তিনটি স্তরে কর আরোপের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয় (Jain & Sengupta– 2021)। GST মূলত একটি গন্তব্যভিত্তিক কর ব্যবস্থা, যার অর্থ হলো, পণ্যটি কোথায় ভোক্তার কাছে পৌঁছেছে, সেই স্থানকে কেন্দ্র করেই কর ধার্য হয়। উৎপাদক নয়, বরং শেষ

ভোক্তাই এর প্রকৃত কর বহন করেন (Kumar– 2020)। এটি একদিকে যেমন কর ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও সহজতা বাড়িয়েছে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য তা এক নতুন প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। একদিকে GST বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৃহৎ কর সংস্কার সম্পন্ন হলেও, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এটি ছিল এক প্রাথমিক ধাক্কা। বহু ব্যবসায়ী কর ব্যবস্থার আওতায় আসতে বাধ্য হন, যা তাদের জন্য একপ্রকার প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। পূর্বে যারা নগদ ভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করতেন এবং কোনো কর রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না, তাঁরা GST চালুর পর বাধ্যতামূলকভাবে কর কাঠামোর আওতায় আসেন। এই পরিণতির ফলে তাঁরা নিজস্ব হিসাব সংরক্ষণ, ইনভয়েস ইস্যু এবং ডিজিটাল রিটার্ন ফাইলিংয়ের মতো একাধিক দিক সামলাতে গিয়ে চাপে পড়ে যান নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

GST চালুর পরপরই ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটি বড় কারণ ছিল ডিজিটাল অবকাঠামোয় অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি। Mukherjee & Rao (2022) উল্লেখ করেছেন, GST চালুর ফলে রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন ফাইলিং ও ইনভয়েসিং সংক্রান্ত নতুন চাহিদা তৈরি হয় যা অধিকাংশ MSME-র জন্য নতুন। এই ডিজিটাল ব্যবস্থা রপ্ত হতে অনেকের সময় লেগেছে। Dutta (2021)-এর গবেষণায় দেখা যায়, GST চালুর পর প্রথম দুই বছরে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসা সাময়িকভাবে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, কারণ তারা অনলাইন করব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, Narayan (2023) যুক্তি দেন যে, দীর্ঘমেয়াদে GST কর সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং কর ফাঁকি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যা ভারতীয় অর্থনীতির পরিপক্কতার একটি ইঙ্গিত। GST বাস্তবায়নের এই পরিবর্তন শুধুমাত্র কর পরিকাঠামোর দিক থেকে নয়, বরং ব্যবসার সাংগঠনিক কাঠামোতেও প্রভাব ফেলেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিকে এখন বিভিন্ন সফটওয়্যার, অ্যাকাউন্টিং টুলস ও ইলেকট্রনিক রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়ার সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এই খরচ তাদের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে, GST-র মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি, ঋণপ্রাপ্তি ও সরকারি সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসার কাঠামো ও তাদের গুরুত্ব যেমন ভারতের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে অপরিহার্য, তেমনি GST বাস্তবায়ন এই খাতের ওপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছে। এটি একদিকে যেমন কিছু সংকট ও চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, অন্যদিকে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে MSME খাতকে একটি সংগঠিত ও স্বচ্ছ কাঠামোর দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ক্ষেত্রবিশেষে GST-র বহুমাত্রিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক বাস্তবতা: ভারতে GST-এর প্রবর্তন একটি ঐতিহাসিক কর সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হলেও এর বাস্তব প্রভাব ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর একরৈখিক নয়; বরং এটি খাতভেদে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা ধরনের ক্ষেত্রে GST-র বাস্তবায়নের চিত্র যেমন ইতিবাচক, তেমনি কিছুক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও সুস্পষ্ট। মুদ্রণ শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, হ্যান্ডলুম, রেস্তোরাঁ, ক্ষুদ্র উৎপাদন, খুচরা দোকান, ক্ষুদ্র নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুতকারক ও গৃহনির্মিত পণ্যের উৎপাদকদের উপর এই পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। কলকাতার একটি ক্ষুদ্র জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থার মালিকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, GST চালুর পর কাঁচামাল সরবরাহকারীদের কাছ থেকে যথাযথ ইনভয়েস বা কর রসিদ পাওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে Input Tax Credit (ITC) দাবি করা যাচ্ছে না (Bose– 2022)। এই সমস্যাটি একদিকে যেমন করদাতার আর্থিক ক্ষতির কারণ, অন্যদিকে কর ব্যবস্থার মধ্যে এক প্রকার বৈষম্যও সৃষ্টি করে। কারণ বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে আইটি সাপোর্ট এবং দক্ষ একাউন্ট্যান্টের মাধ্যমে কর ব্যবস্থায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে সক্ষম, সেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এই ধরনের সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। আরেকটি বাস্তব সমস্যা উঠে আসে ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার ক্ষেত্রে। GST রেজিস্ট্রেশন না থাকলে অনেক বড় পাইকারি ও রিটেইল চেইন সংস্থা তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে, কারণ তারা নিজেরাও কর নিয়ম অনুযায়ী ITC ক্লেম করতে চায় (Ahmed– 2023)। ফলে যেসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এখনও কর কাঠামোর বাইরে রয়েছেন, তারা কার্যত বাজার থেকে একপ্রকার বর্জিত হচ্ছেন এবং প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছেন।

তবে অন্যদিকে, যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসা GST-র আওতায় এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে সরকারি এবং বৃহৎ কর্পোরেট টেন্ডারে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন (ChakraBorty– 2022)। GST সার্টিফিকেট এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় দেয় যা দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বাণিজ্যে একধরনের আইনি স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে। ফলে এই ব্যবসায়িক ইউনিটগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ব্যাংক ঋণ গ্রহণ, সরকারি সহায়তা পাওয়া এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুযোগও অনেকাংশে সহজ হয়। GST ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর সম্পূর্ণ ডিজিটাল কাঠামো। রিটার্ন ফাইলিং, পেমেন্ট, ইনভয়েসিং, রেজিস্ট্রেশন এসব কিছুই GSTN (Goods and Services Tax Network) পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করতে

হয়। যদিও এই ডিজিটাল রূপান্তর একটি অত্যন্ত আধুনিক ও স্বচ্ছ উদ্যোগ, কিন্তু দেশের বহুক্ষেত্রে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও অর্ধ-শহরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতের বিপুল সংখ্যক MSME উদ্যোক্তা এখনও নিজে নিজে ডিজিটাল কর ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে না। এই ব্যবস্থার জটিলতা, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব এবং ডিজিটাল শিক্ষার ঘাটতি মিলিয়ে তাঁদের অনেকেই বাধ্য হন পেশাদার হিসাবরক্ষকের সহায়তা নিতে। এছাড়াও, প্রায় শতকরা ৪০ শতাংশ MSME মালিক নিজে GSTN পোর্টাল ব্যবহার করতে সক্ষম নন এবং তাঁদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষভাবে কোনো হিসাবরক্ষকের উপর নির্ভরশীল। এতে করে অতিরিক্ত ব্যয় চাপ বাড়ে এবং ব্যবসার স্থায়িত্বও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়াও ডিজিটাল পরিকাঠামোর দিক থেকে ভারতে এখনো অসম অবস্থা বজায় রয়েছে। শহরাঞ্চলে যেখানে হাই-স্পিড ইন্টারনেট ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক, সেখানে গ্রামীণ এলাকাগুলো এখনও বিদ্যুৎ ঘাটতি, ধীরগতির ইন্টারনেট ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির অভাবে ভোগে। Mandal (2022) এই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে বলেছেন যে, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর এই দুর্বলতা বহুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন ফাইল করতে বাধা দেয়, যার ফলে দেরিতে রিটার্ন জমা পড়ে এবং জরিমানার মুখে পড়তে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ই-ইনভয়েসিং এর জটিলতা। বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে যেখানে ERP বা ইনভয়েসিং সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ আছে, সেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকদের জন্য প্রিন্ট করা ইনভয়েসে নির্দিষ্ট QR কোড, HSN কোড ইত্যাদি যুক্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে Input Tax Credit ব্যবস্থায় ভুল হয় এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একইসঙ্গে, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা GST-র সুবিধা নিতে চাইলেও, রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে রিটার্ন ফাইলিং পর্যন্ত নানা জটিল নিয়মের কারণে তাদের একধরনের অনিশ্চয়তা ও ভয় কাজ করে। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মনে করেন, রেজিস্ট্রেশন করলেই তাঁদের রিটার্ন ফাইল করতে হবে, ইনভয়েসিং করতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল অডিট করতে হবে, যার জন্য অতিরিক্ত পরিকাঠামো ও খরচের প্রয়োজন পড়ে। এই ধরণের আতঙ্ক এবং অবজ্ঞাজনিত মনোভাবও অনেক MSME-কে কর কাঠামোর বাইরে রাখে।

অন্যদিকে আবার কিছু ক্ষেত্রে GST বাস্তবায়ন উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে। বিশেষ করে যেসব শিল্প বা পণ্য বড় সরবরাহ চেইনে যুক্ত, সেখানে GST ছাড়া কার্যত বাণিজ্যই সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো বাধ্য হয় কর কাঠামোর আওতায় আসতে এবং একবার তারা GSTIN পেলে ধীরে ধীরে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ব্যাংকিং সুবিধা এবং সরকারের বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে শুরু করে। তাই GST যেন একপ্রকার জোর করে ক্ষুদ্র ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির ভিতরে টেনে আনার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে GST বাস্তবায়নের এই বহুমাত্রিকতা ভারতের কর সংস্কারের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা দুটিই একসাথে তুলে ধরে। করের কাঠামো ডিজিটাল, স্বচ্ছ ও আধুনিক হলেও, এর বাস্তবায়নে নানান প্রযুক্তিগত ও প্রশিক্ষণগত ঘাটতির কারণে এখনও অনেক MSME পরিপূর্ণভাবে এই ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সরকার, কর দপ্তর এবং বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগে একটানা প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সরবরাহ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা।

আর্থিক চ্যালেঞ্জ, নগদ প্রবাহ সংকট ও ঋণপ্রাপ্তি সমস্যা: GST বাস্তবায়নের পর ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিকে যে প্রধান সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল নগদ প্রবাহ সংকট (cash flow crisis) এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঋণপ্রাপ্তির জটিলতা। কর কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে যেসব ব্যবসায় আগে নগদ লেনদেনের মাধ্যমে চলত এবং যাদের কোনও ফরমাল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ছিল না, তারা এখন কর রেজিস্ট্রেশন, ইনভয়েসিং, রিটার্ন ফাইলিং ইত্যাদি দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে গেছে। ফলে ব্যবসায়িক খরচ বেড়েছে এবং নগদ অর্থের ঘাটতিও বৃদ্ধি পেয়েছে (Bhattacharya– 2022)। GST ব্যবস্থায় Input Tax Credit (ITC) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রয়কৃত পণ্যে প্রদত্ত করের টাকা পরে আয়কর জমা দেওয়ার সময় সমন্বয় করতে পারেন। কিন্তু এই ITC প্রাপ্তির প্রক্রিয়া অনেক সময় বিলম্বিত হয় এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে অনেকেই এর সুবিধা তুলতে ব্যর্থ হন। ফলত, ব্যবসার নগদ প্রবাহে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে যেখানে দৈনিক লেনদেনের উপর নির্ভরতা বেশি, সেখানে এই বিলম্ব উৎপাদন চক্রে বাধা দেয় এবং কখনও কখনও অর্ডার পূরণেও সমস্যার সৃষ্টি করে। Kumar & Sinha (2021) দেখিয়েছেন, পূর্বে যেসব ব্যবসা নগদ ভিত্তিক ছিল, তারা ইনভয়েস ইস্যু করতেন না এবং কর সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালন করতেন না। কিন্তু GST চালুর

ফলে এই সব কার্যক্রম বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। ফলে ব্যবসার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে বটে, তবে এর সঙ্গে খরচও বহুগুণ বেড়ে যায়। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে কর সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করতে হয়েছে, যার আর্থিক বোঝা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর জন্য মারাত্মক হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সমস্যা। পূর্বে MSME গুলোর একটি বড় অংশ ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে নিজেদের চলমান পুঁজির ভিত্তিতে ব্যবসা চালাত। কিন্তু GST-র আওতায় আসার পর অনেক সংস্থা ব্যাংক ঋণের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে। Joshi (2023) উল্লেখ করেন, যদি GST রিটার্ন সঠিকভাবে ফাইল না হয় বা কর ফাঁকি ও জটিলতা থাকে, তাহলে ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। অনেকক্ষেত্রে ঋণ আবেদন বাতিলও হয়ে যায়। মূলধনের অভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের একাংশ একসময় নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়, অথবা অনানুষ্ঠানিক ধারদেনার দিকে ঝুঁকে পড়ে (Mitra & Basu–2021)। এই অনানুষ্ঠানিক ঋণ সাধারণত উচ্চ সুদে হয়ে থাকে এবং এটি ব্যবসার জন্য আরও বিপজ্জনক।

এই সমস্যাগুলোর মূলে রয়েছে কর সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব। Choudhury (2022) এবং Patel (2021) উভয়েই উল্লেখ করেছেন, ভারতের বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জানেন না কীভাবে এবং কখন GST রিটার্ন জমা দিতে হয়, কিংবা ইনভয়েসে কী কী তথ্য থাকা বাধ্যতামূলক। এতে করে না শুধু রিটার্ন ফাইলিংয়ে ভুল হয়, বরং Input Tax Credit-এর মতো সুবিধাও হাতছাড়া হয়। ব্যবসায়িক ডেটা সংরক্ষণ, HSN কোড ব্যবহার, কর হার নির্ধারণ, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতার অভাব থেকেই ব্যবসায়ীরা কর কাঠামোতে পিছিয়ে পড়েন। Desai & Rathi (2022) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, MSME মালিকদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২০-২৫ শতাংশ ব্যক্তি স্বপ্রণোদিতভাবে কর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বাকিরা কর পরামর্শদাতার ওপর নির্ভরশীল এবং এই পরামর্শদাতারা অনেক সময় উচ্চ ফি দাবি করেন, যা ক্ষুদ্র ব্যবসার পক্ষে বহন করা কঠিন। এর ফলে কর বিষয়ক সচেতনতা একচেটিয়া হয়ে দাঁড়ায় এবং সাধারণ উদ্যোক্তারা কর ব্যবস্থার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে পারেন না।

GST-এর প্রশাসনিক কাঠামোতেও রয়েছে জটিলতা। Ghosh (2020) উল্লেখ করেছেন যে, একজন করদাতাকে নিয়মিত GSTR-1– GSTR-3B– GSTR-9-এর মতো একাধিক ফর্ম পূরণ করতে হয়, যা কর আইন সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে

অত্যন্ত কঠিন। অনেক সময় ব্যবসায়ীরা শুধু GSTR-3B ফাইল করেন, কিন্তু GSTR-1 ফাইল না করায় Input Tax Credit ব্লক হয়ে যায়। এছাড়াও বছরে একবার GSTR-9 ফাইল করা বাধ্যতামূলক এবং এটি ফাইনাল রিটার্ন হিসেবে কাজ করে। এখানে সামান্য ভুল করলেও প্রশাসনিক জটিলতা ও আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অনেক সময় খুব সামান্য ভুলের জন্য যেমন ইনভয়েসে ভুল HSN কোড, ভুল কর হার বা দেরিতে রিটার্ন জমা, তার জন্য GST দপ্তর থেকে নোটিশ পান অথবা আর্থিক জরিমানা দিতে বাধ্য হন। এই ধরনের চাপে পড়ে অনেক MSME উদ্যোক্তা রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে ফেলেন বা কর কাঠামোর বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাও একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, যেসব ব্যবসার বার্ষিক টার্নওভার ৪০ লক্ষ বা তার বেশি (সেবামূলক ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ), তাদের জন্য GST রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। কিন্তু অনেকে এই সীমার খুব কাছাকাছি থাকলেও রেজিস্ট্রেশন এড়িয়ে চলেন, কারণ তারা কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত চাপ, রিটার্ন ফাইলিং-এর ঝামেলা এবং আইনি বাধ্যবাধকতায় জড়াতে চান না। কিন্তু এর ফলে তাঁরা বৃহৎ সংস্থার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারেন না এবং অর্থনৈতিকভাবে একঘরে হয়ে পড়েন। GST রেজিস্ট্রেশন থাকলে একজন ব্যবসায়ীর বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলির কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি কেউ সময়মতো রিটার্ন ফাইল করতে না পারেন বা প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স বজায় রাখতে ব্যর্থ হন, তাহলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সুযোগ ক্ষুণ্ণ করে।

এই প্রেক্ষাপটে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল, সরকারি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা। ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং সেন্টার, GST হেল্পডেস্ক বা সহজ ভাষায় নির্দেশিকা এখনো পর্যাপ্তভাবে পৌঁছায়নি গ্রামাঞ্চলে কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অনেকেই Composition Scheme সম্পর্কে জানেন না, কিংবা কর সংক্রান্ত সরকারী ছাড় কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তাও বোঝেন না। সার্বিকভাবে দেখা যায়, GST-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের একটি ফরমাল অর্থনীতির আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়, কিন্তু আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক দিক থেকে যে চ্যালেঞ্জগুলি সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবেলার জন্য বৃহৎ নীতিগত ও অবকাঠামোগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করলেই ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন হবে না, বরং একটি

সহায়ক পরিবেশ, সহজতর রিটার্ন ব্যবস্থা এবং সহজলভ্য ঋণ পরিকাঠামো তৈরি করলেই বাস্তব উন্নয়ন সম্ভব।

সরকারি সহায়তা, পরিসংখ্যান ও প্রাসঙ্গিক বাস্তবতা: GST-র প্রবর্তন ভারতীয় কর ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হলেও, এর প্রভাব ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME)-র উপর একমাত্রিক নয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, বিশেষত যেসব ব্যবসা দ্রুত ডিজিটাল এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। Mukherjee & Sinha (2021) দেখিয়েছেন, GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) থাকলে ই-ইনভয়েসিং ও Input Tax Credit (ITC) গ্রহণের প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়, ফলে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসার লেনদেনের সুযোগ তৈরি হয়। এই পরিচয়পত্রটি একটি রেজিস্টার্ড ব্যবসার জন্য আইনি বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, যা শুধু বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করে না, বরং সরকারি ও বেসরকারি টেন্ডারে অংশগ্রহণকেও সম্ভব করে তোলে (Dasgupta– 2022)। GST বাস্তবায়নের অন্যতম লক্ষ্য ছিল করব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা এবং কর ফাঁকির পরিমাণ হ্রাস করা। GST চালুর ফলে করদাতাদের রিপোর্টিং পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কর কাঠামোর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে MSME খাত কর ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও সহজভাবে। সরকারি সহায়তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল Composition Scheme, MSME সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্প, এবং GST সেবা কেন্দ্রের মতো পদক্ষেপ (MSME Ministry– 2023)। Composition Scheme এমন এক ব্যবস্থাপনা যেখানে বার্ষিক নির্দিষ্ট টার্নওভারের নিচে থাকা ব্যবসায়ীরা একটি নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করে শুধুমাত্র বছরে একবার রিটার্ন জমা দিতে পারেন। Khan & Batra (2021) দেখিয়েছেন, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর কর-সংক্রান্ত প্রশাসনিক চাপ অনেকটাই কমেছে। তবে এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে বহু MSME উদ্যোক্তা এর প্রকৃত সুফল পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন (Banerjee & Chatterjee– 2022)। সরকারি উদ্যোগের কার্যকারিতা ও GST-এর বাস্তব প্রভাব নির্ধারণে পরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। tatista (2023)-র তথ্য অনুসারে, GST চালুর পরে ২০১৭,১৮ অর্থবছর থেকে ২০১৯,২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় শতকরা ২৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসা স্বেচ্ছায় কর রেজিস্ট্রেশনে

অগ্রসর হয়েছে। এটি স্পষ্ট করে যে একটি অংশ ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং আইনি সুবিধা লাভের আশায় GST কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বিপরীত চিত্রও রয়েছে, KPMG India (2022) তাদের বিশ্লেষণে দেখিয়েছে, এই একই সময়ে প্রায় শতকরা ১৮ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে কর সংক্রান্ত জটিলতা, কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত চাপ, এবং রিটার্ন ফাইলিং-এর জটিলতা ইত্যাদির কারণে।

GST বাস্তবায়নের আর্থিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, World Bank (2022) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে GST চালুর পরে MSME গুলির ব্যয় গড়ে শতকরা ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ হল প্রযুক্তিগত সংশোধন, অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ, কর সংক্রান্ত সফটওয়্যার ব্যবহারের খরচ এবং প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। তবে একই সঙ্গে রিপোর্টটি এও বলেছে যে এই খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কর কাঠামোর স্বচ্ছতা, আইনি সুরক্ষা ও করদাতার অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা বেড়েছে, যা ভবিষ্যতের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা। আঞ্চলিক স্তরে GST বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সর্বত্র এক নয়। Das & Sinha (2023) তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলি ডিজিটাল পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে তুলনামূলকভাবে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে ইন্টারনেটের গতি, বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিয়মিতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাব রিটার্ন ফাইলিং, রেজিস্ট্রেশন, ইনভয়েসিং ইত্যাদিকে কঠিন করে তোলে। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে, যেখানে ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো অপেক্ষাকৃত উন্নত, সেখানে MSME রেজিস্ট্রেশন এবং কর পরিশোধের হার তুলনামূলকভাবে বেশি (Nandakumar– 2023)। এটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে GST বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

এই গবেষণার অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের ১৫০ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, যা GST বাস্তবায়নের উপকারিতা ও চ্যালেঞ্জ উভয়কেই তুলে ধরে। একজন গার্মেন্টস দোকানের মালিক বলেন, ‘প্রথমে ভয় লাগত, এখন মোবাইল অ্যাপ দিয়েই GSTR-3B জমা দিই।’ এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে প্রথম পর্যায়ে প্রযুক্তি ও নিয়ম সম্পর্কে

ভীতি থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছেন। একইভাবে, একজন ক্ষুদ্র খাদ্য প্রস্তুতকারক মন্তব্য করেন, 'ITC না পেলে লাভের মার্জিনে প্রভাব পড়ে।' এখানে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি Input Tax Credit-এর সুবিধা নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আসছে, যা দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক হতে পারে। তবে এই সমস্ত অর্জন স্বতঃসিদ্ধভাবে আসেনি। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখনও অনেকেই রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা, কম্পোজিশন স্কিমের সুবিধা কিংবা ITC ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন। অনেক MSME উদ্যোক্তার অভিযোগ, সরকারি দপ্তরে সমন্বয়ের অভাব, তথ্য বিভ্রান্তি এবং সঠিক পরামর্শ না পাওয়ার কারণে তাঁরা কর কাঠামোর ভিতরে এসেও তার পূর্ণ সুবিধা পাচ্ছেন না। এছাড়া, GST সেবা কেন্দ্রগুলির সংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং অনেক জেলায় এখনো এই পরিষেবা পৌঁছায়নি। ফলে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এই সেবাগুলির বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কর প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ছোটখাটো ভুলের জন্য GST অফিস থেকে নোটিশ আসে, জরিমানা ধার্য হয় এবং অনেক সময় ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি MSME উদ্যোক্তাদের মধ্যে আতঙ্কের জন্ম দেয় এবং অনেক সময় তারা কর ব্যবস্থার বাইরে থাকতে উৎসাহিত হন। অতএব, স্পষ্ট যে GST-র ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসার পরিসরে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর এসেছে, কোনও দিক থেকে তা প্রগতিশীল ও স্বচ্ছ, আবার অন্য দিক থেকে তা চ্যালেঞ্জপূর্ণ ও জটিল। সরকারি সহায়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা যদি যথাযথভাবে কার্যকর হয়, তাহলে এই কর ব্যবস্থা MSME-দের জন্য আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারে। ভবিষ্যতে কর কাঠামো সরলীকরণ, প্রশিক্ষণ বিস্তার, তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে GST সহায়তা কেন্দ্র বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে GST-এর সংহতি আরও দৃঢ় করা সম্ভব।

উপসংহার: ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ বা MSME খাত। এই খাত শুধুমাত্র কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, বরং দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, রপ্তানি এবং প্রাদেশিক অর্থনীতির বিকাশেও অসামান্য অবদান রাখে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে GST-র

মতো ব্যাপক কর সংস্কারের প্রভাব অবশ্যই সুদূরপ্রসারী। GST চালুর ফলে একদিকে যেমন কর ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এর প্রভাব ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক কাঠামোর উপর একটি দ্বিমুখী চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, GST একটি প্রযুক্তিনির্ভর, অনলাইনকেন্দ্রিক কর ব্যবস্থাপনা চালু করায়, প্রচলিত কাগজনির্ভর করব্যবস্থা থেকে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি আধুনিকীকরণমূলক পদক্ষেপ, তবে ভারতের বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায় এখনও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব, ডিজিটাল দক্ষতার সীমাবদ্ধতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, GSTN পোর্টাল, ইনভয়েসিং সফটওয়্যার, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং রিটার্ন ফাইলিং পদ্ধতিতে স্বচ্ছন্দ না হওয়ার কারণে ব্যবসার মূল ক্রিয়াকলাপেই প্রভাব পড়ছে। দ্বিতীয়ত, নগদ প্রবাহের সংকট এবং ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (ITC) পেতে বিলম্ব এই খাতে উল্লেখযোগ্য একটি সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা কাঁচামাল ক্রয়ে পর্যাপ্ত ডকুমেন্টেশন রাখতে না পারার কারণে ITC সুবিধা পান না, ফলে তাদের প্রফিট মার্জিনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কমপ্লায়েন্সের চাপ, যেখানে বিভিন্ন ফর্ম, নির্দিষ্ট সময়সীমা, জরিমানা এবং আইনগত জটিলতা ব্যবসায়ীদের প্রশাসনিক কাজের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে ইহাই চিত্রের একমাত্র দিক নয়। বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী GST ব্যবস্থার সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। সরকারি প্রশিক্ষণ, সাহায্যকেন্দ্র, কম্পোজিশন স্কিম এবং কর পরামর্শের প্রসার কিছুটা হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। GST রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার ফলে কিছু ব্যবসায়ীরা বৃহৎ সংস্থার সাথে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা বাড়ছে এবং টেন্ডারে অংশগ্রহণের পথ খুলছে। একই সঙ্গে দেখা গেছে আঞ্চলিক স্তরে বৈষম্য। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে যেখানে প্রশাসনিক সহায়তা ও ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নত, সেখানে MSME খাত তুলনামূলকভাবে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসমের মতো কিছু রাজ্যে এখনও প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট অ্যাকসেস ও সচেতনতার ঘাটতির কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসার বিপর্যয় চলছে।

এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ ও প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, প্রতিটি জেলায় GST প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও তা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য রিটার্ন ফাইলিং প্রক্রিয়া আরও সরলীকরণ করা জরুরি।

তৃতীয়ত, কম্পোজিশন স্কিমের পরিধি সম্প্রসারণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক খরচ কমানো যেতে পারে। সর্বোপরি, প্রশাসনিক জটিলতা দূর করে করদাতাদের সহানুভূতিশীল সহায়তা প্রদান করাই এই নীতির দীর্ঘমেয়াদি সফলতার চাবিকাঠি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, GST একটি অর্থনৈতিক সংস্কার যা ভারতের করব্যবস্থায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছে। তবে এই সংস্কারের প্রকৃত সুফল পেতে হলে ক্ষুদ্র ব্যবসার বাস্তব পরিস্থিতি, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনাকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একটি অর্থনৈতিক সংস্কার তখনই সফল হয়, যখন তা সমাজের প্রতিটি স্তরে সমভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করা হলেই GST ব্যবস্থা ভারতের অর্থনীতিতে প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটাতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জি :

1. Ahmed, S. (2023). Micro-level impacts of GST on food processing units. Journal of Business Transformation, 12(3), 55-62.
2. Banerjee, R., & Chatterjee, M. (2022). State-level assistance in MSME GST compliance. MSME Policy Digest, 3(1), 67, 78.
3. Bhattacharya, R. (2022). Cash flow crisis under GST regime. Journal of Tax Studies, 14(2), 91,99.
4. Bose, T. (2022). GST impact on leather SMEs in Bengal. SME Outlook, 5(1), 43,50.
5. ChakraBorty, P. (2022). Tender eligibility and GST registration. Business Process Today, 7(4), 28,36.
6. Choudhury, N. S2022V. Awareness gap among GST payers. Fiscal Transparency Journal, 8(3), 60,69.
7. Das, S., & Sinha, M. (2023). Regional disparity in GST implementation. Indian Journal of Federal Studies, 9(2), 44,59.
8. Dasgupta, R. (2022). GST as identity for SMEs. Business Identity Report, 6(1), 12, 18.

9. Desai, M., & Rathi, N. (2022). Training needs of MSME under GST. SME Development Journal, 4(2), 72,83.
10. Deshmukh, A. (2019). Before and after GST- A comparative Study. Indian Tax Quarterly, 11(1), 91,105.
11. Dutta, R. (2021). Business closures due to GST transition. Journal of Economic Shifts, 10(4), 25,38.
12. Ghosh, B. (2020). GST return complexities. Indian Revenue System Review, 3(3), 49, 56.
13. Jain, P., & Sengupta, R. (2021). Structure of GST in India. Finance & Policy Review, 9(1), 11, 22.
14. Joshi, V. (2023). MSME and Bank credit after GST. Finance Flow Review, 5(2), 58,66.
15. Khan, F., & Batra, Y. (2021). Composition Scheme under GST. Taxation Policy Journal, 7(2), 21, 30.
16. KPMG India. (2022). SME performance post-GST. Sectoral Impact Report.
17. Kumar, S. (2020). GST fundamentals. Modern Indian Taxation, (S1), 1,15.
18. Kumar, S., & Sinha, P. (2021). Credit cycles in GST regime. India Fiscal Studies, 12(3), 30,42.
19. Mandal, R. (2022). Digital Divide and GST Compliance. Economic Access Journal, 4(2), 37, 45.
20. Mitra, S., & Basu, D. (2021). Credit and Shutdowns in SMEs post-GST. Journal of Informal Economies, (S1), 20,29.
21. Mukherjee, A. (2020). Reforming Indiaós indirect tax. National Institute of Public Finance.
22. Mukherjee, A., & Rao, M. (2022). GST transition and Sectoral impact. Centre for Economic Research.
23. Mukherjee, R., & Sinha, D. (2021). Positive outcome of GST. Economic Policy Weekly, 14(2), 73,80.

24. Nandakumar, V. (2023). State-wise GST training access. Indian Fiscal Review, 6(2), 18, 25.
25. Narayan, M. (2023). Efficiency of tax collection post-GST. Financial Strategy Quarterly, 4(3), 84, 91.
26. Nayak, U. (2023). Employment generation in MSME Sector. Labour Economics of India, 8(1), 55, 67.
27. Patel, D. (2021). GST knowledge gap in tier-II cities. Policy and People, 3(2), 29,35.
28. Statista. (2023). GST registration trends among Small Businesses in India (First three years post-implementation). Statista Insights Report.
29. World Bank. (2022). The impact of GST on MSME operating costs in India- A Sectoral analysis. World Bank Policy Research Working Paper.

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারী চরিত্রের আধুনিকতা

সুশান্ত রুহিদাস *

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালিকে তার মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। বাংলা সাহিত্যে নতুন চিন্তা ও চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে এই সময়েই। বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যে মানুষকে এবং মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে আরো বেশি মূল্য দেওয়া শুরু হয়েছিল। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তির চাওয়া পাওয়া, তাদের অধিকার বড় হয়ে উঠছিল। এই নতুন ভাবনাকেই মাইকেল মধুসূদন কাজে লাগালেন সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যকে নতুন একটা দিশা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ওভিদের 'হিরোইডস' কাব্য অবলম্বনে তিনি লিখলেন একটি পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২)। মধুসূদন দত্তের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম পত্র সাহিত্যের সূচনা হল। কাব্যটিতে তিনি ১১ জন পৌরাণিক নারীর বীরত্বের কথা প্রকাশ করেছেন।

মধুসূদন পৌরাণিক এই বীর নারীদেরকে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষিতে গড়ে তুললেন। মধুসূদনের হাতে প্রতিটি নারী চরিত্রই তাঁদের স্বগুণে আধুনিক হয়ে উঠেছেন। প্রতিটি নারীর কথায় আমরা আধুনিক যুগ যন্ত্রণার অন্তরবেদনা প্রকাশ পেতে দেখি। প্রকাশ পেয়েছে নারী চরিত্রগুলির অন্তরাত্মা। আধুনিক মানবিক বোধ ও চেতনায় নারীর পাওয়া, না পাওয়া কাব্যের মূল আবেদন হয়ে উঠেছে। কাব্যের নায়িকারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামেননি ঠিকই কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাঁরা প্রত্যেকেই একেকজন বীরাঙ্গনায় পরিণত হয়েছেন।

সূচক শব্দ: ওভিদ, হিরোইডস, মধুসূদন দত্ত, নবজাগরণ, পৌরাণিক নারী চরিত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, আধুনিকতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের মানসপুত্র। তিনি বাঙালিকে নবজাগরণের আলোকে এক ভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি প্রাচ্যের অনুভূতি

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: sushantaruhidas@gmail.com

এবং পাশ্চাত্যের আঙ্গিককে গ্রহণ করে অভিনব চিন্তা-চেতনায় এক সাহিত্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। রোমান কবি ওভিদের ‘হেরোইডস’ কাব্যের অনুসরণে মধুসূদন ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যটি লেখেন। ওভিদ ছিলেন খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের প্রাচীন কবি কিন্তু মধুসূদন কালের বিচারে উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবি। দুজনের মাঝখানে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান কিন্তু আধুনিকতা যে ‘কালগত নয়, মর্জিগত’, একালের বিখ্যাত কবি ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে সে-কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে লিখলেন, তএটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।দ মূলত এই ‘ভাবের কথা’র ওপর নির্ভর করেই একজন কবি বা শিল্পী সাহিত্যচর্চা বা শিল্পচর্চা করেন। যে সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি চর্চা করেন সেই সময়ের রুচি, সংস্কৃতির বিপ্রতীপে তাঁর নিজস্ব ভাবনাকে বাহন করে নিজের চিন্তা-চেতনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই ভাব-প্রবাহের হাত ধরেই তাঁদের নিজস্ব অবস্থান তাঁরা সুনিশ্চিত করেন।

ওভিদ যখন সাহিত্যচর্চা করেছেন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে হাজার বছরের গ্রিক ও রোমান ঐতিহ্য মাথায় রেখে গ্রিক-পুরাণ থেকে নারী চরিত্রগুলি তিনি আহরণ করেছেন এবং চরিত্রগুলিতে আধুনিকতার আলো ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। বিশেষত ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিতে ওভিদ বেশ কয়েকটি পত্র রচনা করেছেন। ওভিদের পত্রে নারীর প্রেম বা উত্তপ্ত কামনা বাসনা উনিশ শতকে এসে মধুসূদনের লেখনীতে তাঁরা কেবল আর প্রেমে সীমাবদ্ধ নন বরং প্রতিবাদের পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে। ‘আপন ভাগ্য জয় করিবার’ দৃপ্ত আলোকে নারীকে স্বমহিমায় তখনই আমরা প্রথম আবিষ্কার করেছি। মধুসূদন তাঁর ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ ও মহাভারতের পৌরাণিক নারীদের চিন্তা-চেতনাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় পুরাণ ছাড়াও মধুসূদন প্রাচ্য সাহিত্যের বিশেষ করে কবি কালিদাসের কাছে যথেষ্ট ঋণী। দুই কবির কাব্যের মূল আবেগ প্রেম, বিচিত্র বর্ণে প্রেমের বিচ্ছুরণ ঘটেছে এক একটি পত্রে। তাঁদের নায়িকাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, আশা ও আশঙ্কা, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, সফলতা ও বিফলতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি চূড়ান্তরূপ লাভ করেছে।

মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের নারী চরিত্রগুলি পৌরাণিক চরিত্র হলেও মধুসুদন আধুনিক যুগ-যন্ত্রণার দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, মানসিক টানাপড়েন, নানান ভাব ও ভাবনা বিশেষত নারীর একান্ত চিন্তা ও চেতনাকে আধার করে কাব্যটির নির্মাণ করেছেন। উনিশ শতকের

নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অতীত ঐতিহ্য ও পুরাণকে জাতীয় নবজাগরণের নতুন চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত করা। মধুসূদন সেই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাব্যে নারী চরিত্রগুলিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে আমাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। নারী কেবল যৌনজীবনের সঙ্গী হিসেবে আর থাকল না, নারীর এক স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হল।

আসলে মধুসূদন বাংলা কাব্যকে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ''আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।''[১]

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারী আপন প্রেম, ভালোবাসা, সমর্পণে যেমন সৌন্দর্যময়ী তেমনি অন্যদিকে আপন অস্তিত্ব সচেতনতায়, অধিকারবোধে ও সমাজ বিরোধিতায় বলিষ্ঠ এবং বিচিত্ররূপিণী। রেনেসাঁসের আলোকে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নতুন চোখে দেখেছেন বলেই তিনি 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্য রচনা প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এই কাব্যে পুরাণের নারীকে তিনি আধুনিকা করে তুলেছেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে এগারোটি পত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এগারোটি নারী চরিত্রকে শৌর্য-বীর্য, সমাজ বিরোধী প্রেয়সী ও সচেতনতায় রমনীয় আধুনিক নারী হিসেবে তৈরি করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকে শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় কিরকম বিভোর হয়ে থাকতেন তার আভাষ আমরা পাই দুর্বাসার অভিশাপে। কিন্তু সেই শকুন্তলার বিরহী চিত্তের আকুল প্রতীক্ষা, সর্বপ্রকার মান-অভিমান, বিরহজ্বালা, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা নিয়ে শকুন্তলা কতখানি মানবীয় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ আমরা পাই প্রথম স্বর্গ 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে। কালিদাসের নাটকের সেই বিরহের মর্মরমূর্তি এখানে পরিণত হয়েছে এক সজীব আধুনিক নারীতে। শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত ভুলে গেলেও, তাঁর দেওয়া কথা শকুন্তলা ভূলেন নি। তাই আধুনিক শকুন্তলা জানতে চেয়েছন দুষ্মন্তের কাছে—

> ''এ নব যৌবনে এবে তেজিলা কি তুমি

প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে?
এ মনে যে সুখ-পাখি ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ?"[২]

সরলা শকুন্তলাকে ব্যাধের মতো ছলনা করেছেন রাজা দুষ্মন্ত। বনবাসিনী শকুন্তলা তাই জবাব চেয়েছেন। এমনকি ক্রোধে দুষ্মন্তকে 'নরাধিপ' বলতেও ছাড়েননি। বন-নিবাসিনী শকুন্তলা তো কিছুই চায়নি, শুধু চেয়েছিল এতটুকু ভালোবাসা, একটু সহানুভূতি। সে তাও পেল না, কিন্তু মনে ক্ষীণ আশা তখনও অবশিষ্ট, দুষ্মন্ত একদিন নিশ্চিত ফিরবেন। তাই এই চিঠিটি লিখে রাজার কাছে পাঠালেন। শকুন্তলা, পত্রের শেষে বলেছেন 'জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!' এই পঙক্তিতে শকুন্তলার ভগ্ন আশা, তার মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। পত্রটিতে শকুন্তলার বিরহিণী নারী হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, স্বামীর প্রতি অনুযোগ ও অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। যা তাকে বীরাঙ্গনা করে তুলেছে।

দ্বিতীয় স্বর্গ 'সোমের প্রতি তারা' পত্রে দেখা যায় গুরুপত্নী হয়েও ঋষি বৃহস্পতির স্ত্রী তারা সোমদেবের প্রেমে পড়েছেন। যেদিন সোমদেব তাদের আশ্রমে প্রথম এসেছিলেন সেদিন থেকেই প্রেমে পড়েছেন। কিন্তু তারা দেবী সে কথা বলতে পারেননি। সন্তান তুল্য সোমের প্রতি প্রেম ছিল সমাজবিরুদ্ধ। এ এক লজ্জার কথা। তবু লজ্জাহীনা হয়ে তারা নিজের মনের কথা প্রকাশ করেছেন। মনই তো সব। মনের ভাবনায় তো লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই তারা সমাজের সব বাধাকে হেয় করে সোমদেবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। পুরাণের তারা চরিত্রকে মধুসূদন এখানে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। সোমদেব এখানে নির্দোষ চরিত্র। পুরাণে তা ছিল না। তারা এখানে উপযাচিকা হয়ে সোমদেবের কাছে প্রণয় প্রার্থনা করেছেন—

"গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্য দোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবী পা দুখানি!"[৩]

স্বভাবত পত্রটির মধ্যে রয়েছে তারার মানসিক সংস্কারের সাথে গোপন প্রণয় বোধের

তীব্র দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তারা চরিত্রটি মানবিক হয়ে উঠেছে। মধুসূদন নিপুণভাবে তারার মনস্তত্ত্ব এখানে তুলে ধরেছেন। মধুসূদন তারার অবৈধ আসক্তির সঙ্গে সংস্কার ও পাপ-পুণ্য বোধের দ্বন্দ্বকে মিশ্রিত করেছেন। তাই তারা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছেন। তিনি আত্মগ্লানিতে পুড়েছেন।

ভারতীয় পুরাণের প্রতি মধুসূদনের দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল চিরদিনই। বীর রসে ভরপুর পুরাণগুলির অনুরাগী ছিলেন মধুসূদন। কিন্তু সেই পুরাণকেই তিনি নতুনত্ব দান করেছেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। পুরাণের কাহিনিকে মধুসূদন হুবহু অনুসরণ না করে আপন কল্পনা রসে রঞ্জিত করে নারীগুলিকে আধুনিক নারীতে পরিণত করেছেন। পুরাণের কাহিনিতে তারার কোনো কলঙ্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। সোমকেই সেখানে তারার রূপে মোহিত হতে দেখা যায়। এমনকি দেখা যায় কুপ্রস্তাব দিতেও। কিন্তু মধুসূদনের তারা সোমকে নানাভাবে প্রলোভিত প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছেন;

"এসো তবে, প্রানসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,ধর্ম, লজ্জা,ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুলো বিহাঙ্গিনী
উড়িলো পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ! তারানাথ ?"[৪]

গুরুপত্নী তারা বিরহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে সমাজধর্ম, পতিপরায়ণতা সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে আপন মনের ভাবকেই বড়ো করে তুলেছেন। তিনি পুরাণকে অস্বীকার করেছেন। সোমকে আত্মসমর্পণের কথা জানিয়ে অবৈধ প্রেমপত্র লিখেছেন। আসলে আশ্রমের পবিত্র বলয় ও এক ঋষিপত্নীর বিপক্ষে গিয়ে তারা একটু উষ্ণতার সন্ধান চেয়েছেন সোমদেবের কাছে। যেন এক স্থবির প্রাণহীন দাম্পত্য জীবনের বিরুদ্ধে যৌবনের স্বাভাবিক বিদ্রোহ।

'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রে প্রেমভাবনা উচ্চারিত হতে দেখা যায়। নারী যেখানে অন্তঃপুরবাসিনি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে তাদের নেই সেখানে দেখা যায় রুক্মিণী নিজের পথ নিজেই নির্বাচন করেছেন। নারী মনের এই গোপন ভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের রেনেসাঁসের আলোকে আলোকিত মধুসূদনের কলমে নতুনভাবে উঠে এসেছে। রুক্মিণী পৌরাণিক চরিত্রের আবরণে ভাবী কালের নারীসত্তা।

পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী ভোজ দেশের অধিপতি রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী দেবী। চেদীশ্বর শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণী দেবীর বিয়ে ঠিক হয় কিন্তু দ্বারকানাথ রুক্মিণীর স্বপ্নপুরুষ। রুক্মিণী তাই লজ্জায় ভয়ে কম্পিত বক্ষে পত্র লেখেন তাকে—

''লজ্জাভয়ে? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে—
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী;
কাঁপে হিয়া থরথরে! না জানি কি করি;''[৫]

রুক্মিণীর ভিতর লজ্জিত এই ভাব মধুসূদনের সমকালীন নারীদের মনে করায়। সেই সময় নারীর নিজ পতি নির্বাচন ছিল দূরুহ ব্যাপার। পরিবারের বিপক্ষে যাওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু নারী মনের গোপন বাসনাকে প্রকাশ করেছেন মধুসূদন। আসলে মধুসূদন ভাবীকালের নারীকে উপস্থাপন করেছেন এখানে। পত্রে রুক্মিণী তার মনের কথা জানিয়েছেন দ্বারকানাথকে। তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছেন প্রিয়তমকে। অন্য কোন পুরুষকে হৃদয়ে বসাতে পারবেন না। দ্বারকানাথের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

''নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে''[৬]

মধুসূদনের সমকালে নারীর প্রেমিকার রূপ তুলে ধরা অসম্ভব ছিল। মধুসূদন তা সম্ভব করে দেখিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর নারীর না বলা কথা রুক্মিণীর মধ্য দিয়ে কবি মধুসূদন প্রকাশ করেছেন।

চেদিশ্বরের শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু রুক্মিণী শিশুপালকে গ্রহণ করতে পারবেন না। মন, প্রাণ দিয়ে দ্বারকানাথকে প্রার্থনা করে আসছেন। অন্য পুরুষকে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । নারী হৃদয়ের সেই যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে পত্রটিতে—

''স্বেচ্ছায় দিয়াছ দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ, অন্য জনে;ক্ষম, গুণনিধি!
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে!''[৭]

রুক্মিণী বিপদের দিনে স্মরণ করেছেন দ্বারকানাথকে। শিশুপাল আসার আগে দ্বারকানাথ যেন হরণ করে নিয়ে যায় তাকে। পত্রিকাটিতে দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণীর যে প্রেম নিবেদন তা উনবিংশ শতাব্দীর ভাবীকালের নারী হৃদয়ের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

অন্তঃপুরবাসিনী নারী হৃদয়ের প্রেম ভাবনা ধরা পড়েছে এখানে। এতদিন পর্যন্ত যে নারীরা নিজেদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মত প্রকাশের সুযোগ পায়নি, সেই নারী তার একান্ত বেদনার জায়গাগুলিকে অকপটে প্রকাশ করেছেন। মধুসূদন রুক্মিণী চরিত্রটিকে পৌরাণিক আখ্যান থেকে গ্রহণ করেছেন। সুদূর অতীতে যেখানে পৌরাণিক যুগে নারীদের উপশাসন, অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়া হত। পতি নির্বাচনে পরিবারের মতামত ছিল শেষ কথা। যেখানে নারী তার হৃদয়ের কথা হৃদয়ে চেপে রাখতে বাধ্য হত। মধুসূদন আধুনিক যুগের চিন্তা ভাবনার উপযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন সেই নারী-হৃদয়। প্রেম নিবেদনে নারীও যে তার স্বতন্ত্র স্বাধীন মতামত দিতে পারে তার উল্লেখ পাই পত্রটিতে।

কেকয়ী রাজধর্ম এবং প্রতিজ্ঞাপরায়ণতায় বিশ্বাসী হলেও, রেনেসাঁসের আলোতে উজ্জীবিত হয়ে দশরথের প্রতিশ্রুতি কিছুতে ভুলতে পারেন না। স্ত্রী কেকয়ী এবং বীরাঙ্গনা কেকয়ীর মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব চলেছে। কারণ আধুনিক যুক্তিতে বিশ্বাসী কেকয়ী মানুষের সত্যতাকে মানবধর্ম বলে মনে করেছেন। দশরথ আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে আমরা কেকয়ীকে বিষাদগ্রস্ত এক রমণী হিসেবে পাই। দশরথ আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে বলে যার রাজমাতা হওয়ার কথা ছিল সে আজ ভিখারিনী বেশে ভরতকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগের দিশারী হয়েছেন। মানসদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন কেকয়ী। তাই তিনি স্বামী বা রাজা দশরথকে তীব্র ব্যঞ্জনা এবং সমালোচনা করেছেন। তিনি সমাজের প্রত্যেকটি কোণে দশরথের এই কুকৃতির কথা ছড়িয়ে দিতে চান। কামুক দশরথের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা এবং সমালোচনার ভার মাথায় নিয়ে এই স্বর্ণনগরী ত্যাগ করতে চান কেকয়ী। কামের বসে মত্ত হয়ে যে প্রতিজ্ঞা দশরথ করেছিলেন তা তিনি আজ রাখতে পারেননি। কিন্তু রানী কেকয়ী অবলা নন। তিনি সকল প্রতিশ্রুতির জবাব চান—

> ‘‘সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
> কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্মে সাক্ষী করি,
> মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
> বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা তা কহ—’’[৮]

রাজা দশরথ যে অধর্মাচারী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী তা ক্ষত্রকুলবালা, ক্ষত্রকুলনারী কেকয়ী সকল সমাজের মানুষকে জানিয়ে দিয়ে নিজের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। তাই কেকয়ী বলেছেন;

"যেখানে যাহারে পাব,কব তার কাছে;
পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি!"[৯]

ঠিক এই ধরনের ক্ষত্র শোণিত বীর-রমণীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় জনার কণ্ঠে। পুত্রের শোকে কাতর মা কিছুতেই পুত্র হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারেননি। স্বামী নীলধ্বজ কিভাবে তার একমাত্র পুত্রের হত্যাকারীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করছেন তা দেখে জনা হতবাক, দিশাহীন, কাতর এবং প্রতিবাদী। রাজা নীলধ্বজ অপমানের শিরোপা মাথায় নিলেও এক মা, এক রাণী তা কখনো স্বীকার করতে পারেননি। আহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় প্রতিশোধ পরায়ণা জনা স্বামীকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে জীবন দিতে চেয়েছেন। অপমানে কাতর মা তার স্বামী এবং সমাজের বিরোধিতা করেছেন—

"চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র-কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কূল বধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?"[১০]

ক্ষত্রকুলবাল, বীর, সাহসী, বীরাঙ্গনার যথার্থ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই জনা ও কেকয়ী চরিত্রের মধ্যে।

রামায়ণের সূর্পণখা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে এক সুন্দরী কোমল প্রেয়সী হয়ে উঠেছেন। রাক্ষসী সূর্পণখার সঙ্গে বীরাঙ্গনা সূর্পণখার প্রভেদ পত্রের শুরুতেই কবি দিয়েছেন। প্রেমকে কোনো বাধা বা বন্ধনে আটকে রাখা যায় না। সূর্পণখা লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে স্পষ্টবাদীতা এবং সুভাষিনী হয়েছেন। সমাজে চিরাচরিত প্রথাকে লঙ্ঘন করে প্রেম প্রস্তাব দিয়েছেন লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণের বনবেশি রূপ দেখে সূর্পণখা মুগ্ধ হয়েছেন এবং লক্ষণকে তাঁদের ধন, যশ, রাজ্য, পরাক্রমী সৈন্য দান করার কথা বলেছেন। সেই সময়ের এক নারীর মুখে তার অস্তিত্ব সচেতনতা এবং লক্ষণকে যে রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি সত্যিই বিরল। লক্ষ্মণের জন্য সূর্পণখা জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি আছেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলনের জন্য তার দেহ ও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—

"এস, গুননিধি,
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!"[১১]

লক্ষ্মণকে পেতে প্রেমময়ী সূর্পণখা হয়েছেন সাধিকা। লক্ষ্মণ ছাড়া তার কাছে সবই

মিথ্যা কিন্তু সূর্পণখা ছিলেন বাল বিধবা। এই সূর্পণখা লক্ষ্মণের প্রেমে শুধু আত্মহারা হননি বিয়ের স্বপ্নেও তিনি বিভোর হয়েছেন। তিনি লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে চান লঙ্কায়। এর জন্য কলঙ্ক হলেও তার জন্য তিনি একটু চিন্তা করেননি।

"প্রেমাধিনা নারী কুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?"[১২]

মধুসূদন সমকালীন সমাজের লোকাচার বন্দী এক বিধবা নারীর হাহাকারে ভরা জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে। সেই সময়ে এক বিধবা নারীর প্রেম নিবেদন ছিল সমাজবিরুদ্ধ। কিন্তু মধুসূদনের সূর্পণখা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। এক বিধবার মনের কথাকে এই পত্রে স্থান দিয়েছেন মধুসূদন।

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রে পঞ্চপতির মধ্যে একমাত্র অর্জুনকে দ্রৌপদী তাঁর স্বামী রূপে মন থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন এ ধর্মসূত নয় কিন্তু তা তোয়াক্কা না করে অর্জুনকেই ভালোবেসেছেন। তৎকালীন সমাজে পুরুষেরা অধিক নারীতে আসক্ত ছিলেন। কিন্তু নারীর তাতে হস্তক্ষেপ বা মতামত দেওয়ার অধিকার ছিল না। নারী কেবলই চোখের জলে সীমাবদ্ধ ছিল। মধুসূদনের দ্রৌপদী বীর শ্রেষ্ঠ স্বামী অর্জুনকে বিরহ বেদনার ছলে পুরুষের কামুক চরিত্রের স্বরূপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামী অর্জুন হয়তো স্বর্গের অপ্সরাদের সুখ ত্যাগ করে পত্নী দ্রৌপদীর কাছে ফিরে আসতে পারছেন না। পত্রে নায়িকা জানান—

"কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সমৃণাল ভুজে তমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগার তুমি; নিত্য রসবতী
সুরবালা;; শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?"[১৩]

অর্জুনের বিরহে দ্রৌপদীর কোনোকিছুই ভালো লাগেনা। সতী নারীর কাছে পঞ্চ স্বামীই সমান। কিন্তু বিধির বিধানকে মেনে চলার ক্ষমতা নেই দ্রৌপদীর। ধর্ম সাক্ষী রেখে পাঁচজনের স্ত্রী হলেও অর্জুনই তার প্রাণকান্ত। অর্জুন ছাড়া জগতের সবকিছু তার কাছে শূন্য। অর্জুনের স্মৃতিই দ্রৌপদীর সব কাজের প্রেরণা। অর্জুনের প্রতি তার ভালবাসাই

তাঁর জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। দ্রৌপদী ধর্মের কথা চিন্তা করে তার প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেন না। স্বর্গ নয় অর্জুনের প্রেমই তার কাছে স্বর্গরূপ হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর স্ত্রী হিসেবে লজ্জা অনুভব করেন। মনে অর্জুনকে ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের ঠাঁই দিতে পারেন না। কুন্তির আদেশে অর্জুনকে পাওয়ার জন্য দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলেও, তাঁর নারী হৃদয় কখনই এই কঠিন শর্তকে মেনে নিতে পারেনি। মধুসূদনের দ্রৌপদী প্রেমের বলে বলীয়ান, অর্জুন ছাড়া কাউকে স্বামী আসনে বসানো তার ব্যক্তিত্বের পক্ষে বাধা স্বরূপ ছিল। দ্রৌপদী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নারীর চিরন্তন প্রেমই প্রাধান্য লাভ করেছে—

"পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালোবাসি নৃমণিরে,"[১৪]

অনন্ত যৌবনা স্বর্গের অপ্সরী হলেন উর্বশী। যুগ যুগ ধরে মর্ত্যের মানুষ তাকে কাছে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সেই উর্বশী মর্ত্যের চন্দ্র বংশীয় রাজা পুরুরবার প্রেমে পড়েছেন। প্রেমে পড়ে স্বর্গের সমস্ত সুখ ত্যাগ করে আসতে চান মাটির পৃথিবীতে। হেমকূট পাহাড়ে থাকাকালীন দৈত্য কেশী উর্বশীকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজা পুরুরবা ঊর্বশীকে উদ্ধার করেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়েন। যে উর্বশীকে বন্ধনে বাঁধা যায় না, সেই উর্বশীকে মধুসূদন বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। মধুসূদন স্বর্গের ডানা কাটা পরীকে মর্ত্য ভূমিতে নামিয়ে এনেছেন। প্রেমের শক্তিতেই উর্বশী বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছেন। বিধির বিধানের বিরুদ্ধে তিনি পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন;

"রূপ গুনাধিনা
নারীকুল নরশ্রেষ্ঠ কি ভবে কি দিবে;
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!"[১৫]

স্বর্গের অপ্সরার মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের ঐশ্চর্য দিয়ে মধুসূদন উর্বশীকে আধুনিকা করে তুলেছেন। দেবসভায় নাটকের অভিনয়ে উর্বশী যে ভালোবাসার কথা বলেছেন সে কথাই তিনি স্বগর্বে প্রচার করতে চেয়েছেন;

“শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি কি কাজ শরমে?;”[১৬]

পুরুষ শাসিত সমাজে ভানুমতী পুতুল-প্রতিমা হয়ে থাকতে চাননি। স্বামীর দোষের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। তার চরিত্রে ধর্মবোধ এখানে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। ভানুমতী জানেন পান্ডবদের সাথে যুদ্ধ করা অন্যায়। দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে ভানুমতী তাই বলেছেন ;

“এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ, চিত্রসেন যবে,
কুরুবধুদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?”[১৭]

ভানুমতীকে আমরা যথেষ্ট সক্রিয় চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই। স্বামীর প্রতি তার নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলেও স্বামীর অন্যায়কে তিনি যথাযথভাবে দেখিয়ে দিতে পেরেছেন। এখানে ভানুমতী চরিত্রের আধুনিকতা।

জাহ্নবী হরপ্রিয়া হওয়া সত্বেও রাজা শান্তনুকে বিয়ে করেন। শান্তনু জাহ্নবীর বিরহে গঙ্গার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু গঙ্গা নরম মনের নারী না হয়ে একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সাহসী নারী হয়ে উঠেছেন। তিনি শান্তনুকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে হস্তিনানগরীকে পরিচালনা করার আদেশ দেন এবং পুত্রকেও সমর্পণ করার কথা জানিয়ে পত্র লেখেন। এই ধরনের আদেশ আমরা দ্রৌপদীর মুখেও শুনতে পাই। যখন পত্রপ্রেরক ঋষি পুত্রের সঙ্গে অর্জুনকে ফিরে আসতে বলেন—

“কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে”[১৮]

এখানে দ্রৌপদী বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছেন। ভানুমতী এবং দুঃশলা আপন বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বে আধুনিক নারী হয়ে উঠেছেন। স্বামীর দেখানো পথেই স্ত্রীর পথ, স্ত্রীকে স্বামী নিতান্ত অনুগামী হওয়া উচিত এই চিরাচরিত ভাবধারা পরিবর্তন করে দুই নারী স্বামীদের কার্য বিশ্লেষণ করে সঠিক পথের অনুগামী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

মধুসূদন দত্ত যখন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন, বাংলা সাহিত্যে অন্তত তখন নারীর চিত্তমুক্তির কোনো সচেতন প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়নি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দেবদেবী অধ্যুষিত ক্ষেত্রে, কেবল নারী কেন পুরুষের স্বাধীনতাও তখন বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবিরা এবং ময়মনসিংহ গীতিকার কবিগণ নারী চিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষা অস্ফুট উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন। মনসামঙ্গলের কবিদের হাতে চাঁদ সদাগর চরিত্রটি কিছুটা স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহচর্যের ফলে এদেশে এক ভাব-বিপ্লবের সূচনা হয়। ফরাসি নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের আদলে একে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের আখ্যা দেওয়া যায়। এ ধরনের ভাব বিপ্লবে তিন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও তাই দেখা গিয়েছিল। আমাদের সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। নারীর মূল্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা, রামমোহনের সতীদাহ রোধ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রায় একই সঙ্গে ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাসে নারীর বৈধব্যের জ্বালা সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতি নিয়ন্ত্রিত মনোভাবের জন্য এ ধরনের চরিত্রের প্রতি শেষপর্যন্ত তিনি সুবিচার করতে পারেননি। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র উপন্যাসে তিনি নারীদের বিরাট কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্প কবিতা, গানে নারীচিত্তমুক্তির কথা নিঃসংশয় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন এবং দাম্পত্য সমাজ জীবনে নারীর প্রকৃত স্থান নির্দেশ করে দিলেন।

সাহিত্যের নারী চিত্তের মুক্তি ঘোষণা মধুসূদনের সময়ে সম্ভব হয়নি সত্য। কিন্তু তিনি এমন একটি কাজ করেছিলেন যা তাঁকে নারী চিত্তমুক্তির অগ্রদূত হিসাবে সম্মান জানাতে হবে। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বীরত্বের সংস্কার ও স্তোকবাক্য দিয়ে তাঁকে পুত্রশোক থেকে দমিত করা যায় না, মিথ্যা বীরত্বের অহংকারের চেয়ে এই মানবী-মাতার পুত্রশোক অনেক বাস্তব, অনেক বড় সত্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নারীদের ক্ষেত্রেও সেই মানবিকতা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

এই কারণেই বলা যায় মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে আধুনিক চেতনার স্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ যে মানবিকবোধ জাগিয়ে তুলেছিল মধুসূদনের স্পষ্ট নারীচরিত্রগুলি সেই মানবিক বোধে উজ্জীবিত। ফলে উত্তরকালের

বাংলা সাহিত্যে নারীমুক্তির যে আন্দোলন সূচিত হয়েছে, মধুসূদনকে তার অগ্রপথিক বলা যায়; ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যটি তারই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যটি উনিশ শতকের সার্বিক বিচারে এককথায় নারীর মুক্তির গান। স্বল্প পরিসরে মধুসূদন এগারোটি নারী চরিত্রের হৃদয়ের কথা বলেছেন। কেবল হৃদয়ের আবেগ নয়, তাঁদের মন-প্রাণের নির্যাস পর্যন্ত কবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। নারীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেকার যে মাধুর্য ও উৎকণ্ঠা তা পৌরাণিক কাহিনিতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সেই চরিত্রগুলিকে মধুসূদন আধুনিক করে তুলেছেন। এই কাব্যের নারী চরিত্রে প্রেম ও প্রয়োজনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের আধুনিক মানসিকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। প্রথাগত ভাবনায় নারী সুন্দর হয়ে ওঠে তাঁর রূপ, গুণ, মমত্ব, ভালোবাসা, কর্মে, বুদ্ধিতে পুরুষের সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ও প্রেরণা সঞ্চারকারী রূপে। তা থেকে নারীর উত্তরণ ঘটল। রেনেসাঁসের আলোকে মধুসূদন নারীর মানসিক শক্তিকে এমন সক্রিয় করে তুলেছেন যা সেকালের চিন্তন ও মননে এক অমূল্য দান। তাই নারীর আদর্শ এবং বলিষ্ঠ রূপের কথা মাথায় এলেই আমরা সর্বাগ্রে মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের স্মরণ করি। কালজয়ী এই কাব্য বাংলা নারী সাহিত্য এবং সমাজকে চিরদিনের জন্য ঋণী এবং আলোড়িত করে রেখেছে। তাই মধুসূদন দত্তের এই কাব্য নারীর আত্ম জিজ্ঞাসার এক জীবন্ত দলিল হিসেবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সাহিত্যের পথে’, সাহিত্যরূপ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৫, পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃষ্ঠা: ১৯৮
২. রায়, সব্যসাচী (সম্পাদিত), মধুসূদন রচনাবলী, কামিনী প্রকাশনালয়, নবম প্রকাশ মাঘ, ১৪২৯, কলকাতা ৭০০০০৯ পৃষ্ঠা: ১৪৯
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪৯
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৪৯ ও ১৫০
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫২
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫২
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৩
৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৫

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৫
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭১
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৭
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা:১৫৭
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫৮
১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা :১৫৯
১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৮
১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৮
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬২
১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১) সব্যসাচী রায়, (সম্পাদিত), মধুসূদন রচনাবলী, কামিনী প্রকাশালয়, নবম প্রকাশ মাঘ, ১৪২৯
২) অলোক রায়, উনিশ শতকের নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯
৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৭
৪) অশোককুমার মিশ্র, মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, সাহিত্য সঙ্গী, চতুর্থ প্রকাশ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮
৫) যোগিন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ দে'জ সংস্করণ ২০১১
৬) স্বপন বসু, বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬
৭) মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৮

উপযোগিতার নীতি: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

রুবাই কুন্ডু *

সারসংক্ষেপ: বর্তমান প্রবন্ধে চিরাচরিত পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব উপযোগবাদ বিষয়ে মূলত আলোচনা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে উপযোগবাদের দুটি শ্রেণীর লক্ষ্য করা যায়– ১) কর্ম উপযোগবাদ এবং ২) নিয়ম উপযোগবাদ। কর্ম উপযোগবাদ অনুসারে কোন কাজ সঠিক তা নির্ধারিত হবে উপযোগিতার নীতি অনুসারে, যেখানে একাধিক বিকল্প কর্ম করার সম্ভাবনা আছে সেখানে আমরা দেখতে চাই কোন কর্মটি জগতে দুঃখের তুলনায় অধিক সুখ উৎপাদন করতে পারবে। অপরদিকে নিয়ম উপযোগবাদ অনুসারে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয় তা নিয়মের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যে নিয়ম সকল মানুষের পক্ষে কল্যাণকর সেই নিয়মই নৈতিক দিক থেকে ভালো। সাধারণভাবে যদি দেখা যায় উপযোগবাদীরা বলেন যে, আমাদের কর্ম যথোচিত বা অনুচিত কিনা তা নির্ভর করে সেই কর্ম কতটা সুখ বা মঙ্গল উৎপাদন করতে সমর্থ তার উপর। উপযোগিতার নীতি অনুসারে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করা আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রবন্ধটিতে উপযোগিতার নীতিটির বিশ্লেষণপূর্বক প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সবশেষে উপযোগিতার নীতিটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উপায় অনুধাবন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

মূলশব্দ: কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যা, ইপিকিউরিয়ানিজম, কর্ম উপযোগবাদ, নিয়ম উপযোগবাদ, বাধ্যবাধকতার তত্ত্ব।

পাশ্চাত্য দর্শনে নৈতিকতা বিষয়ক যে তত্ত্বগুলি আছে তার মধ্যে অন্যতম হল নৈতিক আত্মবাদ, নিকোমাকিয়ান নীতিবিদ্যা, কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যা, উপযোগবাদ প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত

* গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। e-mail: rubaikundu96@gmail.com

আলোচনা 'কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যা' নামে পরিচিত। কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যা হচ্ছে একটি চরম তত্ত্ব। ব্যক্তির পরিপার্শ্বে যা কিছুই ঘটুক না কেন, ব্যক্তি নিজের কর্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করতে পারবেন না। এই তত্ত্বে কোনো ব্যতিক্রম নেই। নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষা কিংবা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার দোহাই দিলেও কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যা হত্যা করার অনুমতি দেবে না।

কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় ২৩০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক ইপিকিউরাসের হাত ধরে প্রবর্তিত হয়েছিল। নীতি নৈতিকতাকে কান্ট যেভাবে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, ইপিকিউরাস করেছিলেন একটু ভিন্নভাবে। তিনি বাঁধাধরা নীতি ঠিক না করে বরং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিজের নীতি ঠিক করার কথা বলেন। যে কাজটি করলে ফলাফল ভালো হবে বলে মনে হয়, তিনি সেই কাজটি করার কথা বলেন। আর এই দর্শনকে বলা হয় ইপিকিউরিয়ানিজম। এই ইপিকিউরিয়ানিজমের সূত্র ধরেই অষ্টাদশ শতকে কান্টের কর্তব্যসাপেক্ষ নীতিবিদ্যার বিপরীত তত্ত্ব দাঁড় করান দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম এবং জন স্টুয়ার্ট মিল। এই তত্ত্বের নাম 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' বা উপযোগবাদ। ইপিকিউরিয়ানিজমের মূল বক্তব্য হচ্ছে মানুষের কাজ এমন হতে হবে যেন তার সমতুল্য সুখ ভোগ করা যায়। কিন্তু উপযোগবাদ সমতুল্য নয়, বরং সর্বোচ্চ সুখের প্রতি গুরুত্ব দেয়। উপযোগবাদ কোনো কাজের পেছনের উদ্দেশ্যের চেয়ে পরবর্তী ফলাফলের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনার মতে, নীতি-দার্শনিকদের মধ্যে যে দার্শনিক নৈতিক আত্মবাদ পরিত্যাগ করেন অথচ কর্তব্যবাদেও আকৃষ্ট নন তাঁর কাছে স্বাভাবিক বিকল্প হল যে তত্ত্ব তার নাম উপযোগবাদ।[১] সার্বিকভাবে উপযোগবাদ-এর দুটি শ্রেণীর লক্ষ্য করা যায়– ১) কর্ম উপযোগবাদ এবং ২) নিয়ম উপযোগবাদ।

কর্ম উপযোগবাদ কর্মের উপযোগিতা বিচার করে তার নৈতিকতাকে জানতে চায়। এই মত অনুসারে কোন কাজ সঠিক বাধ্যতামূলক তা নির্ধারিত হবে উপযোগিতার নীতি অনুসারে, যেখানে একাধিক বিকল্প কর্ম করার সম্ভাবনা আছে সেখানে আমরা দেখতে চাই কোন কর্মটি জগতে দুঃখের তুলনায় অধিক সুখ উৎপাদন করতে পারবে। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ কর্ম উৎপাদন করতে সক্ষম অর্থাৎ কতটা উপযোগী তাই আমাদের বিবেচ্য। এই 'জাতীয়' কর্ম কতটা সুখের উৎপাদন করতে সমর্থ্য এই প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা নয়। 'সত্য কথা বলা সম্ভবত সব সময় সর্বাধিক

মঙ্গল সাধন করে' অথবা 'সত্য কথা বলা সাধারণত সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য'- অতীত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এই ধরনের সামান্যীকরণ কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু কর্ম উপযোগবাদে মূল প্রশ্নটি এইরকম– এই পরিস্থিতিতে সত্য কথা বলা হলে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর সর্বোত্তম সুখ উৎপাদন হবে কিনা। এই বিশেষ পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে সত্য কথা বলায় সর্বাধিক মানুষের মঙ্গল সাধিত হয় না। সেক্ষেত্রে সত্য কথা বলা হয়তো কাম্য হবে না। সুতরাং বলা যায় যে কর্ম উপযোগবাদ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ কর্মের উপযোগিতা বিচার করে।

অপরদিকে নিয়ম উপযোগবাদ নিয়ম কর্তব্যবাদের মতই নৈতিকতায় নিয়মের প্রাধান্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কি করনীয় তা নিয়মের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কর্ম উপযোগবাদ অনুসারে, যে নিয়ম সকল মানুষের পক্ষে কল্যাণকর সেই নিয়মই নৈতিক দিক থেকে ভালো। সুতরাং কোন কর্মটি উপযোগী? –এই প্রশ্নটি এখানে বড় নয়; বরং আমরা জানতে চাই কোন নিয়মটি উপযোগী। নিয়মের নৈতিক মূল্যের সঙ্গে তার পরিণামের কোন সম্পর্ক নেই। 'সর্বদা সত্য কথা বলা উচিত।' –এই নিয়মটি নিয়ম উপযোগবাদ অনুসারে ভালো কারণ তা উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়। যদি সত্য কথা বলার ফলে শুভ ফল উৎপন্ন না হয় তাহলেও এই নিয়মটির নৈতিক মূল্য কমে না। সুতরাং উপযোগিতা বা নৈতিকতা বিচারের ক্ষেত্রে নিয়মই বিচার্য, উপযোগিতার নীতির প্রয়োজন বিশেষ কাজ নির্ধারণের জন্য নয়, বিশেষ নিয়ম নির্ধারণের জন্য।

কর্ম উপযোগবাদ এবং নিয়ম উপযোগবাদ-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে কর্ম উপযোগবাদ প্রতিটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিটি বিশেষ কর্মের উপযোগিতা বিচার করতে বলে। অপরপক্ষে নিয়ম উপযোগবাদ কর্মবিধির উপযোগিতা বিচার করার পক্ষপাতী। সাধারণভাবে যদি দেখা যায় উপযোগবাদীরা বলেন যে আমাদের কর্ম যথোচিত বা অনুচিত কিনা তা নির্ভর করে সেই কর্ম কতটা সুখ বা মঙ্গল উৎপাদন করতে সমর্থ তার উপর। উপযোগিতার নীতি অনুসারে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করা আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এখন উপযোগিতার নীতির বিশ্লেষণপূর্বক এর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব। উপযোগিতার নীতির বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই তযেহেতু প্রত্যেকে নিজের সুখ কামনা করে অতএব প্রত্যেকে অন্যের সুখ কামনা করেদ অর্থাৎ প্রত্যেক

ব্যক্তির কাছে সার্বজনীন সুখ সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান। এক্ষেত্রে সমস্যা হল একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সুখ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারলেও সার্বজনীন সুখ বা সবার জন্য কোনটা ভালো সেটা নির্বাচন করতে সবসময় সফল হবে না।

তাছাড়া সর্বজনীন সুখ বলতে যদি প্রত্যেকের সুখের যোগফল বা সমষ্টি বোঝানো হয় তাহলেও সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে। মিল বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহের সুখকে সমষ্টিবদ্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করলে মনে করতে হবে যে সুখ পরিমাপযোগ্য। আমরা কি সত্যিই একটি কাজের সমস্ত সুখকর পরিমাণকে যোগ করতে পারি?

সুখের পরিমাণ হিসাব করার জন্য একটি কাজের বর্তমান পরিণামকে যেমন জানা প্রয়োজন সেই রকম তার দ্বারা ভবিষ্যতে যে সুখ উৎপন্ন হবে তাকেও জানা প্রয়োজন। তাছাড়া আমার কাজ যে শুধু আমারই সুখ উৎপাদন করে তা নয়; আমার কাজের ফলে অন্য মানুষেরও সুখ উৎপন্ন হতে পারে। এমন একটি কাজের ফলে উৎপন্ন সমস্ত সুখের সমষ্টি জানার জন্য সেই কাজের এই সমস্ত পরিণামকে জানা ও হিসাব করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

এখানে আরও একটি গভীর প্রশ্ন আছে। যে কাজ আমার জন্য ভালো হবে সেই একই কাজ অন্যের কাছে ভালো নাও হতে পারে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝানো গেল— যেহেতু শহরের প্রত্যেকের তার নিজের বাড়ির দরজা খোলার অধিকার আছে সেহেতু এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে শহরের সবাই নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন বাড়ির দরজা খোলার অধিকার আছে। এটা যথাযথ নয়।

যা ব্যক্তির নিজের জন্য ভালো তাকে আত্মসুখ বলা যায়, কিন্তু যা সকলের জন্য ভালো সেটা আত্মসুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এই নীতিটি প্রথমে দেখলেই গণিত সিদ্ধ বলে মনে হবে। কিন্তু এইভাবে আত্মসুখবাদ থেকে পরসুখবাদে যাওয়া যায় না। বহু মানুষের দৈর্ঘ্যকে একত্রিত করে বিশাল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অতি মানবের ধারণা কল্পনা ছাড়া কিছুই না। অর্থাৎ উপযোগিতার নীতিটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটে উঠছে নীতিটি সহজাতভাবেই অস্পষ্ট ও দোষযুক্ত।

উপযোগিতার নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী হলে ব্যবহারিক জীবনেও পদে পদে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপযোগিতার নীতিটির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল—

ধরা যাক, একজন ব্যক্তি ট্রেনের টিকিটের লাইনে প্রথম দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। দ্বিতীয় একজন ব্যক্তি তাকে সরিয়ে দিয়ে সেই লাইনে প্রবেশ করলেন এবং নিজের ও তার পাঁচ বন্ধুর জন্য টিকিট কাটলেন। এই পরিস্থিতিতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির ওই কাজটি কি করা উচিত? উপযোগিতার নীতি অনুযায়ী যেহেতু একজনের পরিবর্তে ছয়জনের টিকিট কাটা হয়েছে অর্থাৎ অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ উৎপন্ন হয়েছে তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির আচরণ যথাযথ। কিন্তু বাস্তবে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তির আচরণ আদৌ সঠিক নয়। অন্য ব্যক্তিকে নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

এবার আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, একজন চিকিৎসক একটি অজানা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য তিনজন ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন এবং তাদেরকে একটি টিকা প্রয়োগ করলেন। পরবর্তীতে ওই তিনজন ব্যক্তিরই মৃত্যুর ফলে ঐ চিকিৎসক বুঝতে পারলেন প্রতিষেধকে কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে চিকিৎসক পুনরায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নতুন প্রতিষেধক তৈরি করলেন যার দরুন বিপুল পরিমাণ মানুষ সেই অজানা রোগের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খাতিরে ওই তিনজন ব্যক্তির প্রাণ নেওয়া চিকিৎসকের কি উচিত ছিল? উপযোগিতার নীতি অনুযায়ী, যেহেতু ওই তিনজন ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে একাধিক মানুষের প্রাণ রক্ষা হয়েছে অর্থাৎ অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ উৎপন্ন হয়েছে, তাই ওই চিকিৎসকের আচরণ যথাযথ। কিন্তু ঐ চিকিৎসকের আচরণ আদৌ সঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নেওয়া কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। উপযোগবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে দুটি দৃশ্যকল্পের অবতারণা করেছিলেন ব্রিটিশ দার্শনিক বার্নার্ড উইলিয়াম—

প্রথম দৃশ্যকল্প

ধরা যাক, জর্জ নামক এক ব্যক্তি যিনি সবেমাত্র রসায়ন শাস্ত্রে পিএইচডি করছেন, যার স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়ায় চাকরির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বহু চাকরি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। জর্জের এই কঠিন পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত এক রসায়ন বিজ্ঞানী একটি রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধ বিষয়ক গবেষণাগারে একটি চাকরি সন্ধান দেন। কিন্তু রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধের বিরোধী জর্জ চাকরিটি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদিও জর্জের প্রত্যাখ্যান গবেষণাগারের কর্মকান্ড থামিয়ে রাখবে না, জর্জের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তি কাজটি করবে এবং যিনি সম্ভবত জর্জের থেকেও বেশি উদ্যোগের সাথে গবেষণা চালিয়ে যাবেন। এখন এই পরিস্থিতিতে জর্জের কী করা উচিত?[২]

উপযোগিতার নীতি অনুযায়ী, যদি জর্জ রাসায়নিক ও জৈবিক গবেষণাগারে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহলে তার পরিবারের জন্য আর্থিক সমৃদ্ধি হবে এবং সে গবেষণাগারের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে– গবেষণাগারের কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরে করে। তাই জর্জের কাজটি গ্রহণ করা উচিত কারণ তা দুটি ক্ষেত্রেই অধিক উপযোগিতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু বার্নার্ড উইলিয়াম উপযোগবাদীদের সমাধানে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে, জর্জের চাকরিতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত তাকে তার অন্তর্নিহিত মূল্য-অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। অন্য কথায়, জর্জ রাসায়নিক ও জৈবিক গবেষণাগারে যুক্ত হলে তাকে ন্যায়পরায়ণতা তথা চারিত্রিক শুদ্ধতা পরিত্যাগ করতে হবে। যা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যকল্প

ধরা যাক, জিম নামক এক ব্যক্তি দক্ষিণ আমেরিকার একটি ছোট্ট শহরে উপস্থিত হন। সেখানে জিম দেখতে পান একজন দলপতি সহ কিছু সশস্ত্র উর্দিধারী মানুষ কুড়িজন ভারতীয়কে দেওয়ালের সাথে বেঁধে রেখেছে। তখন ঐ দলপতি জিমকে জানান দেওয়ালে বাধা ব্যক্তিরা সরকার বিরুদ্ধ কার্যকলাপের জন্য বন্দী এবং তাদের হত্যা করা হবে অন্য বিক্ষোভকারীদের বার্তা প্রদান করার জন্য। জিম যেহেতু বহিরাগত সম্মানীয় অতিথি তাই দলপতি খুশি হয়ে একটি বিকল্পের ঘোষণা করলেন। বিকল্পটি হচ্ছে এমন যে, জিমকে যেকোনো একজন বন্দীকে গুলি করে হত্যা করতে হবে, তাহলে বাকি বন্দীদের দলপতি মুক্ত করে দেবেন। এখন এই পরিস্থিতিতে জিমের কী করা উচিত?[৩]

উপযোগিতার নীতি অনুযায়ী, জিমের চোখ বন্ধ করে একজনকে হত্যা করে ফেলা উচিৎ। কিন্তু বার্নার্ড উইলিয়াম উপযোগবাদীদের সমাধানে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে কোন পরিস্থিতিতেই একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা উচিত কার্য হবে না। এক্ষেত্রে জিমকেও দোষারোপ করা যাবে না যে তিনি সুযোগ পেয়েও বাকি বন্দীদের জীবন রক্ষা করলেন না। বরং বার্নার্ড উইলিয়াম এভাবে ভেবেছেন যে, এখানে জিমের তো কোনো দোষই নেই। যা হচ্ছে সব অত্যাচারী দলপতির খামখেয়ালিপনার জন্য। জিম কেন অযথা একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে যাবে?

উপরোক্ত দৃশ্যকল্পগুলিও উপযোগিতার নীতির মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুর্বলতা তুলে ধরছে। সুতরাং আমরা উপযোগিতার নীতিকে ভালো-মন্দ স্থির করার একমাত্র আদর্শ মনে করতে পারিনা, তা কর্ম উপযোগবাদ, সাধারণ উপযোগবাদ অথবা

নীতি উপযোগবাদ উপযুক্ত হলেও হবে না।

এখন উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনার বাধ্যবাধকতার তত্ত্বের ভিত্তিতে উপযোগ নীতির প্রায়োগিক দুর্বলতার একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হল। ফ্রাঙ্কেনা এথিক্স গ্রন্থে উপযোগিতার নীতিকে নৈতিকতার ক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ বলে মনে করেননি। ফ্রাঙ্কেনা উপযোগবাদের সংজ্ঞা প্রদান কালে বলেছেন– উপযোগিতার নীতি হল সঠিক, ভুল এবং বাধ্যতার একমাত্র চরম মানদণ্ড। আমরা যে কাজই করি না কেন সেই কাজের নৈতিক লক্ষ্য হল সামগ্রিকভাবে জগতে অমঙ্গলের চেয়ে যতবেশি পরিমাণ মঙ্গল সাধন, মঙ্গলের চাইতে যত কম অমঙ্গল হয় তা দেখা। এখানে মঙ্গল বা অমঙ্গল বলতে নীতিবহির্ভূত মঙ্গল এবং অমঙ্গল বোঝায়।[৪] তিনি একথা দাবি করেছেন আমাদের ন্যায়পরতার একটি নীতি মানা উচিত যা জগতে অকল্যাণ অপেক্ষা কল্যাণকে বৃদ্ধি করার নীতি ছাড়াই শুভ অশুভের বন্টন করতে আমাদের সাহায্য করবে। উনি উপযোগিতার নীতি এবং ন্যায়বিচারের নীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কর্ম-কর্তব্যবাদী তত্ত্ব দেন যা কর্তব্যবাদী তত্ত্ব অপেক্ষা উপযোগবাদের অনেক কাছাকাছি। এই তত্ত্বকে মিশ্রিত কর্তব্যবাদী তত্ত্ব বলা যায়। এই তত্ত্বে মনে করা হয় বাধ্যবাধকতার বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি, যেমন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে যা কর্তব্য তা করতে পারি, অন্যদিকে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনটা ভালো বা মন্দ আমরা তা বিচারপূর্বক করতে পারি। এক্ষেত্রে ন্যায়পরতার নীতি উপযোগিতার নীতি থেকে অন্তত কোনও কোনও সময়ে প্রাধান্য পাবে যদিও তা সব সময়ে নাও পেতে পারে। এমন কোন সূত্র দেওয়া সম্ভব নয় যা থেকে বলা যেতে পারে কখন ন্যায়বিচার প্রাধান্য পাবে।

উপযোগিতার নীতির বিশ্লেষণ, উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনার বাধ্যবাধকতার তত্ত্ব ও বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখানো গেল উপযোগিতার নীতিটি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়, সর্বোপরি বাস্তবক্ষেত্রে ন্যায়-বিচারের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে উচ্চ ঝুঁকি ও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখে এই নীতি প্রয়োগ করে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর নয়। সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় উপযোগিতার নীতি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে উপযোগিতার নীতির সাথে ন্যায়পরতার নীতির একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করার মাধ্যমে উপযোগিতার নীতির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

১. K. Frankena, William. Ethics. Prentice-Hall, 1973. pp. 34.
২. Smart, J. J. C. & Williams, Bernard. Utilitarianism, For and Against. Cambridge University Press,1973. pp. 84.
৩. Smart, J. J. C. & Williams– Bernard. Utilitarianism, For and Against. Cambridge University Press, 1973. pp. 84-85.
৪. K. Frankena, William. Ethics. Prentice-Hall, 1973. pp. 35.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভদ্র, মৃণাল কান্তি. নীতিবিদ্যা. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৬.
২. Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principals of Morals and Legislation. Batoche Books– 2000.
৩. Conly, Sarah. "Utilitarianism And Integrity." The Monist 66, no.2, 1983, pp. 298-311.
৮. Dryer, D. P. "Utilitarianism, For and Against." Canadian Journal of Philosophy 4, no. 3, 1975, pp. 549-559.
৫. Forschler, Scott. "Kantian and consequentialist ethics, the gap can be bridged." Metaphilosophy 44, no. 1/2, 2013, pp. 88-104.
৬. Frankena, William K. Ethics. Prentice-Hall, 1973.
৭. Gensler, Harry J. Ethics, A Contemporary Introduction. Routledge, 1998.
৮. Moore, G E. Principia Ethica. Dover Publications, 2004.
৯. Slote, Michael. "Utilitarianism, Moral Dilemmas, and Moral Cost." American Philosophical Quarterly 22, no. 2, 1985, pp. 161-168.
১০. Smart, J. J. C. & Williams, Bernard. Utilitarianism, For and Against. Cambridge University Press, 1973.
১১. Williams, Bernard. Ethics and the Limits of Philosophy. Harvard University Press, 1985.

Gender and Development: Disentangling the Nehruvian Vision

Debdatta Chatterjee *

Abstract: The immediate years following independence and the 1950s decade have been associated with Jawaharlal Nehru and his vision of a modern India, commonly referred to as the Nehruvian era. It was under the leadership of Nehru that the people dreamt of enjoying the fruits of a true democracy. However, one of the important drawbacks of the Nehruvian model concerned the issues of women's empowerment. The subsequent years display that there existed a humongous gap between the portrayed scenario and the actual reality. Though there were provisions like full citizenship rights, non-discrimination in the field of education based on gender, etc., there was a complete neglect of the prevalence of the pressures of the societal norms that restricted the freedom of women. This question deserves a critical re-examination because of the very fact that the Nehruvian era is considered to be a period of progress and development. This paper tends to identify whether the patriarchal notions of the colonial period and the public-private discourse of anti-colonial nationalism got revised in the post-independent democratization process of the above-mentioned period. The very point of instigation to bring up this question emerges from the fact that even in Nehru's dream of modern

* Assistant Professor, Department of History, Syamsundar College, Shyamsundar, Purba Bardhaman, West Bengal.
e-mail: debdattachatterjee@gmail.com

democratic India, women got prioritized, symbolized, and identified based on the pre-existing notions of homemaker, being the good mother and the bearer of good aesthetics in life, and are still scrutinized based on morality and chastity.

Keywords: *Women; Empowerment; Nehru; Nationalism; Development; Modernization; Morality*

Introduction

Theorising Morality

Since the colonial period and even after the ushering of the neoliberal phase, one of the core elements intrinsically related to the issue of gender development and women empowerment is the idea of morality of women. Women's morality and respectability vis-à-vissociety in general and family in particular is a sensitive, though much discussed and debated topics. In the nineteenth century, the question of Indian women, according to the British critic, was not that "what do women want?" but "how can they be modernized?" Influential British writers of the nineteenth and twentieth centuries condemned the contemporary Indian religions, culture, and society and their rules and the customs and ritual sregarding women. They argued that, at any cost, a new gender ideology and modification of the treatment towards women were essential for any positive change. The Indians reconstituted those ideas on morality to fit with their own perceptions.

Moral theory, as produced and developed by theorists like Bentham, Mill, Hume, Kant, et al., later opened a new genre of counterargument by some feminist scholars, which, according to them, has not been uninfluenced by the almost universal masculinity of its creators. They have argued that the masculinity of the authors has affected the very content of the theory itself (Nicholson, 1983). Chodorow has drawn attention to a culturally universal difference between early female and male socialization that the first and primary caretaker for girls, but not for boys, is a member

of the same gender as they. One consequence of this difference is that young boys, to develop their own identity as masculine, must negate their early identification with their mother (Carol, 1982, pp.9-10). As a result, young boys tend to see social relationships as potentially threatening to their sense of self; protection against threats to their senseof autonomy takes on a high value in their lives. Young girls, on the contrary, incline toward defining themselves in terms of their connections to others. Thus, where men tend to fear engulfment by others, women fear abandonment (Nicholson, *op.cit.*). While anthropological research appears to reveal a universal division of labor according to gender, and while this division appears to bear some element of a "domestic/public" division, it is only with the growth of the more nuclearized family and the nation-state in the early modern period that masculinity and femininity take on those specific qualities with which we are now familiar (Carol, *op.cit.*). Thus, it is only with the development of the family in the seventeenth and eighteenth centuries as an emotional unit bonded by feelings of affection among its members that there also begins to develop the ideal of the female as a being more emotional and affective than the male.

Patriarchy in the Colonial Period

As Indian reformers were 'enlightened' through the increasing transfer of knowledge and culture from the West in the broader setting of the nineteenth century, the issue of modernity became synonymous with the status of women in the country. Attributes related to the emotional aspect of human nature, such as sympathy, compassion, kindness, and altruism, have been identified with femininity by Western thinkers and subsequently embraced by the intelligentsia.The general notion of the nineteenth-century developmental phenomenon was that some primary education was necessary for women to increase their domestic value and so opportunities were restricted to that purpose only (Ghosh, 2004, p. 22). The Hindu society, a bastion of conservatism and orthodoxy, was so formidable in its

ability to idealize and implement its views that it became apparent to Bethune when he established his school in 1849. This is evident when he addressed the meeting with the purpose to give girls some vernacular language teaching, including sewing etc., so that the girls could be trained to be 'good mothers, wives and daughters'(Bethune's Speech, 1849). Subsequently, as the new enlightened intelligentsia emerged, the need for literate spouses significantly expanded to facilitate more reciprocal marital relationships.

With the encouragement from their husbands, wives came to understand the importance of domestic hygiene, use of modern furniture, dressing children well, etc. (Ghosh, *op.cit.*P.13). What was the notion of the Brahmos regarding the education of women? This is to be found in the pages of the *'Bamabodhini Patrika'* and even the women voiced in the same way. For example, Gyanadanandini Debi was a modern woman in its true sense. She revolutionized the method of wearing the sari, went to Britain without being escorted by any male member of the family, entertained her husband's British colleagues to a dinner in a professional manner, but interestingly ultimately argued in the same traditional way "that feminine success lay in the ability to be a competent wife and mother" (Karlekar, 1986). A few years later, Priyambada Bagchi, a graduate from Calcutta University, wrote in the '*Antahpur*' in 1892, on the need for women's education to be more feminine in orientation. Radharani Lahiri, who had been associated with the progressive Brahmo attempts to introduce education for the girls, felt, nonetheless, that despite all that women learned, 'housework is the most important'(*ibid.*). Even in 1902 (B.S.1310), the mentality of that group of people remained the same. Amritalal Gupta wrote in the '*phalgun-chaitra'* issue of B.S.1310 of the '*Bamabodhini Patrika'* with the heading "*Sikkhito Mohilar Daitwo"* (Responsibility of an Educated Woman):

> …the reason we consider for the higher education of women is the proper upbringing of their child. … if the women after getting

> higher education surrender the educational responsibilities of their children in the hands of the tutors and spend their own time on reading novels and entertainment or make their children comfortable with the new dresses and various material things then there is no hope for the boys of this country to become perfect men. (Translation mine)

Although another aspect of the Brahmos was progressive and radical in thought, they were not particularly effective in implementing their ideas. They neither subscribed to a restricted form of schooling for women nor perceived any inferiority within the female gender. We find clear evidences of such progressive thoughts in the pages of the monthly journal '*Banga* Mahila'. "*Stree Loker Prakrita Swadhinata*" (the actual freedom of the women) was published in the issue of '*Aashar'* (Bengali month), B.S.1282 (c.1875),

> …There are so many books for the development of Bengali women, so many published articles, so many lectures - but what good has been done? … The English women get an education in a good manner. Becoming educated and knowledgeable, they may realize how much is that painful to live under one's dominance and sympathy. But nothing to do - they are deprived of job value…is there really any need for this kind of education?... We are also suffering from the same condition. So I pray to the intelligentsia for God's sake, please give us real freedom… If you become able to take ultimate care of yourself, that is, however, the real education and freedom. (Translation mine)

Codification of Grihalakshmi

The activities of the late nineteenth-century reformers, however, were considered a threat,leading to the degradation of the Hindu religion. As we know, even today, religion exerts significant influence over various aspects of society. Partha Chatterjee, in his 'Nation and its Fragments',

has made detailed comments on the attitudes of such new nationalist educationists. It was feared that the English education would engender westernized beliefs and behaviours among the Indian women. The mid-nineteenth-century ideas of reform gave way to a strong current of conservatism in which what was indigenous and traditional was sought to be glorified. Images of India as a monstrous mother-goddess and as a woman raped and dishonored by foreign (Muslim and British) conquest were prominent in the militant Hindu nationalism advanced by Aurobindo Ghose and V. Savarkar (Hancock, 2001). The new brand of nationalism with a strong Hindu undertone made a distinction between home and the outer world. They preached for classicized tradition, reformed, reconstructed, fortified against charges of barbarism and irrationality (Ghosh, *op.cit.*). They believed that women must be educated, even if they should get higher education, but they also must respect the superior national culture. They had to provide a quintessentially nationalist claim of being different yet modern. There was a cautious sense of adapting the very Victorian subject of 'domestic science' to the 19th century nationalist programmes of educating women which considered the home a site of and symbol for nationalist modernity, its proponents sought to reform women's education and to reorganize domestic life in ways that both appropriated and critiqued the norms of both Euro-western modernity and emergent nationalisms of colonial India (Hancock, *opcit.*) Elite homes were among the sites where these new interests were expressed, in the forms of artistic and cultural associations, clubs, and schools. Homes were also spaces where nationalist modernities,which appropriated and contested Euro-Western behaviors and material culture, were fashioned and displayed through decoration, clothes, crafts, and handiwork. In elite nationalisms, the privatization of domesticity accompanied efforts to frame homes both as (feminine) 'backstage' of new (masculine) public realms, and as sites for producing new nationalized and classed subjects who espoused modernist values of individualism and scientific rationality(*ibid.*).

An essential argument for providing appropriate education to women was to instill a genuine Lakshmi-like disposition within them. The invocation of Lakshmi within 'new domesticity' does not represent a traditionalist approach to counter modernity. The conceptualisation of Lakshmi through education was a crucial element in a nationalist pursuit of domestic 'happiness'.The concept of womanly beauty and auspiciousness among upper-caste Hindus was constructed and sustained through bodily practices, including the giving, receiving, and wearing of gold jewellery and silk saris. A woman's decision to reject or alter these circuits could lead to conflicts that might jeopardise both family honour and the woman's reputation and autonomy. Producing *grihalakshmis* through the means of formal education became a self-appointed task of a new civilizing nationalism (Chakrabarty, 1993). Not only had the male writers of the period written in this particular line of direction, but the women also. It was the originating point of the historical process through which a modern patriarchal discourse was fashioned by the Hindu Bengali *bhadrolok* under the twin pressures of colonial rule and emerging nationalist sentiments.

The very elitist nature, which was a dominant feature of male-dominated bhadralok nationalism, was also there in the women's organizations, which failed to move beyond a particular section of the population, primarily comprising of the urban middle class and also failed to adopt a radical ideology like the demand of complete autonomy for women. The reason behind the failure was that, these women's organizations matured with male support and flourished in partnership with male dominated nationalist parties (Forbes, 1998, P.91). Because of the presence of the male dominated middle class who acted as the social mediators voicing for the rights of women, the women were left in a tight spot where they had to choose between nationalism and feminism. One strong critique regarding the activities of the middle class was that they only thought of upgrading the poor condition of their womenfolk, but never talked about gender equality. Since earlier times, the very notion regarding their differences of roles,

functions and desires based on the idea of sex was taken for granted, which led to the two sexes being differently reared and treated. Over time, this difference was itself adduced as a major reason for women's conditions (Kumar, 1993). Even to Gandhi, the two sexes were different rather than complementary.

'Lakshmi' in the Nehruvian era

The initial years following independence and the 1950s are inextricably linked to Jawaharlal Nehru and his vision for a modern India. Under his guidance, the populace aspired to attain genuine democracy and a renewed national identity. The current situation, notably the statistics, indicates that the modernisation effort initiated under Jawaharlal Nehru's leadership mostly excluded women, with only minimal representation among them.The 1950s and 60s, characterised by the pervasive domination of nationalism due to newfound political independence, were sometimes referred to as "the silent period" of the women's movement. As it has been argued, despite the strong commitment to equality and social benefits, the communitarian alternative privileged over the civil, political and property rights of conservatives, the socialist societies that existed continued to share the conservatives' endorsement of charismatic leadership to articulate and enforce an ambitious vision of society (Elliot, 2008). Feminism grasped the reality that politically, liberal citizenship was derived from a basic distinction drawn between the private and the public, thereby intrinsically excluding women from public life and leaving them unprotected from abuse within the family (Krishnaraj, 2009). Even today, the documents and statistics about domestic violence reveal to us that the arms of the state (police, judiciary, etc.), on many occasions, dismiss abuse of women as the "private" concern of families. We cannot see politics and its preconditions as resting on a pre-political private sphere because politics and its preconditions are themselves politically constructed. The philosophy of empowerment of the "individual" may sound attractive, but it can-

not pursue its own goals without regard to the claims and needs of others. We need a definition of empowerment that can travel into the worlds of community as well as that of individualism (Elliot,*op.cit.*). The ideal ought to be that the rights one has should be independent of the community and gender to which one belongs. The history of the drive for women's human rights indicates that only when women can become literate, articulate their view of life, when they can organize and demand equality and when they can think of themselves as citizens as well as wives and mothers and when men take more responsibility for care of children and the home, can women be full and equal citizens (Fraser, 2003). India has a long way to go before women's rights are tied to citizenship. Women's role within constitutional equality is ambiguous. In literature and film arguments over women's public participation from pre-independence to the present, domesticity and femininity as their natural roles recur.

The Nehruvian era, which has set the pattern of economic development for the next forty years to follow, provides important clues for understanding the failure of the modernization project in getting rid of gender discrimination within the household and at the workplace. In spite of presiding in the 1930s over a committeeon women's status, Nehru and the Planning Commission under his leadership in post-independent India proceeded to discard the radical economic measures the committee had recommended to establish parity between men and women. Instead, the unproblematic tradition of regarding women as targets for household and motherhood-oriented welfare services was given recognition in official policy documents (Banerjee, 1998). Thus, challenging the patriarchal ethos of society has never been the agenda of the Indian statestrongly. In 1934, in an address at Prayag Mahila Vidyapith, Allahabad, Nehru said,

> If our nation is to rise, how can it do so if half the nation, if our woman-kind, lag and remain ignorant and uneducated? How can our children grow up into self-reliant and efficient citizens of

> India if their mothers are not themselves self-reliant and efficient?....Our civilization, our customs, our laws, have all been made by man, and he has taken good care to keep himself in a superior position and to treat woman as a chattel and a plaything to be exploited for his own advantage and amusement…For all of us, therefore, the first problem that presents itself is how to free India and remove the many burdens of the Indian masses. But the women of India have an additional task and that is to free themselves from the tyranny of man-made customs and laws. They will have to carry on this second struggle by themselves, for man is not likely to help them. Our marriage laws and many of our out-of-date customs, which hold us back and especially crush our womenfolk-will you not combat them and bring them in line with modern conditions? (Gopal, 1993)

In a speech at a girls' college in New Delhi in 1950, Nehru mentioned that women's education was important for making "better homes, better family and better society". He showed his displeasure at the "sloppy" way in which Indians keep their houses and said that women are chiefly responsible for running the home and should know how to do this in an orderly and aesthetic way (Gopal, *op.cit.*). Later in 1958, Nehru wrote,

> "…yet the greatest revolution in a country is the one that affects the status and living conditions of its women. It is insofar as our revolution has affected our women that it is basic. I believe it has done so, not perhaps dramatically and aggressively but rather after the old Indian fashion of combining change with continuity. And yet there have been many dramatic phases of this change even in our time." (Nehru, 1958)

The much-stigmatized ideals of *grihalakshmi*, identity and morality, which are attached to women from the very colonial period, are still in existence in today's society, even when there is so much talk on the idea of

women empowerment.

Today's scenario

The persistent focus on women's morality and modesty, linking it with household honour, imposes significant restrictions on women. It is fundamentally linked to the ancient notion of '*Grihasobha*' or '*Grihalakshmi*', which remains prevalent today.The simple beauty of this exercise is its dignified and polite appearance, but its underlying purpose is to limit women's independence. This activity mostly helps women comply to social norms in their pursuit of power and security in the joint family. These tactics by women to further their interests reinforce gender norms.Without the recipient's consent, the system creates and communicates 'honour' In this concept, the recipient is a passive observer with no power to change the terms or intent of the activity. Interestingly, system maintenance is crucial for donor and recipient preservation. System changes are unwelcome, especially for women, who may lack the abilities to understand them and self-harm. The concept of 'justification' is embedded in the system, which also has the power to maintain its purity. In this regard the very denigration of the identity of women from an independent entity to that of a 'rape victim' itself points towards the sorry state of the times we are living in. It is also indicative of the constant effort on the part of the male-dominated society to create an atmosphere of fear (the corollary to which is the providing of a protective shield) instead of concentrating on the real causes of the problem. The idea of family honour is said to dependent on the propriety of women's actions and is closely connected with women's modesty for which the presence of the threat of getting raped is undeniable. The woman's caste is so vulnerable that any type of unlimited step in any field could destroy the honor (izzat) of her family (ghar). The female victims are blamed, stigmatized, cast out, doubted, re-victimized, and showered with abuse in the wake of their ordeals and interestingly, the practice is so normalized, so culturally ingrained, that we would not

even notice (Chatterjee, 2014).

It is here that the idea of women's unconditional right to access public space becomes very important. The powerful influence of the culture of domination is also evident where we find women getting accustomed to justifying their presence in the public space to such an extent that it seems it has now been internalized in their system. Women's unconditional access to public spaces becomes very important if one wishes to reengage, reconfigure, and redefine the concept of modesty more objectively. There are, of course, no quick fixes in sight, but one of the concerted efforts thatneeds to be made to redefine the idea of morality of women is the spread of more gender-sensitive and humane education.

References

Baig, Tara Ali (ed.) (1958). *Women of India.* New Delhi: Government Press.

Banerjee, Nirmala. (Apr. 25 - May 1,1998). 'Whatever Happened to the Dreams of Modernity? The Nehruvian Era and Woman's Position', *Economic and Political Weekly,* Vol. 33, No. 17 pp. WS2-WS7.

Bethune' Speech on May 7, 1849 (2006). Published in *Bethune, His School and Nineteenth Century Bengal.*Kolkata: Bethune School Praktani Samiti.

Gupta, Amritalal. (Phalgun-Chaitra, B.S.1310, C.1902). 'Sikkhito Mohilar Daitwo'. *Bamabodhini Patrika*.

'Stree Loker Prakrita Swadhinata' (Aashar, B.S.1282, C.1875) *Banga Mahila.*

Chakrabarty, Dipesh. (Autumn, 1993). 'The Difference: Deferral of (A) Colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal', *History Workshop*, No. 36, Colonial and Post-Colonial History,pp. 1-34.

Chatterjee, Debdatta. (March, 2014). 'Rape Victim' as an Identity: Decoding the Complex Matrix', *Communique,* Vol.8, No.1, pp. 11-20.

Elliot, M Carolyne. (2008). *Global Empowerment of Women: Responses to Globalizedand Politicized Religion.*New York: Routledge.

Fraser, S Avonne (2003): "Becoming Human: 'The Originsand Development of Women's Human Rights'".In MarjoriAgosin (Ed.), *Women, Genderand Human Rights: A Global Perspective.* New Delhi/Jaipur: Rawat Publication.

Forbes, Geraldine.(1998). *The New Cambridge History of India IV. 2 Women in Modern India*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghosh, Sunanda. (2004). 'Monomohon Ghosh: The Architect of Bethune College', *In the Footsteps of Chandramukhi*, 125 Years of Bethune College, Bethune College, Kolkata.

Gilligan, Carol. (1982). *In a Different Voice*, Cambridge: Harvard University Press.

Gopal, S. (1993). *Selected Works of Jawaharlal Nehru,*Second Series, Vol.1.New Delhi: Jawaharlal Nehru Memorial Fund.

Hancock, Mary. (October, 2001). 'Home Science and the Nationalization of Domesticity in Colonial India', *Modern Asian Studies*, Vol. 35, No. 4 pp. 871-903.

John, Mary E. (Mar. 7 - 13, 2009). 'Refraining Globalisation: Perspectives from the Women's Movement', *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 10, pp. 46-49.

Karlekar, Malavika. (Apr. 26, 1986). 'Kadambini and Bhadrolok: Early Debates over Women's Education in Bengal', *Economic and Political Weekly*, Vol.21, No.17, pp. WS25-WS31.

Krishnaraj, Maithreyi. (Apr. 25 – May1, 2009). 'Women's Citizenship and the Private-Public Dichotomy', *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 17,pp. 43-45.

Kumar, Radha. (1993). *History of Doing*, *An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India*, *1800-1990.*New Delhi: Zubaan An Associate of Kali for Women,

Nicholson, Linda, J. (Autumn, 1983). 'Women, Morality, and History', *Social Research,* Vol. 50, No. 3, Women and Morality, pp. 514-536.

Precarity of Stigmatising Disability: Representation of AIDS in Mahesh Dattani's *Ek Alag Mausam*

Dipanjan Kundu *

Abstract: The relationship between stigma and disability is a nuanced one. Stigmatisation by a society manifests its fear of being different. This is what Lerita M. Coleman calls the "dilemma of difference". According to some sociologists, like Stephen Ainlay and Faye Crosby, stigma is a tool of social control and, just like justice, is maintained to keep order. The underlying ontological precarity of such fatal impairing conditions like AIDS, leprosy, tuberculosis, myalgic encephalomyelitis etc. involves metaphoric and metonymic significations. The structures of these significations have been constructed in such a way that they unabashedly convey some ethical and moral values, however incongruous or irrelevant they are. Mahesh Dattani has examined the impacts of disabling stigmatisation by a discriminatory social construct on the lives of helpless adults and innocent children living with AIDS. *Ek Alag Mausam*, a screenplay by Dattani, mirrors the affective, cognitive, and behavioural components of stigma, that is, fear, stereotyping, and social control, respectively. The present study would endeavour to register the subtle negotiation between stigma and disability as reflected in Dattani's text.

Keywords: HIV/AIDS, stigmatisation, self-stigma, stereotypification, difference, normalcy, disability.

---

* Assistant Professor, Department of English, Model College, Pakur, Dumka, Jharkhand. e-mail: reach2dk007@gmail.com

Introduction

In addition to addressing global topics, Mahesh Dattani's competence to accurately reflect Indian culture, traditions, and social issues has enriched Indian English theatre. Through his plays, he has infused an Indian flavour into English storytelling, and thereby indigenised Indian English drama. His approach in this venture of indigenisation intimately follows the principles of Raja Rao. The suggestion of Rao offered in his "Preface" to *Kanthapura* reads, "One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own" (v). Just like Sanskrit or Persian, English is a language of intellectual orientation. It cannot channelise our emotions, passions, and feelings the way our mother tongue can do. Therefore, we need mould this "alien language" into a distinct dialect so that it can orchestrate "the tempo of Indian life" (v). Dattani has done the same in his plays.

His plays frequently explore distinctly Indian concerns. In the context of India, he examines issues including family dynamics, gender roles, cultural conflicts, and societal standards. Furthermore, Dattani incorporates dialects and vernacular languages of India in his plays. The conversations become more authentic due to the use of regional languages and phrases, which also relate to India's vast linguistic terrain. Here, again, the problem of multilinguality resurfaces which, as pointed out by Aijaz Ahmad, complicates the unitary category of national literature. Ahmad elaborates that a unified theoretical category like 'Indian Literature' is difficult to be formulated due to the lack of interaction and circulation among the literary works produced in various languages across the country (246). Even the dearth of reliable information about cultural, historical, and linguistic negotiations prevents from weaving a solidified broader category-formation.

Both Rao and Ahmad have conceded that we, Indians, have embraced the English language, not as a foreign one, but as our own. Though,

Ahmad regrets that there is no institutional endeavour to build connections among all the regional languages of India, English language plays a vital role to convey an essentially Indian spirit, mood, and sentiment. In this context, the Indian English playwrights like Girish Karnad, Vijay Tendulkar, and Mahesh Dattani contribute immensely to deliver the searing issues of India to the Anglophone audiences throughout the world. For example, Karnad's *Tale-Danda*, Tendulkar's *Kanyadaan*, and Dattani's *Tara* have brought to the fore the issues of caste discrimination and problems of inter-caste marriages in orthodox Indian society.

The characters created by Dattani depict many facets of Indian society, which enable viewers to negotiate with the narratives more closely. His emphasis on authenticity and intricate character development helps Indian English theatre become more locally rooted. In addition, Dattani often includes cultural allusions, symbols, and rituals into his plays. These components help to set his stories in the context of Indian culture. His writings usually touch on societal topics including homosexuality, gender inequality, and juxtaposition of tradition and modernity. His plays provide a forum for examining these problems and igniting crucial discussions in the Indian setting.

History of Stigma

The voiceless have been recurrently offered the space to voice their woes and agonies by the altruistic belles-lettres of Mahesh Dattani. He advocates the interests and demands of the marginalised, the oppressed, and the subalterns; he speaks up for their fundamental right to live with dignity. Disabilities, stigmatisation, and social rejection, have frequented his plays as thematic narratives with excruciating clarity and neoteric insights. Dattani has dealt with homosexuality as a taboo and stigma in orthodox, old fashioned, intolerant societies such as in India. In *Mango Soufflé*, through the figure of Sharad, he registers his generous protest against this stigmatising attitude. Sharad's sarcastic and witty repartees, more

than evoking guffaws, push the audience to feel uneasy. Again, in *Seven Steps Around the Fire* Dattani has concentrated on the discrimination against the 'transgender' or 'hijra' community based on stigma. They are considered subhuman or nonhuman entities, and no iota of respect is reserved for them. *Ek Alag Mausam*, the screenplay, records the debilitating agency of stigma based on HIV and its nuanced negotiation in the socio-cultural fabric of a developing nation such as the Subcontinent.

A stigma reflects a perspective of a particular culture in a given period. The ancient Greeks associated 'deafness' with mental disability, but they called 'epilepsy' as 'sacred disease' (Becker and Arnold 42). They thought that epilepsy had a supernatural cause. Stigma becomes the master status and shadows sundry personality traits. Goffman informs us that it is "a special kind of relationship between attribute and stereotype" ("Selections from Stigma" 132). He opines that to be stigmatised does not only mean to have certain "discrediting attributes"; it also depends on the "language of relationships". Coleman defines stigma in these terms: "a view of life; a set of personal and social constructs; a set of social relations and social relationships; a form of social reality … a property, a process, a form of social categorisation, and an affective state" ("Selections from Stigma" 141). Stigmatisation is a tool to maintain the status quo and social control. It is neither natural nor automatic. People stigmatise on their own volition. It is related to a prejudice that "the world is a safe, predictable, and orderly place in which people get what they deserve" (Crocker and Lutsky 103).

To implicate an objectionable moral degradation or degeneration, in ancient Greece, people used to leave a mark or stamp upon the accused person's body by cutting or burning a particular spot. They called this mark 'stigma' (Goffman, "Selections from Stigma" 131). So, this term bears a long history and legacy of a social strategy of identification. What happened to be mostly a negative identification turned during the Chris-

tian era into a positive one as stigma was perceived as a mark of divine grace. Monastic orders within Christianity provided us with the first association of stigma with religion (Solomon 63). However, with the gradual development of science, especially in medical sector, bodily imperfections are treated as pathological concerns, although the socio-cultural prejudices regarding stigma and identity have not altered much. There are three types of stigmas: "physical deformities", "blemishes of individual character", and "tribal stigma" like race, class, etc. (Goffman, "Selections from Stigma" 132). Again, Goffman divides the stigmatised into two categories – discredited and discreditable. The shortcoming of the discredited is visible, but that of the discreditable is implicit. To the discredited the mere presence of the 'normals' implies a vulnerability and a breach of privacy. The extent of stigmatisation depends on the nature of undesirability of the difference (Coleman 142). The desirability or undesirability of a difference is determined by those possessing power. Thus, stigma is institutionalised by the vested interests of people in positions of power. There are various ways to inflict stigma, like fear, stereotyping, social control, comparison, etc. Fear is the "primary affective component"; stereotyping is the "primary cognitive component"; and social control is the "primary behavioural component" of stigma (149). Through comparison, the 'normals' discriminate against the 'stigmatised' to make them feel inferior, while the former relish a sense of superiority. Unfortunately, this sadistic proclivity exists within the stigmatised people themselves. It is a matter of momentary solace that there is someone more wretched. This thought is reminiscent of the Latin words uttered by Mephostophilis to Faustus in Christopher Marlowe's magnum opus *Doctor Faustus*: "*Solamen miseris, socios habuisse doloris*" (90). The verbatim translation of the excerpt (provided as footnote in the text itself) follows thus: "It is a solace to the unhappy to have companions in misfortune" (90). There are two ways to make the stigmatised feel inferior – social rejection or isolation and lowered expectations (Coleman 147).

Psychosomatic Consequences of Stigmatisation

Such stigmatising treatments lead to severe psychosomatic consequences. Stranger anxiety is one of them. There is always a sense of growing precarity after coming in contact with a stranger. But, when people live alone, without the formal interactions with others, they are more likely to nurture feelings of jealousy, anxiety, and insecurity. Another adverse ramification of stigmatisation is difficulty in interaction. The stigmatised become nonplussed about their responses to the belittling behaviours of mixed contacts. They oscillate between "defensive cowering" and "hostile bravado" (Goffman, "Selections from Stigma" 137–38). It is puzzling for the 'normals' too, whether to be sympathetic or nonchalant towards the stigmatised. It is also disconcerting and unsettling as well to interact with the discredited accompanied by an exclusive awareness of the existent shortcoming, evasive glances, awkward pauses etc. 'Internalised stigma' or 'self-stigma' is another obtrusive ramification of stigmatisation. A stigma is internalised by oneself when the person, who is regularly discriminated on the basis of any shortcoming, such as HIV, feels that discriminatory behaviours are justified due to her own fault ("Facts about HIV Stigma"). Such people try to escape from their relational world. They isolate themselves socially out of fear of rejection.

Due to the self-stigmatising approach of Aparna in *Ek Alag Mausam*, Paro aptly observes, "You are running away from me now … the way you ran away from George" (Dattani 474). Loneliness, sometimes self-imposed, is a strategic attempt to escape the scorching reality for those who fail to accept their 'failings' or 'weaknesses'. Once they get stigmatised, they do not dare confront the misjudgment of society. Aparna has believed the stigma labelled by Dr Sanyal to be true; hence, she cringes at others. The significance of the touch-me-not shrub lies in the fact that the plant stands as a metaphorical representation of the travails stigmatised people undergo and the consequent propensity of shrinking themselves within,

having an acute fear and shame at the contact of the outer world, almost verging on xenophobia along with agoraphobia. The revelation by Paro that George called her "touch-me-not" renders Aparna self-conscious and exposed regarding her centripetal attitudes (483).

Having inculcated the attitudes towards stigma in the mainstream 'normal' society for a long time, her way of framing the statement – "So you drive a truck" – reverberates a great deal of stereotyping, denigrating attitude towards truck-drivers (497). George's occupation as a truck driver lets Aparna assume the "social information" that he visits the sex workers. Here his truck functions as the "stigma symbol", which draws "attention to a debasing identity discrepancy" (Goffman, *Stigma* 43). It is also called the courtesy stigma by Goffman. Aparna is prone to generalisation, and thereby, stereotypification. This is one of the malignant dimensions of stigma; it brands individuals by stereotypification.

Owing to the kind of cold and bitter experiences Aparna has gone through because of her stigma, she has become defensive and cooped-up. She freezes at the slightest tinge of affection. She does not want to be emotionally involved anymore. She too loves George, but she has rendered HIV the chief marker of identity. However, his parting advice opens Aparna's eyes, and the realisation dawns upon her that she should not feel ashamed or embarrassed for no real guilt of her own: "Don't feel ashamed for being positive. It's not your fault. It's your duty to make the world understand that" (Dattani 545). She would learn to accept herself with all her shortcomings. Following George's advice, Aparna gainsconfidence in herself and openly announces on stage, "And I too am not ashamed to say in public, am infected with the virus" (546).

Moral Dimension of HIV Stigmatisation

HIV is stigmatised because the people concerned are held morally responsible for the disease. Stigma has an intricate, deep-seated affiliation with moral and religious responsibility. Crocker and Lutsky have justifiably

demonstrated, "Thus, stereotypes that the stigmatised are morally inferior lack logical disconfirmability because no amount of moral behaviour can prove that a person who is stereotyped as immoral is actually moral" (118). Besides, those who verge on the liminal spaces are more prone to stigmatisation than others (Solomon 68). People with HIV are living as intermediaries between life and death.

The fear of HIV/AIDS (Human immunodeficiency virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) predates the 1980s. Pepin clarifies, "June 1981 is the official birth date of the AIDS epidemic" (1). During 1980-81, AIDS syndrome was diagnosed in the form of pneumonia among five gay men. All of them were living in Los Angeles. In 1984, it was found that almost half of the patients diagnosed in Europe came from Central Africa, especially Zaire. HIV spread first in Central Africa. It has different subtypes. HIV infections caused by subtype A amount to 79% in Eastern Europe and Central Asia, and "it spread initially through needles rather than gay sex" (13). The source of HIV-1 is a type of chimpanzee (Pan troglodytes troglodytes) (22). Chimpanzees share 98-99% of their genome with humans. According to the phylogenetic tree, the root of HIV is traced back to a report in 1989 of SIV (Simian Immunodeficiency Virus) found in a chimpanzee at Franceville, Gabon (23).

AIDS is divided into three stages – HIV infection, AIDS related complex (ARC), and AIDS (Sontag 154). Approximately 25% of ARC patients develop full-fledged AIDS (157). It is not proven yet if AIDS is fatal. People infected with HIV can live for ten years or more (Pepin 8). Not everybody infected with HIV fulfils the symptoms of AIDS. 'Infected' does not always mean 'ill' (Sontag 155). This idea has also been conveyed in the film *Dallas Buyers Club* (2013). Here the protagonist, Ron Woodroof, is diagnosed with AIDS. The doctor predicts his lifespan as about one month. But he lives up to seven years by the help of some appropriate palliatives. The film also shows that people are regularly discriminated if they are

tested HIV positive. Pepin reminds us of the importance of "collective wisdom" and "humility" to prevent this disease: "Hopefully, we can gain collective wisdom and humility that might help avoid provoking another such disaster in the coming decades" (5).

HIV bears an identity of 'shame', connected with accusations of immoral, depraved, and extravagant lifestyles (Sontag 153). The virus can be transmitted through various means, like blood transfusions, infected needles, and haemophilia. But mostly, the people with HIV are stigmatised assuming that their sexual delinquency and sometimes deviant predisposition (like homosexuality) have brought upon that fatal disease. Solomon pertinently detects, "The current, common prejudice that social freedom spontaneously creates sexual or political perverts carries traces of this historical belief structure" (72).

A stigmatising attitude prevents one from accessing healthcare services, like ARVs (antiretroviral drugs). According to a 2015 report finding in 50 countries, one in every eight people is denied health services due to HIV stigma ("HIV Stigma and Discrimination"). Late diagnosis because of stigma causes premature death. The American Disabilities Act of 1990 values AIDS as a disability in the sense that it collapses the immune system of the subject and renders some of his/her life activities difficult ("HIV and AIDS"). But in Indian jurisdiction, there is not much provision for people with HIV. Yet, in 1997, the Bombay High Court clearly stated that a person with HIV can never be denied her/his right to employment if otherwise s/he remains fit and medically certified as well as eligible for the job. The Hon'ble Court also clarified by citing the medical reports of the concerned doctors that a person diagnosed with HIV can remain asymptomatic for 8 to 10 years, after which the body can develop AIDS (*Mx Of Bombay Indian Inhabitant vs M/S. Zy And Another*).

Stigma is a belief, but discrimination is a behaviour. Aparna, tested HIV positive, confronts stigmatising and discriminatory behaviours right

from medical personnel, Dr Sanyal, whose gender identity has been kept ambiguous probably in order to suggest that s/he represents the insensible society at large. Sanyal's inhumanity manifests in this statement: "… we are refusing to admit you on the grounds that it will upset our nurses and other patients …" (Dattani 479). The fact that, HIV does not spread through tactile communication should be better known to professional doctors and nurses. But a lack of awareness and thriving misconceptions are underlined by Sanyal's outright humiliatory assertion: "No proper nursing home is going to touch you. And either your baby or you will die soon" (480). In the operating room, the doctor and the nurse even denied to touch her: "The nurse throws an extra sheet to her" (484). Aparna's mother reminisces about how her uncle having tuberculosis had become a subject to stigmatisation: "I remember when people thought my uncle had TB, nobody even came to visit us…" (500).

A Sense of Inevitable Mortality – Lack of Awareness

One of the major reasons behind such reactions fraught with pity and fear towards the stigmatising maladies (like AIDS and TB) is that a sense of indelible fatality, much more aggravated by the false notions pervaded in medical and social spheres, paralyses one emotionally and psychologically, even though the body is not yet disabled or impaired. An inevitable sense of immediate and impending mortality squeezes the life-force off Suresh and renders him helpless: "How can I help you? I am dying too" (482). By asking for water and drinking from the bottle of one of the persons with HIV, Dr Machado shows that it does not spread in this way and thereby challenges the conventional prejudices held dear by the medical personnel. By making them utter this statement again and again, Dr Machado turns it into a placebo effect not only for the patients but for all stigmatised people: "So let us all say together – 'I am alive, this moment, this day!' Come on" (486). Their half-hearted participation in chanting this mantra of life underlines their firm conviction that they are going to die

very soon. This notion of immediate and inevitable fatality associated with HIV is a socio-medical construct which has given birth to much despondency and stigmatisation.

Manoj's narration about "another dentist across the street" divulges the deep-rooted prejudices born out of fear of an unfamiliar etiology of an illness (487). Again, his act of 'passing' by keeping his disability a secret from the second dentist reveals the loophole that nothing positive can come out of stigmatisation; rather, such bitter experiences will dissuade people from being honest. People fear a person with HIV so much that even they will not help in the burial of the latter's dead body. The sign-board on the gate of Jeevan Jyoti – "Leave Your Prejudice Outside" – is indeed suggestive (500). HIV does not spread through sharing food or sitting face to face. But, Sukhiya is ignorant and unaware of this and exclaims at George with derision, "Don't come near me!" (512). But it can spread through unprotected sexual union, and therefore, it is always pre-scribed to use protection during intercourse. George ventures to make Sukhiya aware of this, though in vain. This is why George and other members do not reveal much about Jeevan Jyoti in public sphere, because ignorant, regressive, orthodox society would have it shut down. George tries to explain to the uncouth villagers that HIV does not spread through non-visceral means. The real disease behind any epidemic is not the dis-ease itself, but lack of proper knowledge and awareness regarding that; misconceptions and stigma are born out of this ignorance. Dance of death goes on in this darkness: "They will pass on the infection to their wives, their wives will give it to their newborns and soon this whole village will be a graveyard" (537). Instead of protesting against the social injustices and unfair stigmatisation, old-fashioned, unaware masses want to save their faces.

Though stigma is a by-product of prejudice, suffering due to a malady is an unrelenting reality. Suraj's words prove it: "I had a very bad cough.

There was blood, and I thought I will join Mummy and Daddy in Heaven very soon …" (487). The most heart-wrenching aspect of HIV (or any such disease) is that it affects and dries up the lives of young, innocent children who have not even seen half of their sunrises: "Why did you give some flowers such a short season?" (517). Every sort of morbidity in childhood is, according to Schowalter, "seen as an outrage of nature that is especially disturbing because it juxtaposes the boundless energy of childhood with death's stillness, its undiminished optimism with death's despair, and its refreshing naivete with death's corruption" (qtd. in Barbarin 167).

As more stigmatised people get integrated with the general populace, the power of stigma reduces. Gibbons opines, "It also means that the persons interacting are much more likely to recognise and focus upon other characteristics in one another – characteristics such as warmth, understanding, and compassion that form the basis of lasting and intimate relationships" (140). What Dr Machado is trying to instill in the persons with HIV is a sense of solidarity. When they come to know that this pathological state is being shared by a multitude, they will not feel so marooned and marginalised. If they can identify themselves as part of a larger stigmatised group, they will not feel so helpless and fatalistic, as sensed by Suresh and Aparna. Again, Dr Machado motivates them that they should embrace death as a natural part of life. One must accept the aspect of mortality to lead a fearless life. To move them to live in the present and make the most of it, Machado delivers a 'carpe diem' philosophy: "What is important is that we are alive today. We are alive right now!" (Dattani 486).

Mutual Interdependence – A Posthumanist Idea

There is no definitive medicine, but some palliatives to treat HIV. Doctors cannot cure one completely of this disease, except s/he can stimulate and energise the dying patient's longing to live, carry on the urge to fight to the last breath. This battle against the inevitable and unconquerable en-

emy takes on a metaphorical plane when George gifts Suraj a wooden soldier. George's remark reminds us of Dylan Thomas' poem, "Do Not Go Gentle Into That Good Night" – "He will go when he has to go. But he won't go without putting up a fight" (504).

Those who become stigmatised in adulthood suffer from a lack of self-esteem (Martin 152–53). However, in this case, a sense of identity is developed through mentorship as well as cohabitation with others who are similarly stigmatised. Aparna's story of God cursing devas highlights the exigency of mutual respect, care and interdependence. To fight against stigmas, these qualities are urgently required. Mutual care can reduce the detrimental effects of stigmatising diseases. Every being and thing is dependent on each other. Nothing is exclusive, and nobody can live alone, and this is the central idea of posthumanist philosophy, which is echoed in George's proclamation: "If everyone felt that way, the world will come to a standstill" (Dattani 541).

In the posthuman age, humans have to fight against forces that are invisible, bacterial, and climatic. Today's wars are fought against viruses, tiniest microorganisms, pollution, global warming, and intergalactic dynamics. The humans, who antagonise against the members of their own species and try to discriminate and stigmatise on the basis of caste, creed, community, gender, race or any psychosomatic malady or disability, are, needless to say, much outdated, hostile, and malevolent to the progress, co-existence, and interdependence of all the life-forms on this planet at large. Dr Machado delivers the same message in his speech: "The real enemy today is a tiny invisible creature – a virus. The Aids virus knows no barriers of caste, creed, religion, age, gender, race. It is not prejudice, fear or ignorance that will win the battle against Aids. But understanding, precaution and above all love" (556). Ferrando insists on the aspects of "interdependence", "symbiosis", and "affinity" to develop a sense of a posthumanist worldview (70). Even Braidotti also calls the relationship of

mutual interdependence as "posthuman politics" (95). Dr Machado in his speech has also emphasised the idea that people living with HIV or any such sickness must be offered the space in which they can inhabit with dignity and self-respect.

Works Cited:

Ahmad, Aijaz. "'Indian Literature': Notes towards the Definition of a Category." *In Theory: Classes, Nations, Literatures*, Verso, 2000, pp. 243–86.

Ainlay, Stephen C., and Faye Crosby. "Stigma, Justice and the Dilemma of Difference." *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 17–38. *Open World Cat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Barbarin, Oscar A. "Family Experience of Stigma in Childhood Cancer." *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 163–84. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Becker, Gaylene, and Regina Arnold. "Stigma as a Social and Cultural Construct." *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 39–58. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Braidotti, Rosi. *The Posthuman*. Polity Press, 2013.

Coleman, Lerita M. "Stigma: An Enigma Demystified." *The Disability Studies Reader*, edited by Lennard J. Davis, 2nd ed, Routledge, 2006, pp. 141–52.

Crocker, Jennifer, and Neil Lutsky. "Stigma and the Dynamics of Social Cognition." *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of*

Stigma., edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 95–122. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Dattani, Mahesh. "Ek Alag Mausam." *Collected Plays. 2: Screen, Stage and Radio Plays*, Penguin Books, 2005, pp. 469–558.

"Facts about HIV Stigma." *Centers for Disease Control and Prevention*, 1 June 2021, https://www.cdc.gov/hiv/basics/hiv-stigma/index.html.

Ferrando, Francesca. *Philosophical Posthumanism*. Paperback edition, Bloomsbury Academic, 2020.

Gibbons, Frederick X. "Stigma and Interpersonal Relations." *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 123–44. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Goffman, Erving. "Selections from Stigma." *The Disability Studies Reader*, edited by Lennard J. Davis, 2nd ed, Routledge, 2006, pp. 131–40.

—. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall, Inc.,Englewood Cliffs, N.J., 1963.

"HIV and AIDS: Are They a Disability?" *Medical News Today*, 29 July 2021, https://www.medicalnewstoday.com/articles/is-hiv-aids-a-disability.

"HIV Stigma and Discrimination." *Avert*, 20 July 2015, https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/stigma-discrimination.

Marlowe, Christopher. *Doctor Faustus*. Edited by Kitty Datta, Oxford University Press, 1986.

Martin, Larry G. "Stigma: A Social Learning Perspective." *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 145–62. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Mx Of Bombay Indian Inhabitant vs M/S. Zy And Another. AIR 1997 Bom 406, 1997 (3) BomCR 354, (1997) 2 BOMLR 504, 3 Apr. 1997, https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2012/12/HC-1997-MX-v.-MS.-ZY-and-Anr..pdf.

Pepin, Jacques. *The Origins of AIDS*. Cambridge University Press, 2011.

Raja Rao. *Kanthapura*. 2nd ed, Oxford University Press, 1974.

Scott, Robert A., and Dale T. Miller. “Foreword.” *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. ix–xiii. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord. aspx?p=5590230.

Solomon, Howard M. “Stigma and Western Culture: A Historical Approach.” *The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma.*, edited by Stephen C Ainlay et al., Springer, 2013, pp. 59–76. *Open WorldCat*, https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5590230.

Sontag, Susan. “AIDS and Its Metaphors.” *The Disability Studies Reader*, edited by Lennard J. Davis, 2nd ed, Routledge, 2006, pp. 153–60.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Sati in Indian Tradition: Origins, Sanction, Abolition and the Radical Reappraisal by Ambedkar

Kaushik Mandal *

Abstract: Sati has remained a contentious phenomenon especially during the last two centuries. It ignites not merely the feminist deploration, but also a close scrutiny of its caste dimensions. This essay focuses on the caste issue in the genesis and perpetration of this custom. How this purely elite or *Savarna* custom penetrated deep into a pan India socio-religious space is in the purview of this article. Sati custom starting from the Rigvedic references through the Purana's and middle ages till the British rule has been discussed with references. This essay also explores how Ambedkar has meticulously analysed and came to a rational explanation on the genesis and widespread practice of this custom.

Key words: *Sati,* caste, ritual, Brahminism, B. R. Ambedkar.

"A regulation for declaring the practice of suttee, or of burning or burying alive the widows of Hindus, illegal, and punishable by the criminal courts. Passed by the governor-general in council on the 4th December 1829, . . . (Philips 360)

---

* Assistant Professor, Department of English, Joypur Panchanan Roy College, Howrah. e-mail: kaushikmandal.edu@gmail.com

Sati practice in India finally came under a complete ban by an East India Company Regulation signed by Lord William Cavendish Bentinck (1774-1839) In the year 1829. Bentinck served as the Governor-General of India for seven years (1828-1835). With the help of an Executive Council of three British officers, Bentinck formulated the policies to govern their territory which at that point of time was one third of the Indian subcontinent ("Women in World History: PRIMARY SOURCES"). He had to toil much to convince the other two officers on the necessity and appropriateness of promulgating the ban as the debate over banning Sati was a burning issue both in Calcutta and in London. To justify his argument in promulgating the law, Bentinck circulated his Minutes on Sati on 8 November, 1829, a month before the announcement of final Regulation. The minute reflects Bentinck's logical bent and his rejection of traditionalism. To illustrate the problems of banning the customs, he writes:

> *"On the one side, religion, humanity under the most appalling form, as well as vanity and ambition, in short all the most powerful influences over the human heart, are arrayed to bias and mislead the judgment. On the other side, the sanction of countless ages, the example of all the Mussul-man conquerors, the unanimous concurrence in the same policy of our own most able rulers, together with the universal veneration of the people, seem authoritatively to forbid, both to feeling and to reason, any interference on the exercise of their natural prerogative."* (Philips 338)

After a detailed discussion on the inhuman nature of the custom of Sati, Bentinck argues in favour of abolition of the rite on the basis of humanism and rationality. His final observation becomes important in more than one way. Not only did Bentinck understand the fact that the roots of Brahminical cultures penetrate deep into the psyche of generations of people, the only remedy to this barbaric practice, according to him, lies in its complete rejection; *"my opinion is decidedly in favour of an open,*

avowed and general prohibition, resting altogether upon the moral goodness of the act, and our power to enforce it, and so decided is my feeling against any half measure, that were I not convinced of the safety of total abolition, I certainly should have advised the cessation of all interference" (Philips 337).

Sati - Dating Back

Coming to the historical background and causes for the emergence of immolations, Diodorus (*Diodorus of Cicily)* writes, "It is an ancient custom among the Indians that the men who marry and the maidens who are married do not do so as a result of the decision of their parents but by mutual persuasion. Formerly, since the wooing was done by persons who were too young, it often happened that, the choice turning out badly, both would quickly regret their act, and that many wives were first seduced, then through wantonness gave their love to other men, and finally, not being able without disgrace to leave the mates whom they had first selected, would kill their husbands by poison. The country, indeed, furnished no few means for this, since it produced many and varied deadly poisons, some of which when merely spread upon the food or the wine cups cause death But when this evil became fashionable and many were murdered in this way, the Indians, although they punished those guilty of the crime, since they were not able to deter the others from wrongdoing established a law that wives, except such as were pregnant or had children, should be cremated along with their deceased husbands, and that one who was not willing to obey this law should not only be a widow for life but also be entirely debarred from sacrifices and other religious observances as unclean. When these laws had been established, the lawlessness of the women changed into the opposite, for as each one because of the great loss of caste willingly met death, they not only cared for the safety of their husbands as if it were their own, but they even vied with each other as for a very great honour. " (Geer 319)

But this view stands upon no solid evidence. It was a mere conjecture by a distant scholar with no direct connections with the land he is talking about. The writer of *Bibliotheca Historica* narrates the story of the funeral of an Indian general named Ceteus who fought for the Greek ruler Eumenes and died in 316 BC (Bremmer and Bosch 172). Two of his wives fought among themselves for the right to ascend to the pyre and be immolated along with the deceased husband. The younger wife was given permission by the Greeks on the grounds that the elder one was pregnant. With this story Diodorus made the above observations about the genesis of the custom.

Though this view of Diodorus has been summarily rejected by scholars like Sir Gooroodass Banerjee (Banerjee 13) and Laurens P. Bosch (Bremmer and Bosch 171), in *Arthashastra* Kautilya refers to some incidents of regicide committed by the queens and he recommends keeping a vigilance on the Queens for the sake of King's safety (Olivelle 95)(*Arthashastra*, 1.20.14-17). The theory of safeguarding the male from their treacherous wives, as the genesis of the custom can also be traced in some other travelogs by foreigners as well. John Huyghen Van Linschoten, a Dutch traveler who sailed to India in 1583, speaks of the Sati custom performed across castes and informs us that the first reason behind the custom, as he hears from some Indians, is the infidelity of the wives in the past when they would poison their lords in order to fulfill their lusts with their illegitimate lovers (Burnell 211). And a number of kings, noblemen, merchants and soldiers' lives were put to an end frequently. So the king made the rule and it has become a common practice (Burnell 212). Interestingly, the argument that was put forth by the Dharma Sabha Members of Calcutta in their appeal to the Privy Council against the *Regulation* (*XVII)* of 1829 reiterates the same logic which we would discuss in some length later in this chapter. They argued that this regulation would encourage the killing of husbands by the wives.

Edward Thompson negates the idea of the custom of Sati being borrowed from the Middle East as is believed by some of the Orientalists like Sir William Jones and by Vincent A. Smith. They tend to ascribe Sati to "Scythian" influence (Thompson 23). He points out that the view of borrowing the custom from Central Asia roots in James Tod's famous book *Annals* and *Antiquities of Rajasthan,* published in 1829 which, Thompson claims, might have influenced Smith to walk on the same idea in his *Oxford history of India* (Thompson 24).The Hindu rite of Sati is far away from the humongous show of killing and burying the whole bunch of the Scythian dead King's servants along with his guards and their horses along with his other belongings, as is observed by Herodotus (p34). Thompson's further contention is that had the rite been introduced after the Vedic period from outside India, it would have been under brahmanical sanction. Drawing instances and inferences from Abbe Jean-Antoine Dubois book *Hindu Manners, Customs and Ceremonies* (1816) Thompson writes *"but the Brahmans, while presiding at the sacrifice and drawing fees from it and in every way supporting it, kept a memory that it was not a rite to which their own women were liable, and invented a text which, while enjoining it for other castes, forbade it to Brahmanis"* (Thompson 37). Thompson concludes that Sati was a custom used principally by the warrior castes to glorify their clan. The custom was known to the Aryans, but not practiced much until the middle ages. He refers to the Vedic sanction that calls back the widow who after lying beside her deceased husband would come down from the funeral pyre with a piece of gold, a bow or a jewel- the symbol of a Brahman, Kshatriya or Vaisya caste accordingly.(p41) Thompson subscribes to the Aryan invasion theory in India, where the Indo-Germanic tribe bore the rite with them to the Indian subcontinent which intensified with their mixing of the Central Asian clans amid their journey.

Immolating wives with their husbands in Indian context finds its root

in the Rig veda. In the section on the funeral rites the controversial text in the Rig veda ran : *"Arohantu janayo yonim agre" (Let the mothers advance to the altar first).* The last two letters of the last word *"agre"(first)* were allegedly mangled, mistranslated and misapplied (Müller 207) into *"agneh"(fire).* Now the same line reads, "*Arohantu janayo yonim agneh"(Let the mothers go into the womb of fire).* Dr BR Ambedkar supports Max Müller's view on the misappropriation of these two words (*"agre"* and *"agneh")* (Ambedkar 137). Interestingly, the lines do not refer to widows. Wendy Doniger translates the *sloka* as "These women who are not widows, who have good husbands - let them take their places, using butter to anoint their eyes. Without tears, without sickness, well dressed let them first climb into the marriage bed" (Doniger 10.18:7). In another *Samhita* called the *Narayaniya Taittiriya Upanishad*, we find a prayer by a widow to the god of Fire to guide and reward her as she follows *anugamana-vrata,* a form of Sati. *Sahagamana* or *sahamaran* is the rite of immolation of the widow along with the corpus of the dead husband whereas *anugamana* refers to the immolation on a later date[1]. We find Rukmini, along with other four wives of K[ishG a performing *anugamana* after they receive the news of K[ishG a's Death. They enter into the pyres alone and not with K[ishG a's corpus in *Maushala Parva* in the *Mahâbhârata* (Menon 16:7;6770). Altekar opines thatthis *Narayaniya Samhita* is a late work and is not referred elsewhere (Altekar 117). Besides, contrary to this ideology of self immolation we find some funeral rites described in the *Atharva Veda* (Book XVIII, Hymn III)that asks the wife to climb the funeral pyre of her deceased husband and lie beside the dead body[2] (Griffith 236).

These hymns of the *Atharva Veda* contradicts with the custom of Sati which was to be followed by the future generations of the Aryans. In times to come, the participation of a widow in self immolation along with her deceased husband was to be regarded as a proof of their fidelity towards

and love for their husbands. Another interesting point to note here is that the description of the dead clearly depicts a man from a warrior class or at least from a higher strata of society.

"From.his dead hand I take the bow he carried,

together with his power and strength and splendor. (Griffith 235)

It leaves little doubt on the fact that these customs were performed to invoke the good afterlife for the people who were endowed with enough wealth and riches. People from the low classes with meagre means had nothing to do with it except be spectators and sometimes act as mere ornamental sacrifices in the custom.

Perhaps the earliest example of Sati in Indian classical literature can be found in Mahâbhârata (Adi Parva) where queen Madri immolates herself with her husband Pandu (Menon 381). Initially Kunti argues with Madri over her right to immolate herself with Pandu by virtue of being the elder wife. Besides, she argues that Madri's sons are younger than hers. But eventually, Madri wins over the argument by citing the reason that she caused the death of the king Pandu by allowing him to copulate with her disregarding the curse on him. Kunti finally accepts Madri's final wish to let her be a Sati, and promises her to take care of Nakula and Sahadeba, in future, as her own children. Madri's arguments in participating in Sati, interestingly, do not contain any religious flavors. After the battle of Kurukshetra, the funeral ceremony of the dead heroes was described without any reference to a window participating in the Sati custom anywhere (Altekar 121). Incidents of Sati that were described in the Mahabharata were performed by the warrior castes of people. Râmâyana do not refer to any Sati rite performed by its characters. Only one reference is made in the Uttarakanda which was a later interpolation beyond any doubt (Altekar 121). The incident of Vedavats mother becoming a sati is narrated in the Uttarakanda. It becomes clear that the custom slowly became obsolete even among the warrior castes in India. Aryans might have remembered

the custom of their ancestors But didn't follow it in practice. To reason the possible discontinuation of the rite, AS Altekar opines that the Aryan's decreasing population might have made them rethink about this custom in order to continue their political dominance. *"Instead of allowing widows to be burnt, they thought that it would be better to encourage them to live and increase the population"* (Altekar 118). We get references of Sati loosely around the fourth century BC. There is no reference to the custom in the writings of Kautilya and Megasthenes. It can well be argued that had the custom been prevalent during Buddha's time, the great sage would surely have spoken against it. We find no reference to sati in Buddhist literature as well. Neither the *Dharmasûtras (c.400 BCE to c. 100 CE)* nor the *samhitâs* by Manu and Yâjñavalkya (c. 100 CE to c. 300 CE) talks about the custom while sanctioning numerous rules and regulations for women and widows. Ambedkar argues that from the time of *Vishnu Smriti* (c. 3rd century CE to 4th century CE) the doctrine contrary to *Manu* or *Yâjñavalkya Smriti* has been popularized (Ambedkar Vo. 3, 294). We find similar observations in V. Smith and Bosch. Bosch supports the view of Smith that this blended custom from Scythian, Iranian and Vedic traditions became notable among the warrior castes (Kshatriyas) of India principally of North-western provinces during the fifth century AD. Bosch also contends that during the second half of the first millennium Sati came in vogue among the Kshatriyas as a counterpart to the heroic death of a husband in the battlefield by her equally 'heroic' wife or wives (Bremmer and Bosch 174). The widows usually carried an object used by her dead husband such as a turban, slipper or his wedding dress along with her to the funeral pyre (Bremmer and Bosch 179). Bosch refers to some interesting observations from a book on Hindu customs by A. Rogerius, a Dutch clergyman who stayed in South India in the first half of the 17th century (Bremmer and Bosch 179). Rogerius speaks about the differences among caste groups in performing widow immolation. He informs that the *Brahmins* and *Vaisyas*, the third in the caste hierarchy, followed the same pat-

tern of burning the widows along with the corpses of their husbands but the *Kshatriyas* and *sudras* would burn them at a later time on a different pile (Bremmer and Bosch 179). This memoir testifies to the fact that *Brahmins* tried to conserve or at least put some restrictions on the practice among their own clan. Rogerius describes the performance of the ritual by the widows of the *Brahmins.* She holds a jar of oil above her head and jumps into a pit where deep down a pyre has already been lit with the dead body of her husband. He also informs that according to his Brahminical informant, the custom was completely voluntary on the part of the widow though among *Kshatriyas* and *sudras* the use of intoxicating drugs was not rare (Bremmer and Bosch 180). This voluntary nature of the custom might have been in force until the Middle Ages. The widows who refused to participate in the custom had to adopt an ascetic life with stringent rules. A widow had to be immediately shaved off hair from her head and to remain so for the rest of her life. He would not be allowed to wear any jewels and from that moment onwards she would be despised and "accounted for a dishonest woman" (Burnell 211). Sati, as per the accounts, was popular not only among the *Brahmins* but was also practiced by the kings, noblemen and the merchant class (Burnell 212).

It also becomes evident from these narratives that traditionally, Sati was a custom of the higher castes in India. Initially practiced by the warrior caste, the custom was slowly adopted by the other *savarna* castes and the performance of the custom by the *shudras* or the outcasts was not very common. We find another observation from the account of George Forster who was serving the East India Company and visited India during the first decade of the 19th century. He describes that among the Maratha women the disinclination to the Sati rite was prominent. He also comments that this was primarily due to lesser influence of brahminism in this province (Forster 64). But, how this custom of the *Kshatriyas* infiltrated among the Brahmins is a matter of debate. Initially the custom was vigorously

debated among the *Brahmins* (Thompson 37). The *Vishnusmriti* leaves the custom completely on the choice of the widow (Altekar 123). The approval of the custom by the society was somehow defended by the help of some *Smritis* while from the general rules laid in the Vedas, Sati essentially is to be considered as a form of suicide (Ambedkar 77). This dilemma resulted in putting some constraints over the custom in the following centuries, as it was only to be performed on the same funeral pyre of the deceased *Brahmin* husband. That is to say, no widow was allowed to be burnt on a later date. Thus *anumarana* was prohibited among the *Brahmins* which was later recognized by the British rulers with help of the Court Pundits of the Supreme Court and directives were sent to the local officers to take penal action on such occurrences in the Regulation regarding Sati in 1817 (Thompson 66). In some *Brahmin* communities ascetic widowhood was considered as more pious equating Sati with suicide (Altekar 128). But how the injunction from the *Smritis* came to supersede the *Sruti* holds another important aspect of the Sati discourse.

Ambedkar has written extensively on this point. In *Riddles in Hinduism* (chapter 7), Ambedkar argues that Brahmanism was cunning enough to use any scripture if it serves their purpose. In this case the purpose was to preserve the caste hierarchy. He stands singular in his argument. His position on the genesis of widow immolation in India is somewhat contrary to that of P.V. Kane and Altekar who argue that widow immolation has been a common phenomenon around the globe since ancient times and has been borrowed by the Aryans from Scythian-Iranian traditions (Ambedkar vol 3, 295). He aligned with Kane to the extent of Kane's interpretation with the existence of Sanskrit words *punarbhu* (woman who has undergone a second marriage ceremony) and *punarbhav* (second husband) establishing the fact that such marriages were quite common under the pre-Buddhist Brahminism (Ambedkar vol 3, 295) (See Kane—*History of Dharmashastra*, Vol. II, Part II). According to Ambedkar, after

the revival of Brahminism by Pushyamitra Sunga,[3] three customs regarding Hindu women were introduced and reinforced;

1. The custom of Sati;
2. The custom of ascetic widowhood;
3. Girl marriage before the age of puberty;

Ambedkar strongly argues that these three customs are intrinsically connected as they all serve one purpose of creating and stabilizing caste boundaries. *"According to my view,"* Ambedkar writes, *"girl marriage, enforced widowhood and Sati had no other purpose than that of supporting the Caste System which Brahmanism was seeking to establish by prohibiting intermarriage. It is difficult to stop intermarriage. Members of different castes are likely to go out of their Caste either for love or for necessity. It is to provide against necessity that Brahmanism made these rules. This is my explanation of these new rules, made by Brahmanism. That explanation may not be acceptable to all. But there can be no doubt that Brahmanism was taking all means possible to prevent intermarriages between the different classes taking place"* (Ambedkar vol 3, 301). Ambedkar identifies endogamous marriages as a key to preserving caste. Exogamous marriage creates fusion so it is contrary to the idea of preserving the sanctity of caste groups. He explains, *"the superposition of endogamy on exogamy means the creation of caste."*(Ambedkar vol 1, 11). But endogamous marriage has its own problem. Ambedkar introduces the problem of *surplus men* and *surplus women* in an enclosed caste group who are of marriageable age. Both categories can be created by the death of their individual partners. Being the more dominant and valuable unit of a society, men could be allowed to remarry, if they wish to, and increase the numbers of the caste members, whereas the widows must be disposed off as they are considered as more vulnerable to 'pollution' and defilement that might break the caste boundaries. Thus a widow needs either to be immolated or to be kept under stringent asceticism in such a

way that she must not retain any feature to attract. Ambedkar further argues that as the number of marriageable men and women in a given society are equal by the law of nature, a widower must get married with a girl who has not yet reached the marriageable age as the only available solution. So, the custom of girl marriage was introduced (Ambedkar vol 1, 14). He further points out that the presence of literature, especially *Smritis*, eulogizing these inhuman customs became necessary only to perpetuate and popularize the customs among the masses. Ambedkar's arguments to establish the custom of Sati as an outcome of Brahminism in India holds no loose ground. He also refers to the prevalence of Sati cases in Bengal and somewhat agrees with P V Kane's opinion that the Hindu law of inheritance played a crucial role in this prevalence (Ambedkar vol 3, 295).

Works Cited:

Altekar, Anant Sadashiv. *The Position of Women in Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day*. 2nd ed., vol. rept., Delhi, Motilal Banarsidass, 1959.

Ambedkar, Bhimrao Ramji. *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*. re-print ed., vol. 4, New Delhi, Dr. Ambedkar Foundation, 2014. 17 vols.

Ambedkar, Bhimrao Ramji. *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*. vol. 7, New Delhi, Dr. Ambedkar Foundation, 2014. 17 vols.

Ambedkar, Bhimrao Ramji. *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*. reprint ed., vol. 9, New Delhi, Dr. Ambedkar Foundation, 2014. 17 vols.

Ambedkar, Bhimrao Ramji. *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*. vol. 3, Dr. Ambedkar Foundation, 2014. 17 vols.

Banerjee, Gooroodass. *The Hindu Law of Marriage and Stridhan*. Delhi, Mittal, 1984.

Bremmer, Jan, and Lourens P von den Bosch, editors. *The Ultimate Jour-*

ney: Sati and Widowhood in India," in Between Poverty and the Pyre: Moments in the History of Widowhood. London, Routledge, 2002.

Burnell, Arthur Coke, editor. *The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies: From the Old English Translation of 1598. the First Book, Containing His*

Doniger, Wendy. *The Rig Veda: An Anthology*. London, Penguin Books, 1981.

Forster, George. *A Journey from Bengal to England*. vol. 1, London, R. Faulder and Son, 1808. 2 vols. *Archive.org*, https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.107928/page/n5/mode/2up.

Geer, Russel M., translator. *Diodorus Of Sicily With an English Translation*. vol. 9, London, William Heinemann, 1947.

Griffith, Ralph Thomas Hotchkin, translator. *The Hymns of the Atharvaveda*. 2nd ed., vol. 2, Benaras, E. J. Lazarus, 1917.

Kane, P. V. *History of Dharmasastra (Ancient and mediaeval Religious and Civil Law), v.2.1, 1st edition, 1941*. vol. 2, Poona, Bhandarkar Orienta Research Institute, 1941. 5 vols. *History Of Dharmasastra ancient And Mediaeval Religious And CivilLawV.2.1*, https://archive.org/details/History Of Dharmasastra ancient And Mediaeval Religious And CivilLawV.2.1/page/n5/mode/2up. Accessed 06 08 2024.

Menon, Ramesh, editor. *The Complete Mahabharata*. vol. 1-12, New Delhi, Rupa, 2009.

Müller, Friedrich Max. *The Essential Max Müller: On Language, Mythology, and Religion*. Edited by Jon R. Stone, Palgrave Macmillan, 2002.

Olivelle, Patrick, translator. *King, Governance and Law in Ancient India: Kautilya's Arthasastra*. New Delhi, Oxford University Press, 2013.

Philips, C. H., editor. *The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck, Governor-General of India 1828-1835*. vol. 1. (1828-1831), Oxford, Oxford University Press; School for Oriental and African Studies, 1977.

Thompson, Edward. *Sutee: A Historical and Philosophical Enquiry into the Hindu Rite of Widow-Burning*. London, George Allen & Unwin Ltd., 1928.

"Women in World History: PRIMARY SOURCES." *Women in World History: PRIMARY SOURCES*, https://chnm.gmu.edu/wwh/p/103.html. Accessed 14 April 2024.

Footnotes:

1. Rammohun Roy translates *anumaran* as 'postcremation' in English. See Robertson, Bruce Carlisle, editor. *The Essential Writings of Raja Rammohan Ray*. New Delhi, Oxford University Press, 1999. 113 (Robertson #)
2. This custom, perhaps, was introduced to imitate and represent their conjugality.
3. Pushyamitra ruled the Maurya kingdom from 185 BCE. to 149 BCE.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Plague as punishment: Narrating illness and disease in *Iliad* and *Sitala Mangal-kavya*

Arpita Ghosh *

Abstract: This paper intends to trace the narration of disease and illness in Book I of Homer's *Iliad* and examine how the imagination of plague probes the discourses of medicine, fear, and imagination. A comparative thread tracing a similar trajectory of illness and disease as more-than-human will also be proposed through a cultural reading of the *Sitala mangalkavya* in Bengal literature. The tedious, overburdened relationship with health, where the balance can easily be tipped, placing one in the 'kingdom of the sick' (Susan Sontag) has found resonance with writers throughout history. In the *Iliad*, the Homeric narrator describes the plague brought down on Agamemnon's army as punishment for disrespecting the gods. The Greek mind, which saw the gods as being human-like though infinitely more powerful and cruel, saw disease as one of the worst punishments to be meted out to humankind, taking away vitality and fertility – the prize of human civilisation. Disease could bring to a grinding halt the march of human progress quite literally; it could also, therefore, easily be a metaphor for cultural stagnation, or spiritual and moral degeneration, or social stigmatisation. Both the metaphysical and physical aspects of health and vitality will be brought to bear upon the modes of narrating disease in the aforementioned texts.

Keywords: disease, myth, illness, epidemic, pre-modern lifeworlds.

* Assistant professor, Department of English, Ramananda Centenary College, Purulia, West Bengal, India. e-mail: arpita89ghosh@gmail.com

At the beginning of her foundational text, *Illness as Metaphor*, Susan Sontag writes, “Illness is the night-side of life, a more onerous citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship, in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport, sooner or later, each of us is obliged, at least for a spell, to identify as citizens of that other place”. The tedious, overburdened relationship with health where the balance can easily be tipped, placing one in the ‘kingdom of the sick’ has found resonance with writers throughout history. In *Iliad*, the Homeric narrator describes the plague brought down on Agamemnon’s army as punishment for disrespecting the gods. The Greek mind which saw the gods as being human-like though infinitely more powerful and crueler saw disease as one of the worst punishments to be meted out to humankind, taking away vitality and fertility, the prize of civilization. Disease could bring to a grinding halt the march of human progress quite literally; it could also therefore easily be a metaphor for cultural stagnation, or spiritual and moral degeneration, or social stigmatization. This paper then intends to trail the narration of disease and illness in Book I of Homer’s *Iliad* and examine how the imagination of the plague probesthethe discourses of medicine, fear, and imagination. A comparative thread tracing a similar trajectory of illness and disease as more-than-human will be forwarded through a cultural reading of the Sitala mangalkavya in Bengal literature.

Traditional readings of the Plague episode in Iliad often draw on its symbolic significance and its charge as a pivotal plot device in the first Book which is called ‘The wrath of Achilles’. This wrath is also the central theme of the epic. As a plot device the Homeric narrator establishes the plague as intertwined with the rage of the hero Achilles as he derives the strength of his dissatisfaction and defiance against Agamemnon in part from the effects of the disease on the Achaean army. It is also seen as divine retribution for Agamemnon’s derisive treatment of Chryses, a priest

of Apollo. Scott (2012) has argued that the plague, unleashed by the god Apollo in response to Agamemnon's disrespectful treatment of his priest Chryses, manifests not merely as a physical ailment but as a divine manifestation of cosmic imbalance and the consequences of human hubris. Thus, in the Greek worldview, disease must be seen in conjunction with the physical reality of illness and disease along with realization of human frailty and fragility in a pagan universe. In effect, the plague's impact extends beyond the immediate suffering of the Achaean warriors, permeating the social, political, and spiritual fabric of their community, thereby exposing the intricate relationship between mortals and gods in the Homeric world.

The Greek army holds physicians in great regard as healers who shallact to repair the men wounded in the course of battle. In *Iliad*, among the Greek heroes who fought in the Trojan war were Podalirius and Machaon, the physician sons of Asclepius and Epione, who not only gave medical assistance but also took their places in the battle line. When Machaon is wounded by Paris' arrow in his right shoulder, Idomeneus orders Nestor to remove him to safety in his chariot, reasoning that

> a doctor is worth many men put together,
> at extracting arrows and applying soothing ointments.
>
> (Iliad, Book XI, *l* 514-15)

Although this phrase gained an axiomatic status among the Greeks, it rested on omission of its qualifying second line whereby the physician is useful only in so far as his skills allow him to extract and heal the wounded from injuries begotten in the battlefield. What however of the illnesses and diseases that befall the soldier? This is where the doctor, otherwise equalled to "the diviner, the poet and the spear-maker" (*Iliad*, Book XI, 514-15), fails spectacularly. The plague that ravages the Achaean army is narrativized by the Homeric speaker to have been caused by the divine intervention of Apollo, whose anger at the insult done to his priest had

caused him to shoot his deadly arrows at the Greeks, 'so that the funeral pyres burnt incessantly.'(*Iliad*, Book I, *l* 52) For divine anger with perhaps righteous cause, there must be a divine solution. After the nurture of the human physician has failed, the men must seekremedyin the figure of a priest, diviner, augur, or other religious officials, and restore health to the nation by the therapy of penance. In such a causal chain there is no place for a doctor working solely with non-religious means. I would argue further that in between the figure of the physician and that of the priest lies the foundation for Greek philosophical and moral thought; the limits of human knowledge and endeavour and the underlying tensions that are at play in such a conflict driven universe.

In conjunctionwith the description of physical warfare and attack in the epic, the plague is also described in terms of stealth and strategy. Apollo is described as launching arrows of disease against the Greeks in the night, causing the Greek soldiers and animals to fall sick and die. The image of the god descending (the Greeks imagined their gods in anthropomorphic forms) aligns with Apollo's representation as a god who can bring both healing and destruction through his arrows. The consequences of this plague are profound, leading to significant losses and unrest among the Greek ranks. Where medicine (and doctors) fail, the divine steps in.The plague must be seen in more-than-human terms, inhabiting that space between the healer and the priest. Achilles (supported by other warriors) makes his claim that this is divine punishment from the gods and this furthers compels Agamemnon to eventually relent and return Chryseis to her father, albeit with damaging repercussions for his relationship with Achilles.

An emergent framework for the limits of the human healer vis a vis the divine works to encapsulate the complex and multifaceted nature of the Greek gods, reflecting the ancient Greek worldview that was inclusive of contradictory forces. Apollo, known as a god of many aspects such as

music, prophecy, healing, and plague, embodies the belief that divinity could bring both benevolence and wrath, nurturing life but also bringing destruction.The ancient Greeks understood their gods as powerful beings that controlled various aspects of the natural and human world, often exhibiting both positive and destructive traits. Apollo, in particular, was revered for his healing abilities, as seen in his associations with medicinal knowledge and the arts of healing. Temples dedicated to him, such as those in Delphi and Delos, were centres for healing where people would come to seek cures for their ailments (Jong, 2012). However, Apollo was also feared for his power to send illnesses and death, often depicted in myths where he unleashes plagues as a form of divine punishment or as an expression of his anger.

Whereas this duality is a reflection of the Greek understanding of purity and pollution—concepts that were not only related to physical cleanliness but also spiritual and moral states (Robertson, 2013). To the Greeks, purity was necessary for approaching the divine, yet the gods themselves could embody both purity and pollution, reinforcing their complex and potent nature.Apollo's actions as a destroyer balance his role as a healer, maintaining order in the cosmos by correcting imbalances through both favor and punishment.

This dual aspect of healing and destruction mirrors the archetype of the "wounded healer," which suggests that experiencing personal trauma or illness can equip one with the empathy and understanding necessary to heal others. This notion was evident in the Greek ethos, where Apollo's own wounds and challenges, illustrated through mythic stories, endowed him with the capacity to heal (Kirmayer, 2003).Through Apollo's contrasting roles, the Greeks articulated an understanding of the gods as multidimensional forces that dictate the cyclical nature of life and death, health and disease. Apollo's duality as both a healer and a destroyer thus encapsulates the unpredictability of the gods, representing the balance required

to sustain the world according to Greek mythic and religious narratives (Johnston, 2015; Jong, 2012).

In this respect, one could draw examples from another pre-colonial and pre-modern universe which also accommodates a complex and nuanced understanding of illness and disease. In eighteenth century India, and particularly Bengal, we notice the cult of a similar deity whose worship rests on appeasement and penance, the Goddess Sitala. Apollo and Sitala Devi serve as intriguing figures representing the dual nature of deities in different cultural contexts—both as harbingers and healers of disease. In Greek mythology, Apollo is a complex deity with dual aspects related to health and disease. In the *Iliad*, his wrath is linked directly to a plague that afflicts the Greek army, highlighting his role as a sender of disease when angered. Despite this, Apollo is revered for his healing abilities, and the ancient Greeks often sought his intervention to cure diseases through ritualistic practices and offerings (Nutton, 1992). Similarly, Sitala Devi is a prominent goddess in Hindu tradition, especially revered in northern and eastern India as the goddess of smallpox. She represents both the embodiment of the disease and its healer. Her rise to prominence is closely linked to historical outbreaks of smallpox, particularly in Bengal. Sitala Devi's worship became widespread as an adjunct to biological treatment methods during epidemics, symbolizing a cultural response to epidemic calamities. Her role as a tutelary deity allowed communities to engage in collective rituals aimed at both appeasing and seeking protection from the disease (Nicholas, 1981).

Both Apollo and Sitala Devi demonstrate the intricate interplay between divine wrath and benevolence, reflecting broader human attempts to navigate disease through spirituality. While Apollo's dual aspects are depicted within a framework of divine retribution and healing, Sitala Devi's evolution points to a socio-cultural adaptation to epidemic distress. These figures underscore the universal human need to understand and manage

illness through mythological frameworks across civilizations (Nicholas, 1981).

Cultural perceptions of disease significantly influence the worship practices of deities associated with health and healing, such as Apollo in Greek mythology and Sitala Devi in Hindu beliefs. These perceptions are deeply rooted in the cultural and religious contexts from which these deities emerge, reflecting societal attitudes towards health, illness, and divine intervention.

In the case of Apollo, the ancient Greeks viewed him as the god of healing and disease, integrating the dual aspects of health—both its enhancement and its afflictions. Apollo's worship was likely shaped by the Greeks' understanding of medicine and disease, impacting the rituals and offerings made to seek his favor or appease his wrath. Greek culture was largely based on orthopraxy, meaning that the correctness of practice was emphasized over beliefs. Therefore, worship focused on performing the correct rituals to maintain health and prevent disease. The cultural perception of disease in this context sees illness not only as a physical ailment but also as a consequence of moral or spiritual imbalance. Similarly, worship practices of Sitala Devi often involve rites aimed at pacifying her to prevent or cure illness, reflecting the belief that divine intervention is necessary to maintain or restore health. This perception is indicative of an understanding where health is tied intimately to spiritual and moral well-being, a common theme in many Hindu practices (Rountree, 2002).

Both deities exemplify the culturally embedded notion that illness is not merely a physiological condition but an intersecting point of religious, moral, and community obligations. Worship practices are thus not solely for individual health but also contribute to collective well-being, reflecting an understanding of community interdependence, where individual and societal actions can appease or provoke divine forces governing health. This demonstrates how cultural values and beliefs weave into religious

practices, influencing how people engage with divine entities to manage disease. In Bengali literature, Sitala is prominently associated with disease, particularly smallpox,an endemic presence of smallpox in the region. Her worship is deeply intertwined with the historical context of the disease, which gained significance not only in medical terms but also culturally and religiously. This association came about because smallpox transitioned from being perceived as an ordinary disease to an epidemic calamity, especially during periods of distress in rural Bengal, marking Sitala as a suitable deity for community worship (Nicholas, 1981).The deity's role is not seen as a substitute for naturalistic approaches to smallpox treatment but rather as complementary. The integration of Sitala into the disease's etiology allowed for a dual approach—combining biological treatment methods with religious and cultural practices. This dual approach emphasizes the multifaceted role of Sitala in both protection against and explanation for diseases like smallpox in Bengali culture (Nicholas, 1981).

A comparison of the narrative modes in Homer and the Bengali *mangalkavya*also shows a similar evocation of mythical themes in consonance with wider socio-cultural nuances. The narrative mode in *Mangalkavya*, a significant genre in Bengali literature in the fourteenth century, is primarily characterized by its didactic, mythological, and religious themes. *Mangalkavya* poetry is typically structured around the glorification ("Mangal" meaning auspicious) of a specific deity, often functioning as a religious tale or a form of devotional literature. In these epics, much like its Greek counterpart, a systematic narrative technique is employed, blending poetry with storytelling to foster religious reverence among its audience. The narratives are often characterized by their use of descriptive language and allegorical elements, imbibed with moral and ethical teachings meant to guide the listener or reader towards piety and righteousness.One key influence of the genre lies in its reinforcement of

local deity worship. These narratives celebrate deities like Manasa, the snake goddess, and Chandi, both central figures in Bengali folk religion. The stories of these deities, as depicted in these poems, are often enacted in religious festivals and rituals, reflecting their continued importance in spiritual life. For instance, the *Manasa Mangalkavya* elevatesGoddess Manasa's stature, embedding her worship into annual rites aimed at invoking her blessings for protection against snakebites and ensuring prosperity.

The portrayal of illness and disease in these premodern texts point to a complex belief system where ideas of human and what constitutes bodily limits is traced and questioned. The later onslaught of colonialism in the context of Bengal and India where anoften-straightforward (and narrow) narrative of superstition, primitiveness (ascribed to deity worship and rituals)is posited against the superior rational Western mode of medicine emerges and which in turn, must be challenged. Literary texts such *Iliad* and *Mangalkavya* function in these ideological realms and help us navigate the complex belief systems of disease and healing in the premodern and precolonial life-worlds.

References:

De Jong, Irene JF. *Space in Ancient Greek Literature: Studies in Ancient Greek Narrative, Volume Three*. Brill, 2012.

Homer, Richmond Lattimore, and Anthony Quayle. *The Iliad*. University of Chicago Press, 1962.

Johnston, Sarah Iles. "The Greek mythic story world." *Arethusa* 48.3 (2015): 283-311.

Kirmayer, Laurence J. "Asklepian dreams: The ethos of the wounded-healer in the clinical encounter." *Transcultural Psychiatry* 40.2 (2003): 248-277.

Nicholas, Ralph W. "The goddess Úîtalâ and epidemic smallpox in Bengal." *The Journal of Asian Studies* 41.1 (1981): 21-44.

Robertson, Noel. "The concept of purity in Greek sacred laws." *Purity and the forming of religious traditions in the ancient Mediterranean world and ancient Judaism*. Brill, 2013. 195-243.

Rountree, Kathryn. "Goddess pilgrims as tourists: Inscribing the body through sacred travel." *Sociology of religion* 63.4 (2002): 475-496.

Scott, William C. *The Artistry of the Homeric simile*. UPNE, 2012.

Sontag, Susan. *Illness as metaphor and AIDS and its metaphors*. Farrar, Straus and Giroux, 2013.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

A Critical Examination of India's Media Landscape: Freedom, Challenges, and Accountability

Sumit Howladar *

Abstract: For any democracy to hold on to its true essence, the role of the media is crucial. A free and fair media is essential for creating a voice for the marginalized and the weak. The paper argues that any deviation from this principle has the potential to create a hegemonic government. In the case of India, the society has undergone several churnings, and the media landscape is not completely untouched by it. Especially, after the liberalization period, there have been sea changes in the media world, and crucial questions regarding ownership, accountability, freedom, narrative setting, etc.,have come up in a big way.These are primarily the crucial questions that the paper tries to interrogate, which have far-reaching consequences for the democratic fabric of the nation.

A free press can of course be good or bad, but, most certainly, without freedom it will never be anything but bad.

—Albert Camus, *Resistance, Rebellion and Death* (1960)

Keywords: India, Media, Democracy, Accountability.

---

* Assistant Professor, Department of Political Science, Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum,West Bengal; & Visiting Faculty, Biswa Bangla Biswabidyalay, Bolpur, West Bengal. e-mail: sumit.hwl@gmail.com

Introduction

Have phrases such as 'free and transparent media' and 'sincere journalist' become rather oxymoronic? Undeniably, terms like this are becoming rare. The media serves two primary functions: it offers a platform for the marginalized and voiceless, and it facilitates discourse while advancing a democratic agenda.However, this demands stringent commitment to objectivity, which consequently necessitates autonomy. If the broader governmental apparatus at any level perceives inquiry and questioning as bad culture and detrimental to political culture, it reflects the government's stance on accountability. This basically aims to delegitimize the media. Although the form and reach of the media have expanded, its democratic essence and core are diminishing. Besides this, there are four key fundamentals concerning media that need to be kept in mind before getting into the nitty-gritty of media freedom in India. Firstly, a subservient media signals the demise of democracy. Secondly, media should be allowed to constantly question the government to ensure accountability. Any deviation from this will inevitably lead to the development of a totalitarian regime. Thirdly, there will always be an effort on the part of the government to establish a compliant media by suppressing journalistic freedom. Often this is achieved by establishing misleading dichotomies of 'free speech' and 'nationalism'. Lastly, revising the policy framework will help curb arbitrary censorship of the media.

What does the World Press Freedom Index say about India?

The World Press Freedom Index report, which is released every year by the Paris-based media watchdog Reporters Sans Frontières (also called Reporters without Borders), has ranked India in the 151st position out of 180 countries in 2025 with a total score of 32.96, moving up 8 places from 159th last year. Below is a comparative analysis of India's rank and score in 2025 vs. 2024, showing the changes in the various indicators.

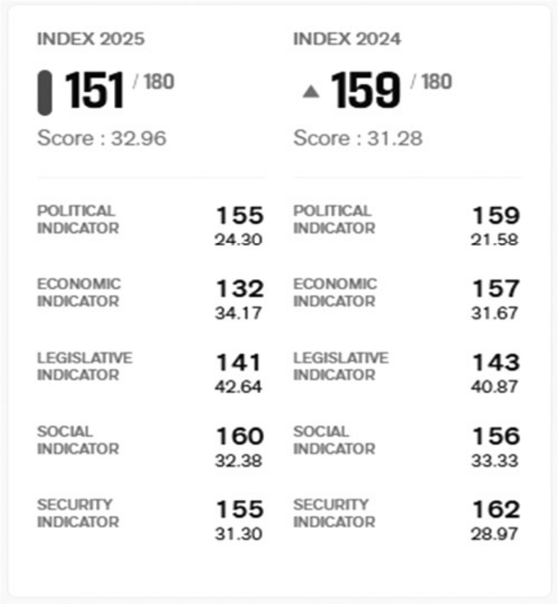

INDEX 2025		INDEX 2024	
151 / 180	Score : 32.96	▲ 159 / 180	Score : 31.28
POLITICAL INDICATOR	155 24.30	POLITICAL INDICATOR	159 21.58
ECONOMIC INDICATOR	132 34.17	ECONOMIC INDICATOR	157 31.67
LEGISLATIVE INDICATOR	141 42.64	LEGISLATIVE INDICATOR	143 40.87
SOCIAL INDICATOR	160 32.38	SOCIAL INDICATOR	156 33.33
SECURITY INDICATOR	155 31.30	SECURITY INDICATOR	162 28.97

Source:https://rsf.org/en/country/india

The report further states that "With violence against journalists, highly concentrated media ownership, and political alignment, press freedom is in crisis in "the world's largest democracy", ruled since 2014 by Prime Minister Narendra Modi, leader of the Bharatiya Janata Party (BJP) and embodiment of the Hindu nationalist right."1Though there is a slight improvement in India's ranking, still it is evident that the situation is dismal.

What has Changed in the Recent Past?

Growing noise and corrosive intolerance have changed the media ecology. Although dissent has always existed, we now see less room for other viewpoints. A large part of the media is shifting from being a communicator to a diligent defender of socio-political beliefs. This was seen in media coverage of the Rohith Vemula tragedy, the JNU crackdown, the Mohammad

Akhlaq lynching, and the Sushant Singh Rajput case. Information presented as news contains prior assumptions, making it propaganda.While nepotism, partisanship, and deteriorating media ethics are not wholly unprecedented, the media has never encountered a crossroads where it must decide between subservience and being branded as 'anti-national'. Although total media neutrality has been a subject of debate, what is distinctive is the creation of artificial dichotomies between 'free speech' and 'nationalism'.The amalgamation of government and nation presents a significant challenge and presently serves as the catalyst for explicit media regulation. The fact that the interests of the government and the nation may not be congruent is often overlooked.

Why are Journalists turning into Youtubers and Bloggers?

The phenomenal rise in the number of mainstream journalists (sometimes from big media houses) turning into YouTubers and bloggers points to a deep-seated problem within the mainstream print and electronic media. The latest example is the famous news anchor and journalist Ravish Kumar,who has won the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award twice, in 2013 and 2017, for the broadcast category in Hindi journalism and has also been recognized with the Ramon Magsaysay Award in 2019. The other big name who adopted the same path is Barkha Dutt, who left NDTV after 21 years in 2017, citing censorship of her political reporting. That same year she registered Mojo Story, which began largely as a YouTube channel and is currently running successfully with over 1.97 million subscribers. As censorship in mainstream media escalates, journalists are increasingly seeking alternative and independent platforms for news interpretation and self-expression. often their material is occasionally significantly superior to that of television channels and newspapers. The independence of these blogs enhances the quality of the content and fosters a more balanced perspective on subjects. This is a wonderful step; nonetheless, it signifies the growing censorship in mainstream media chan-

nels. Furthermore, being confined to the internet circuit, these blogs are unable to reach a broader audience, so limiting the dissemination of different and independent news and perspectives.

Rethinking the Legal and Policy Framework

The media, as an institution, is obligated to report the truth, and there should be no deviation from this premise. The accurate reporting of the facts has been obstructed due to structural deficiencies inside the institution, together with the infiltration of entrenched interests. Recently, two concurrent trends have emerged in which the media is either controlled or regulated. This element of censorship within the process of management compels journalists and editors to become accustomed to a specific approach. Consequently, the contractualization of news is occurring. To eliminate this unwarranted and capricious meddling by the government and influential interest groups, immediate policy reforms are necessary. Interestingly, the constitution does not explicitly mention freedom of the press; rather, it is safeguarded by the right to freedom of expression. There have been multiple proofs in the political history of independent India where various governments have employed colonial-era laws, including those concerning sedition, defamation, and anti-state actions, to control the media. Even anti-terrorism legislation has been progressively employed against journalists. Recently there has been a major debate regarding the new laws that have been enacted by the government, like the 2023 Telecommunications Act, the 2023 draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, and the 2023 Digital Personal Data Protection Act, where there is an inept fear of government overreach with the potential of regulating the media, censoring information, and suppressing dissent. Of late a fresh debate regarding media freedom has sparked since the Indian government is apparently intending to implement new media legislation aimed at regulating digital news and online content companies. The proposed Broadcasting Services (Regulation) Bill seeks to enhance regulatory efficiency

and broaden its applicability to encompass Over-the-Top (OTT) platforms and digital journalism. This has raised apprehensions regarding possible governmental overreach and constraints on media liberty. This legislation, formulated to replace the Cable Television Networks (Regulation) Act of 1995, aims to govern broadcasting services, encompassing digital platforms and news content makers. Since the legislation mandates content creators to form Content Evaluation Committees (CECs) and obtain approval for their work before publication, journalists, campaigners, and human rights organizations have expressed apprehensions regarding potential censorship and suppression of free speech resulting from the bill's stipulations. According to a piece in 'The Hindu' by Jitendra Awhad, 'The broadcasting services regulation bill: A threat to digital freedom and innovation', "The bill's too expansive measures, which could potentially subject even independent content creators to governmental scrutiny, are among its most controversial features."What is required is a serious debate regarding overhauling the legal and policy framework, and some important pointers in this direction can be the following:

(i) Ownership Character of the Indian Media

The findings of the 2025 Reporters Without Borders (RSF) World Press Freedom Index indicate a grim reality: almost fifty percent of the global population resides in nations where press freedom is deemed 'very serious'. In its 2025 report, it placed India in the 151st position out of 180 countries. One crucial point to take note of is that the report stated that the economic indicator in the 2025 RSF World Press Freedom Index has reached its historical nadir, and the global situation is now deemed challenging. It further stated that significant budget reductions pose an additional setback to the media industry, which is already compromised by the hegemony of technology giants such as Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft in the distribution of information.The survey indicated that these predominantly unregulated platforms are capturing an increasingly

substantial portion of advertising revenues that would typically fund journalism.

The downward slide in the reputation of the Indian media has largely to do with the ownership character of the media. Today most of the media houses are owned by corporations, and this is true globally. The RSF report further states that "India's media has fallen into an "unofficial state of emergency" since Narendra Modi came to power in 2014 and engineered a spectacular rapprochement between his party, the BJP, and the big families dominating the media. Reliance Industries group's magnate Mukesh Ambani, a close friend of the prime minister, owns more than 70 media outlets that are followed by at least 800 million Indians. The NDTV channel's acquisition at the end of 2022 by Gautam Adani, a tycoon who is also close to Modi, signaled the end of pluralism in the mainstream media. Recent years have also seen the rise of "Godi media" (a play on Modi's name and the word for "lapdogs") - media outlets that mix populism and pro-BJP propaganda. Through pressure and influence, the Indian model of a pluralist press is being called into question."[2]

Corporate entities have undermined the media's objectivity and independence because of their financial interests. Two significant consequences in this context are the erosion of editorial autonomy, as corporate executives and trustee boards have taken on the role of proxy editors, and the closure of local and small media outlets due to substantial pressure from larger media conglomerates.Cross-media ownership has led to a concentration of power, which diminishes the diversity of media perspectives. This indicates a shift from the prior strategy where Jawaharlal Nehru sought to organize the press as an industry. A Press Commission was officially established, accompanied by the formation of the Wage Board and the Press Council. These advancements resulted from such reasoning. Currently, the media is predominantly governed by private entities. A specific problem in this context is the issue of cross-media holding.The following data is indicative of the enormity of this trend.

	TV Channels	Print	F.M Radio
Sun TV	Yes	Yes	Yes
Essel Group	Yes	Yes	Yes
India Today Group	Yes	Yes	Yes
Malayala Manorama Group	Yes	Yes	Yes
Times Group	Yes	Yes	Yes

Source: Administrative Staff College Report and FICCI- PWC Media and Entertainment Review 2012

In an environment characterized by employment instability, it is impractical to expect boldness and transparency from journalists, thus severely compromising pluralism in reporting.The corporate's disproportionate control over media compels one to ask whether the government has adequately addressed the issue of media business, particularly its financial dimensions.

(ii) Strengthening the Press Council of India

Current government policy towards the media landscape remains ambiguous. India's liberalization has attracted private companies in many areas, including media. The advent of social media has transformed the landscape and dynamics of news production and distribution. Print media was once the main source of news, but electronic and social media are now important. Despite attempts to identify media concerns, the growing media landscape has not been accompanied by a regulatory overhaul.An effort in this direction has been the report of the Sub-Committee of the Press Council of India titled 'Paid News: How corruption in the Indian media undermines democracy'. The report said,

> In recent years, corruption in the Indian media has gone way beyond the corruption of individual journalists and specific media organiza-

tions-from "planting" information and views in lieu of favours received in cash or kind, to more institutionalized and organized forms of corruption wherein newspapers and television channels receive funds for publishing or broadcasting information in favour of particular individuals, corporate entities, representatives of political parties and candidates contesting elections, that is sought to be disguised as- "news".[3]

But the report was not pursued. A parliamentary committee submitted its report about the media in May 2013. The report was unprecedented in various aspects and addressed nearly all the contentious areas within the media sector, including the issues of paid news, cross-media ownership, and the diminishing role of the editor. However, to date, the committee's recommendations have not been executed.The Press Council of India fails to ensure transparency and journalistic ethics for many reasons. Examples include:

(a) The mandate is limited to print media, leaving electronic, online, and social media beyond its jurisdiction.

(b) The authority only adjudicates and does not enforce.

(c) It cannot levy fines or act against rule and norm offenders, and its instructions are mostly advisory.

(d) It does not influence or implement journalistic standards.

(iii) Need for anOverarching Media Council

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) in India is the principal governmental authority tasked with the regulation of electronic media. The MIB establishes and enforces rules, regulations, and legislation pertaining to broadcasting, encompassing both television and radio. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is also crucial in formulating the regulatory framework for broadcasting and cable services.Even the performance of other self-regulatory bodies like the News Broadcast-

ing Standards Authority, Broadcast Editors' Association, Advertising Standards Council of India, etc., has not been groundbreaking, as is evident from the degree of corporate interference in the electronic media coupled with non-stop cacophony and theatrics in the news rooms.

The lack of an electronic media-focused Media Council is another policy vacuum that must be addressed promptly. Since the Atal Bihari Vajpayee-led NDA government, this subject has been discussed, but no consensus has emerged. Justice P.B. Sawant, former Chairman of the Press Council of India, proposed this proposal, but media bodies like the India Journalists Union, Working News Cameramen's Association, etc. have failed to agree on a common blueprint. Both the print and the electronic media need to come under its ambit. With the Press Council of India not having enough teeth as far as punitive actions are concerned, the need for a proper platform for lodging complaints by both the media members and the general audience is urgently needed. This will help rein in the blatant unethical practices doing the rounds in the media circle.

(iv) Regulating the Promotional Activities

In India, government advertising expenditures are administered by the Bureau of Outreach and Communication (BOC), formerly referred to as the Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP). The BOC serves as the central agency for disseminating advertisements through several media channels, including print, television, radio, and digital platforms. The procedure entails the empanelment of media entities, dissemination of advertisements in accordance with government initiatives, and remuneration via electronic methods.That the reach of television has increased in India is undoubtable, as mentioned in the Broadcast Audience Research Council, India (BARC)'s report titled "TV Universe Estimates 2020". The report mentions that "India is home to 1.3 billion people and more than 300 million households with diverse cultures. However, while TV-owning households in the country represent about 2/3rd of all households, they

have been increasing and have doubled over the past two decades."4

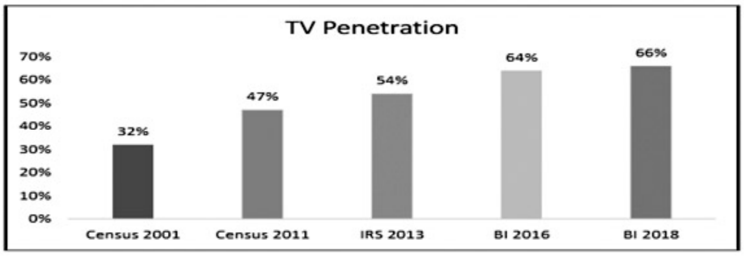

Source:BARC, India

The expanding reach has the potential to enhance public awareness of various issues; however, a concerning trend has emerged in which the government allocates substantial funds for the promotion of its programs and schemes. In a report published in November 2020, the news portal "The Wire" reported, "The Narendra Modi government spent around Rs 713.20 crore of taxpayers' money to promote itself through advertisements in newspapers, electronic media and hoardings, etc. over the last financial year. Replying to an RTI query filed by activist Jatin Desai, the Bureau of Outreach and Communication under the ministry of information and broadcasting said that a whopping Rs 1.95 crore was spent per day, on an average, on advertisements between 2019-2020 by the Central government." 5 The news piece further mentioned that the Bureau has reported that Rs. 295.05 crore was allocated for printadvertisements, Rs. 317.05 crore for electronic media, and Rs. 101.10 crore for outdoor advertisements. It, however, did not provide any information regarding the expenditure on advertisements by the government for publicity in foreign media. In June 2019, in reply to an RTI inquiry by Mumbai resident Anil Galgali, the ministry stated that it had expended Rs. 3,767.2651 crore of taxpayer funds on print, electronic, outdoor media, and printed publicity. In May

2018, a year earlier, another RTI response to Galgali from theministry disclosed that the Modi administration expended Rs. 4,343.26 crore on media advertisement and PR since the BJP assumed power in June 2014. The notable factor here is the enormous amount of money spent by the government on promotional activities. This undoubtedly is bound to put tremendous pressure on the public exchequer.

(v)Tackling the Undeclared Censorship

Without a better sense of security, the media community cannot function in a free and bold manner. On this account the scenario in India is quite troubling. This looming threat of insecurity also acts as an undeclared censorship mechanism whereby journalists at times cannot pursue certain issues and disclose certain facts. This in turn affects both the integrity and validity of the news that is distributed. India has persistently received low rankings in the Committee to Protect Journalists (CPJ)'s Global Impunity Index, which highlights nations where journalists are assassinated and their perpetrators remain unpunished. India has been included in the index every year since its establishment in 2008. This signifies a continual issue of impunity for offenses against journalists in India.The following index prepared by CPJ in 2022 shows the grim picture regarding the security of the journalists in India.

Even a 2015 report by the Press Council of India, established by Parliament in 1966 to oversee press freedom and journalistic ethics, revealed that despite the presence of strong democratic institutions and an independent judiciary, perpetrators of journalist homicides are evading justice. The scenario is genuinely concerning and would affect the operation of the country's democratic institutions.In the absence of a secure environment for journalists, objective news and reporting will remain a fantasy.

2022 Global Impunity Index

Index rank	Country	Population (in millions)*	Unsolved murders**	Years on index
1	Somalia	16.4	19	15
2	Syria	18.3	16	9
3	South Sudan	11.4	5	8
4	Afghanistan	39.8	17	14
5	Iraq	41.2	17	15
6	Mexico	130.3	28	15
7	Philippines	111	14	15
8	Myanmar	54.8	5	1
9	Brazil	214	13	13
10	Pakistan	225.2	9	15
11	India	1,393.4	20	15

Source: Global Impunity Index, 2022

A Subaltern Counter-Narrative is Required

In addition to the specific regulatory reforms, one more crucial factor must be addressed to guarantee a genuine sense of freedom in media and to ensure its true representativeness. An essential, although sometimes overlooked, part of the media freedom issue and its cyclical repression is the lack of a subaltern narrative. If the representation of Dalits in the media remains minimal, the media as an institution cannot be genuinely representative. Media expert and educator Robin Jeffrey has accurately stated, "The media's inability to recruit Dalits constitutes a violation of the constitutional assurances of equality and fraternity." Research done by Ajaz

Ashraf for HOOT (the media watchdog) revealed that caste-based discrimination was the predominant cause for Dalit journalists' desire to leave their positions in the media. Despite the emergence of Dalit media outlets such as Dalit Dastak, National Dastak, Dalit Media Watch, Roundtable India, and Forward Press, the mainstream media remains predominantly upper-caste, perpetuating caste discrimination. The assault on media and the concept of censorship is not solely an external phenomenon; rather, the freedom of the press is jeopardized from within the organization itself. The current prevalence of specific voices, with the assaults on Dalits, is not coincidental; rather, it results from upper-caste hegemony. Establishing a Dalit counter-narrative necessitates self-reliance as the sole viable approach. Efforts are being undertaken in this regard, as previously stated. Dr. Ambedkar also chose this route when he started five newspapers: Mukhnayak, Vahishkrit Bharat, Janta, Samta, and Prabuddha Bharat.

Conclusion

What is of urgent need is a better sense of unity within the media community itself. To maintain the freedom of the media, the option for various stakeholders (both large and small media ventures) is not lonely and single-handed battles but instead a united war against any attempts to muzzle its independent voice. A significant portion of the media, due to its increasing proximity to the ruling class, is forfeiting its constitutional role. A significant portion may stem from a sense of compulsive surrender; nonetheless, the aspect of voluntary submission cannot be disregarded.We, as consumers of news, must confront the fundamental question of whether we deserve the media we have at the moment. Regrettably, the response to this inquiry appears to be affirmative. If we persist in favoring cacophony above substance, the lamentable condition of the Indian media, characterized by exaggeration and misleading binaries, would remain unchanged. Readers and viewers must exert collective efforts to preserve the integrity of the media by adopting a more discerning and constructive critical

approach.As iconic media figures in the media, such as Ganesh Shankar Vidyarthi, fade into obscurity and are supplanted by anchors who seem to be suffering from Klazomania, it may be time to reassess the credibility of the media as a whole and its contribution to societal development.The Indian media is vast; nonetheless, there is a need to enhance transparency, quality, and substance. Only then can its credibility be sustained. The primary principle for the media should be 'accountability to the public' rather than 'loyalty to the government'. Perhaps we need to remember former US President Thomas Jefferson's dictum, which states that it is desirable to have 'newspapers without a government' rather than 'a government without newspapers'.

Endnotes:

1. RSF: https://rsf.org/en/country/india, Accessed on 22.06.2025
2. RSF: https://rsf.org/en/country/india, Accessed on 22.06.2025
3. Press Council of India: http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/Sub-CommitteeReport.pdf , Accessed on 23.06.2025
4. BARC: https://www.barcindia.co.in/whitepaper/barc-india-tv-universe-estimates-2020.pdf Accessed on 25.06.2025
5. The Wire: https://thewire.in/politics/modi-govt-advertisements-bjp-2019-2020-rti Accessed on 21.06.2025

References:

Ashraf, Ajaz. "Dalits in media feel the sting of caste discrimination." *Firstpost*. 13 August, 2013. http://www.firstpost.com/india/dalits-in-media-feel-the-sting-of-caste-discrimination-1029885.html

Atreya, Shashank. "Cross Media Ownership in India: Cause for Concern?" *Tech Law Forum, NALSAR*. 22 September, 2014. https://techlawforum.wordpress.com/2014/09/22/cross-media-ownership-in-india-cause-for-concern-2/

Awhad, Jitendra. "The broadcasting services regulation bill: A threat to digital freedom and innovation." *TheHindu.* https://www.thehindu.com/opinion/the-broadcasting-services-regulation-bill-a-threat-to-digital-freedom-and-innovation/article69334761.ece

BARC. "TV Universe Estimates 2020". https://www.barcindia.co.in/whitepaper/barc-india-tv-universe-estimates-2020.pdf

Bhattacharjee, Manash. "A Free Press Must Be Defended." *The Wire*. https://thewire.in/146520/free-press-must-defended/

CPJ. "Killing with impunity:Vast majority of journalists' murderers go free." November 1, 2022. https://cpj.org/wp-content/uploads/2022/10/CPJ_2022-Global-Impunity-Index.pdf

Deshpande, Pushparaj. "Instituting Constitutional Press Council Will Help the Indian Media Do Its Job." *The Wire*. 12 March, 2016. https://thewire.in/83983/constitutional-press-media-freedom/

Editorial. "An Undisguised Assault on Media Freedom." *The Wire*. June 6, 2017.https://thewire.in/144171/editorial-assault-media-freedom/

Galhotra, Sumit. "CPJ: Impunity, Lack of Solidarity Expose Indian Journalists to Attack." Global Investigative Journalism Network. September 2, 2016. https://gijn.org/stories/cpj-impunity-lack-of-solidarity-expose-indian-journalists-to-attack/#:~:text=In%20a%202015%20report%20on,the%20killers% 20of%20journalists%20are

Jamwal, Prabodh. "When Media Freedom is Threatened, Solidarity in Half-Measures Doesn't Help." *The Wire*. 20 June, 2017. https://thewire.in/149114/media-unity-something-missing/

Jeffrey, Robin. "Missing from the Indian newsroom." *The Hindu*. 9 April, 2012. http://www.thehindu.com/opinion/lead/Missing-from-the-Indian-newsroom/article12952764.ece

Pande, S.K. "For the power of enforcement." *Frontline*. 1-4 September, 2001. http://www.frontline.in/static/html/fl1818/18180980.htm

Roy, Shreyashi. "For India, a Year of Shrinking Freedom of Speech." *The*

Wire. 2 May, 2017. https://thewire.in/131167/for-india-a-year-of-shrinking-liberty/

RSF. Asia-Pacific India. https://rsf.org/en/country/india

Special Correspondent. "PCI panel for ad policy on DAVP norms." *The Hindu*. 9 February, 2016. http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/pci-panel-for-ad-policy-on-davp-norms/article8211916.ece

Staff. "The India Freedom Report, January 2016-April 2017." *The HOOT*. 2017.http://www.thehoot.org/public/uploads/filemanager/media/LATEST-FREEDOM-REPORT-.pdf

The Wire Staff. "The Modi Government's Intent Is to Have a Docile Press."*The Wire.*8 June, 2017. https://thewire.in/145293/cbi-ndtv-modi/

The Wire Staff. "Modi Govt Spent Rs 713.20 Crore of Taxpayers' Money on Ads Last Year, RTI Reveals." *The Wire.* 1 Nov, 2020. https://thewire.in/politics/modi-govt-advertisements-bjp-2019-2020-rti

The Partition of India and the Instrumentation of Violence as Psycho-Political Weapons over the Afflicted: Political Revision of a Few Short Stories of Saadat Hasan Manto

Amitava Kanjilal *

Abstract: Pakistan emerged as an Islamic state by partitioning India based on the Two-Nations Theory, despite India being a multi-religious nation, the long-standing relationship between the two primary communities, Hindus and Muslims, had woven a rich tapestry of social, cultural, and religious values over centuries. In the context of partition, this relationship faced a severe dialectical confrontation. The culmination of communal-political interests led to riots and bloody massacres, accelerating and concluding the partition. Among those who have penned the literary narratives of this tragic reality, the distinct perspective of Saadat Hasan Manto is unparalleled. Manto poignantly records the brutal degradation of contemporary human values, striking deep into the reader's consciousness as he navigates the boundaries of refined citizenship and the notions of decency versus indecency. Born in 1912 in Ludhiana, Punjab, in undivided India, he ultimately had to move to Pakistan, driven by the fate shaped by partition. He profoundly grasped the agonies of partition, witnessing the struggles of helpless people against extreme uncertainty, de-

* Assistant Professor; Departmnt of Political Science; Siliguri College; Siliguri. e-mail: dr.amitavakanjilal@gmail.com

spair, anxiety, and poverty. In documenting how the chaotic, grotesque, and brutal reality of riot-torn times engulfed uprooted lives, Manto repeatedly illustrated the helpless surrender of humanity at the mercy of decaying social values, or alternatively, the unique examples of resistance that emerged. He also depicted the significant virtues of good sense and humanity among the marginalized and socially deprived lower classes in his short stories and anecdotes.

The present paper aims to delve into the understanding of the depiction of the erosion of human values against the backdrop of partition through selected narratives and descriptions from Manto's short stories and anecdotes, while also exploring the contrasting indications of human benevolence.

Key Words: *Refugee;Collective Ferocity; Repressed Desires; Mental Area; Namelessness.*

Violence was a key tool in exacerbating communal divisions during the Partition of India, serving as a means to solidify identities and justify the creation of separate nations. The British "divide and rule" policy, coupled with the perceived threat of the other, fuelled pre-existing tensions and resulted in widespread violence, including riots, displacement, and atrocities against women and children. Violence during the partition involved horrific acts like massacres, looting, abduction, rape, and mutilation, often targeting people based on their religious identity.Such brutality reinforced existing prejudices and stereotypes, fostering distrust and enmity between Hindus, Muslims, and Sikhs.The concept of national honor and purity became intertwined with the subjugation and violation of women's bodies, further deepening the communal divide, notes Dialnet (Dey, 2016).

This violence, often deliberately orchestrated, aimed to create a sense of "us" versus "them" further solidifying the lines of religious and ethnic

difference. The partition was not a sudden outbreak of violence, but rather a culmination of pre-existing social, economic, and political tensions between different communities. Evidence suggests that violence was not always spontaneous, but sometimes deliberately orchestrated by political groups and individuals to achieve specific goals. The partition witnessed widespread communal riots, particularly in Punjab and Bengal, with devastating consequences for civilians. Violence against women was a particularly horrific aspect of the partition, with women facing abduction, rape, and other forms of sexual assault. The violence forced millions of people to migrate across the newly formed borders, leading to displacement, loss of property, and immense suffering. The partition triggered one of the largest migrations in history, displacing millions of people who became refugees overnight, according to the British Red Cross. This displacement and the associated violence left deep scars on the collective memory of the affected communities, impacting subsequent generations. The trauma of partition continues to influence inter-community relations in India and Pakistan to this day, observes Stanford Report. The violence and trauma of the partition had a profound and lasting impact on individuals, families, and communities, shaping their worldviews and perpetuating intercommunal tensions. During the partition, this was evident in the actions of various groups and individuals who exploited the volatile situation to advance their political agendas.Violence during the Partition of India was not just a tragic consequence but also a deliberate tool used to solidify and exacerbate existing communal divisions, leaving a legacy of animosity and trauma that continues to impact the Indian subcontinent. Understanding this historical context is crucial for addressing the ongoing challenges of communalism and fostering peaceful coexistence in the region.

The Dark Backdrop:

With the Partition of the subcontinent based on the Two-NationsTheory,

calamities befell the people of undivided Bengal and Punjab. Millions of Hindus from East Pakistan were forced to seek refuge in West Bengal, Assam, and Tripura due to fear of loss of honour and religion, while countless individuals from the Punjab province of West Pakistan sought shelter in Indian Punjab, Haryana, and Delhi. This proves that just as India gained independence on August 14 and 15, 1947, the nation experienced a painful disintegration at both ends. Despite being a nation composed of various religions, the centuries-old interrelationships between the two main communities—Hindus and Muslims—had formed a deep social, cultural, and religious bond that faced a severe dialectical crisis in the wake of the Partition. The culmination of communal and political interests led to riots and massacres, accelerating and completing the Partition. On that day, the western front of India witnessed a migration that was marked by riots, while the Bengali unity in the eastern front was permanently shattered. Those who sought refuge in West Pakistan as a result of this exodus were labeled*Muhajir*, while those from East Pakistan who found shelter in West Bengal were referred to as *Bastu-hara*. Regardless of what name they were given, the indifference, neglect, disregard, and history of deprivation they faced were not the same. Those who moved from West Bengal to East Pakistan were not as much victims of neglect. Similarly, the fortunes of those who moved from East Punjab to West Pakistan were not as dire. The refugees coming from West Pakistan overcame temporary hardship and, with government assistance, regained their rights to live with dignity. However, this was not the case for the refugees arriving in West Bengal, who found themselves in desolate provinces, barren lands, along the Mahana, or amidst more perilous terrains. (Flemming, 1978)

When examined deeply, the division between Bengal and Punjab seems unjustifiable in many aspects. At least in light of the arguments presented by the then ruling class, national leaders, and proponents of Pakistan, it may have seemed acceptable to many amidst the frenzy of the then hot

socio-religious context. However, standing at a distance from history or matching it closely with human fate makes the absurdity of these so-called justifications even clearer. Among the artists and writers who sought to criticise that absurdity with sharp critique, the most revolutionary name is undoubtedly Saadat Hasan Manto. Manto, with the bleeding heart of partition's pain, has left behind an unparalleled collection of short stories that is imbued with exceptional lessons of human values. He painted the map of devastated humanity during a catastrophic time through his narratives. At the same time, he firmly and clearly illustrated the irresponsibility of so-called civilized beings and their apathy during social crises.

Manto as a Story-teller:

He was born in 1912 in Ludhiana, Punjab, in undivided India, but was ultimately forced to move to Pakistan due to the circumstances of partition. He understood the anguish of partition closely, witnessing the fierce struggle of destitute humanity grappling with extreme uncertainty, despair, anxiety, and poverty. While chronicling how the chaotic and horrific reality of riot-torn times engulfed the lives of uprooted individuals, Manto repeatedly demonstrated the helpless surrender of endangered humanity to the decay of social values or the rare resolve to turn against it. He also depicted significant deeds of benevolence and humanity among the relatively marginalized and socially neglected lower classes in his short stories and novellas. In light of these characteristics of his writing style, it is perhaps a distortion to place him directly among left-leaning writers. Although a member of the Indian Progressive Writers Association, he refused to accept their mechanistic thinking and ultra-revolutionism. This is why he expressed a somewhat accusatory tone towards his communist friends, writing, "Some Russian poet has said this; some Russian writer has made this statement… why don't these people speak of the country where they live and breathe?" (Iqbal, 2024)

Throughout his life, debate never left Manto. He repeatedly sought

to document the dismal days of society. Legal complications arose with various accusations against him. Even accused of obscenity, he dismissed the charges. While testifying in court, he stated, “Why would I strip the fabric of a society and civilization in disgrace when it is already naked! Yes, it is true that I did not try to dress it up in fancy garments. Why would I do that? That’s not my job. I write with a black pen, but that doesn’t mean I write with black chalk on a blackboard. I always use white chalk to make the black color of the board more evident.” (Shaheen, 2013)

In 1948, after the partition, Manto moved to Pakistan. He settled in Lahore and spent the last seven years of his life there. However, his life in Pakistan was anything but happy. The pain of broken dreams, the despair of unemployment, extreme poverty, and deprivation became his constant companions in his final years. Before his death, he wanted to return to India, to his beloved Bombay film industry, but that desire was never fulfilled. Nevertheless, in his last seven years in Pakistan, he wrote masterpieces like “Toba Tek Singh,” “Thanda Gosht,” “Khol Do,” and “Kali Salwar.” He died in 1955 at the age of just 43 from cirrhosis of the liver. Throughout his brief 43 years, he produced twenty-two collections of short stories, one novel, five radio play anthologies, two autobiographical books, three essay collections, and several screenplays.

Before comprehending the overall portrayal of the decline of human values in Saadat Hasan Manto’s short stories, it becomes essential to create a theoretical framework regarding how a collective ferocity was being nurtured in the minds of Indians around the time of the partition or shortly before and after it, addressing whether it was merely *instinctual* or *acquired behavior*. It goes without saying that the communal violence, bloodshed, riots, rapes, looting, abductions, conversions, etc., witnessed in the context of partition were undeniably violent. While the attacking side sought revenge and the attacked side experienced terror, it is essential to clarify how deeply the feeling of insecurity expanded in both sides

within the uncertain atmosphere of partition. Otherwise, the sources of the decline in human values remain elusive.

Understanding 'Violence' as Psycho-Political Weapon:

It is important to note that there is a difference between individual violence and collective violence. Individuals who are part of a collective, when facing attacks from another collective, often merge their individual identities to protect their collective identity. In such situations, if a seemingly peaceful person feels their group is under attack, it doesn't take long for their behavior to become violent. There are numerous examples where individuals who had never killed a chicken in their lives ended up killing multiple people during the partition—this trend demonstrates a surrender of personal identity to evoke a sense of solidarity towards one's group and to express readiness to counter perceived threats. This attitude reached a boiling point during the partition.

Like any beast, humans are area-conscious and determined to protect their *area*. This *area* is not just a geographical matter; it is also a conceptual issue. It can include their homes, religions, states, provinces, countries, and communities. The more complex the appearance of an *area,* the more complicated the processes for its protection become. A small house can be secured with a simple lock on the door, but protecting a religion or a country necessitates a well-organized army. During the partition, almost every ordinary Hindu and Muslim sought to become diligent soldiers for protecting their religion and community by responding to communal area consciousness.

As independence approached, uncertainties arose regarding who would hold the governing power in the post-independence country. People from all communities saw their groups drifting into uncertainty. When a religious community feels threatened, historical examples show that it can resort to violence for self-defence, as seen in the conflicts between Catholics and Protestants, or during the Crusades, where countless acts of

violence occurred in the name of holy wars. When the concept of dual nationality was mixed with the British policy of divide and rule, the communal sentiments of the upper-class Hindus created a complex chemical reaction. History has shown that during colonial rule, the communal relations between Hindus and Muslims in the Indian subcontinent fluctuated within a fragile balance. During this oscillation, the notion of two separate nations instilled a false sense of security among Hindu and Muslim communities. Securing a state in favour of one's own religion was believed to guarantee tri-level safety—material security, i.e., barbed wire and the assurance of border guards; procedural security, i.e., freedom from being untouchable and unapproachable by others to maintain religious distinctiveness; and relational security, i.e., an environment of understanding among co-religionists. The seeds of such false security among populations were often sown by those whose real intentions were to ascend from leaders to rulers, driven by a thirst for power and the desire to benefit from remaining in power. If people could be agitated to establish a new country, it would secure their political supremacy. When combined with the fervour of state salvation, religious emotions could unleash a devastating madness—such elements had already been present in the Indian subcontinent. Thus, the outcome of the partition was extremely tragic.

The sexual violence and assault against women during the partition riots is rooted in a more primitive psychology. Most of those who committed these sexual atrocities were not notorious offenders or sexual criminals. They lived relatively normal lives before and after the partition. However, a person's natural sexual impulses are largely controlled by societal norms and moral values. When the social framework breaks down amidst the chaos of riots, people no longer feel the need to restrain their repressed sexual desires. They indulge in sexual violence and rape. Thus, in the context of the partition, the atmosphere of violence shattered a nearly balanced framework of human values, a theme that has repeatedly emerged from history and literature, memory and reflection. Saadat Hasan Manto,

one of the most profound writers of partition literature, can draw our attention to certain selected short stories to identify the characteristics that reveal the degradation of human values due to communal riots in such an emergency.(Sing, 2020)

'Paralytic' Violence:

Manto's unforgettable creation "Toba Tek Singh" reflects upon the aftermath of the partition when the resource allocation led to the derangement of the mad incarcerated. When it became evident that the madmen of both countries were not relocated, his governmental initiative was ceremoniously celebrated. Among these madmen, Toba Tek Singh clung to his existence and showed no desire to be relocated from his wing of the asylum. Standing in no man's land until the moment of his death, he remained unwavering in his autonomy. Manto seemed to want to depict how, amidst the ruthless reality of partition, those who remained attached to their homeland, despite enduring all kinds of humiliation, injustice, and oppression, were essentially dreamers lost to madness. Their patriotism appeared entirely out of place in the context of opportunistic resource redistribution. This struggle to hold onto human values ultimately proved to be a form of madness, as it meant standing alone in no man's land.(Manto, 2008)

Another poignant piece by Manto, "Khol Do," narrates how a group of Muslims displaced due to the partition seek refuge in Mughalpura, Lahore. However, many get scattered and separated from their loved ones, falling prey to the rioters en route. Sirajuddin's daughter, Sakina, disappears amidst the chaos. In search of his daughter, Sirajuddin encounters a band of armed volunteers who have determined to protect women and children of their faith. They reassure Sirajuddin that they will help find Sakina. However, upon finding the beautiful Sakina, the protectors turned into predators, pushing her into a mental breakdown through the horrific act of gang rape that Upon hearing the male voice saying "open the door"

while lying on the hospital bed, she exposed her lower body in front of her father, thinking it was a command of the rapists. In this way, Sirajuddin finds the daughter in a state of lost composure, and the reader realizes how ruthlessly and indiscriminately the so-called humanitarian responsibility has been imposed on both adherents and non-adherents of the faith during the turmoil of riots and partition.(Manto, 2008)

In Manto's most controversial story "Thanda Gosht," a Sikh youth named Ishwar Singh becomes entangled in crime amid the horrific circumstances of the riots while searching for his fortune. After committing murder and looting in a family, he leaves with a young girl from that family for sexual purposes. After engaging with the girl in relative safety, he realizes by then that she has died; in other words, he has raped a corpse. At this dramatic turn of events, the Sikh youth's all sexual impulses face a complete disaster, and when his prostitute girlfriend Kalwant Kaur asks him the reason for this sexual dysfunction, Ishwar Singh descends into self-recrimination. The narrative illustrates that the Sikh youth is not a professional rioter, and his tender feelings for his beloved led him to seek surrender at a secure refuge. The tumultuous environment transformed him into an opportunistic and aggressive perpetrator. His human values took an abrupt turn towards barbarism when he suddenly realized his sexual impulses forced into turmoil. (Bhalla, 1997)

Exposed to extreme violence and coercion, individual often resorts to mental-physical paralysis. Excessive trauma and agony of forced imposition of violence leads to total breakdown of general sense of personaand rational course of reaction to situations. In Manto's portrayal, both the inflicting Ishwar Sing in 'Thanda Gosht' and the inflicted Toba Tek Sing in the story named after him and Sakina in 'Khol Do' stick to partial or total senselessness as their body and mind was overridden by thehorrifying experiences they encountered. Here lies the primary political purpose of any sponsored violence, i.e to paralyse the natural rational reactions of

the commons to resist any attack by means of employing terror and cruelty amounting to no fathomable limit.The perplexity amongst the panic-stricken 'others' maximises the domination of the inducing party.

The violence during the Partition of India was not merely a result of spontaneous communal hatred but was often premeditated and organized by various political factions. Historical analyses suggest that political leaders utilized communal tensions to achieve their objectives, frequently deploying proxies such as gangsters and militant groups to instigate violence for material gains and to assert dominance over rival communities. This orchestration of violence was facilitated by a lack of state oversight and a strategic absence of law enforcement during critical incidents, which allowed tensions to escalate unchecked.

The period surrounding the Partition saw the emergence of paramilitary groups that capitalized on the chaos to further their agendas. These groups, often funded by local elites, engaged in systematic campaigns of ethnic cleansing, particularly in regions like Punjab. The prevailing political climate, characterized by weak state authority and divisive rhetoric, created fertile ground for these organized acts of violence. As local political leaders, including those from the Hindutva milieu, instigated violence through orchestrated provocations during religious processions, the resultant clashes reflected deeper societal fractures. Leaders leveraged communal grievances to galvanize support, often rationalizing violent actions as necessary for self-defense.

The 'Mob'-ility in Violence

The Partition is often described as one of the most violent events in human history, with estimates of casualties ranging from 1 to 2 million people. This violence was not solely inflicted by external forces but also stemmed from inter-community conflicts, where individuals from various religious backgrounds, including Hindus, Muslims, and Sikhs, perpetrated atrocities against one another. Women, in particular, suffered grievously,

facing kidnapping, rape, and public humiliation, highlighting a dark chapter in the aftermath of Partition where gender-based violence became rampant.

In Manto's "Mojel," a mysterious and seductive Jewish woman.A Sikh youth named Tarlochan is so entranced by her physical allure that he abandons his religious identifiers to marry her. Mojel herself has no regard for social, religious, or moral standards. Promising marriage, she leaves Tarlochan, waiting at a bus stand, and departs with an ex-lover. Her desire is to indulge in an open physical relationship and enjoy her blossoming youth. To avoid hurting the simple-hearted Tarlochan, she does not betray him outright. Yet, this young woman, unbound by social values, ultimately sacrifices herself to save Tarlochan's lover, Kripala, by surrendering fully to a ferocious crowd of sexually hungry rioters. Even in death, she gives Kripala the chance to escape by disguising herself in her Jewish attire, leaving a tragic example of humanity for the immersed reader.(Manto, 2008)

Another poignant story by Manto, "For Suitable Punishment," presents a helpless couple from a minority community who hide in their own home during a catastrophic riot. Forced by hunger and thirst, they emerge to plead with the new occupiers of their home to kill them. The Jain occupiers refuse to kill them outright but hand them over to a violent, religiously fanatical mob from the neighboring area. There, the couple meets their tragic end. Manto illustrates how property interests easily trump human compassion, wrapped in a thin veneer of religious integrity, thereby exposing the loss of human values in riot conditions. (Hassan,1987)

In the story "Free for Everyone," Manto portrays a speech by a distinguished politician addressing the crowd, suggesting that they should take responsibility for rescuing their own abducted women and building familial relationships. When a humble individual breaks down in tears, the politician attempts to highlight his speech's success. However, a dramatic

turn occurs when this ordinary person, speaking a painful truth, reveals that the politician remains unmarried because he has failed to find a suitable daughter of a wealthy family. Thus, the man of noble stature who sought to become a leader by offloading the responsibility for the abducted women onto the public exposes his false humanistic values through the truth spoken by a simple man. (Hassan,1987)

Political rhetoric played a crucial role in inciting violence during this tumultuous period. Leaders leveraged communal identities and grievances to galvanize support, often linking populist messages with violent actions. Such rhetoric not only ignited mass hysteria but also rationalized lethal confrontations under the guise of self-defense, thereby normalizing cycles of retaliatory violence. For instance, as Hindu nationalist groups conducted provocative processions through Muslim-majority areas, incidents of violence erupted, prompting police to disproportionately blame the Muslim community, further perpetuating a cycle of blame and retribution.

Violence has a Statist Communal Face, too :

"Surveillance," another of Manto's stories, speaks of a different kind of peril. Here, a character identified only as an alphabet, boards a military vehicle heading to a safe haven. During the journey, he learns from the militia that a particular stray dog has been shot dead and that three dog corpses have been found by the drain. The military platoon's expressions towards the deceased reveal a communal bias, causing the alien boarder to feel alarmed. When they ask why the military is not taking any action regarding these killings, the response is that all events are being carried out under military supervision. In other words, the military personnel deployed by the state for the protection of its citizens have taken on the role of executioners instead of fulfilling their duties. In the face of this facade of neutrality from the state, how much justice can the beleaguered refugees expect? Thus, the partition not only intensified the degradation of

humanitarian values but also spread this decay to the level of state values, rendering human life unbearable. (Manto, 2008)

The instrumentalization of violence during the Partition of India underscores the intersection of political ambitions, communal identities, and historical grievances, illustrating how power dynamics can exploit social tensions to devastating effect. The ongoing impact of this historical event serves as a reminder of the complexities of identity and the challenges of reconciliation in post-colonial contexts.

Survival as Hard Luck

The mass migrations that followed Partition created a humanitarian crisis of unprecedented proportions. Refugees fleeing violence were often met with hostility in their new territories, leading to additional layers of trauma and displacement. Refugee camps, overwhelmed by the influx of people, became breeding grounds for diseases such as cholera and dysentery, further exacerbating the suffering. The challenges faced by both India and Pakistan in accommodating and rehabilitating these refugees added a complex socio-political dimension to the emerging states.

In the story "The Girl from Delhi," we see the young Nasim Akhtar from the red-light area of Delhi, traumatized by communal riots during the partition. Ignoring her mother's warnings, she boards a train to Pakistan in search of fortune with Guru Achan Khan. Her eyes are filled with dreams of a fulfilled life in Lahore with her husband and children, living a pious life. In Lahore, she meets a broker named Jannati, who takes advantage of her goodness and, under the made-up of marriage and family, sells her to a circle of traffickers. Nasim never returns to her home. The darkness from which she had dared to emerge in search of hope ensnares her once again in this new land. History may testify to whose fortunes were changed by partition, but Manto's literature resonates solely with the tales of these unfortunate individuals. (Hassan, 2004)

Through these selected stories of Saadat Hasan Manto, it becomes possible to delineate the extent of the breakdown of humanitarian values in the complex cycles of partition. Manto's penetrating gaze captures a deteriorating reflection of humanity at various levels: the level of state values, social values, the values of civil society, and personal values. Manto was not a resident of a blissful and content time; instead, his works seem to echo a powerful dissenting voice emerging from the currents of time. He did not come to narrate fairy tales; he came to vehemently reject the manifold inequities, absurdities, aimless ostentation, irrational waste, and above all, the degradation of humanity in the society of his time. He was not pained by the erosion of humanitarian values but was convinced that one day, out of this decayed and ailing society, a new and improved community would emerge based on the collective values of the lower classes. Hence, in his eyes, it was not the fashionable, respectable citizens but rather the nameless, faceless, clan-less, and dishonoured people from the lower strata who were the true heroes.

The pain and sharpness of Manto's creations lie here, nestled within this rough and harsh vocabulary. And it is from this rough lexicon and sentiment that one must uncover the latent rebellion of an unknown and unseen world. It is a rebellion that has left a person wounded, devastated, hungry, and naked. (Chughtai, 2012) His country—the Pakistani government has filed multiple cases against him. They have sent him to the lunatic asylum, aiming to protect the country's independence, its *decency*, its *dignity*, and the *purity* of religion. Manto is a controversial writer. In my view, he remains controversial because the whirlwind of conflict will keep him alive and vibrant.

The Partition of India in 1947 was a complex and multifaceted event rooted in colonial policies and the rise of nationalism. The historical backdrop includes the Indian Rebellion of 1857, which prompted Britain to shift power from the East India Company to the Crown, leading to the establish-

ment of the British Raj. Subsequent imperial strategies, notably the "divide and rule" policy, exacerbated religious tensions between Hindus and Muslims, as articulated by Shashi Tharoor, who noted that British policies intentionally "fomented religious antagonisms" as a tool of control. An example of this strategy was the partition of Bengal in 1905, designed to weaken anti-colonial sentiment by fostering divisions between communities. The political landscape in the years leading up to Partition was characterized by a series of contentious events and decisions that intensified communal identities.

Historians Ian Talbot and Gurharpal Singh argue that the partition was not merely the result of British colonial rule but emerged from a complex interplay of political choices made by Indian leaders and the colonial administration. They contend that the partition was "contingent on a range of political choices" and was influenced by decisions made by leaders of both the Indian National Congress and the Muslim League. Religious and communal identities, while significant, cannot be viewed in isolation. Recent scholarship has emphasized understanding Partition within broader narratives of state-making and civilizational contexts (Talbot & Singh, 2009).David Gilmartin has suggested that the event should be seen through the lens of how newly defined nation-states navigated the tensions between secular and religious ideologies in the context of sovereignty. This perspective challenges the oversimplified view that Partition was an inevitable consequence of colonialism or irreconcilable communal differences(Gilmartin,2015).

Additionally, the role of political leaders, such as Mohamad Ali Jinnah and Mahatma Gandhi, was crucial in shaping the events leading to Partition. Their ideologies and political maneuvering contributed significantly to the historical trajectory that culminated in the division of India. This complexity has led to diverse interpretations of the event across various historical writings, including imperial histories, Indian nationalist perspec-

tives, and subaltern histories, reflecting the multifaceted nature of the Partition.

The tumultuous circumstances surrounding the transition to independence and the establishment of Pakistan were marked by violence and chaos, as individuals and groups sought to assert their identities and control over territory. The violence that erupted was driven by both communal tensions and opportunism, as many took advantage of the power vacuum to engage in acts of violence and looting under the guise of religious motivations. Ultimately, the legacy of Partition continues to shape the sociopolitical landscape of the region, illustrating the profound implications of this pivotal moment in history.

The legacy of Partition has had enduring effects on communal relations in the subcontinent. The violence and chaos of 1947 forged a sense of 'us' versus 'them', with national identities increasingly intertwined with religious identities. This ideological division continues to manifest in contemporary politics, where incidents of communal violence are sometimes employed as tools for political gain. Moreover, state actions and policies have played a crucial role in either mitigating or exacerbating these tensions, often reflecting the prevailing political climate.

Despite the violent history, the economic and social interdependence between communities has at times acted as a buffer against enmity. Instances of cooperation and coexistence have persisted, illustrating that while the scars of Partition remain, there exists a potential for reconciliation. This duality highlights the complex nature of identity formation in post-Partition India, where collective memories of violence coexist with narratives of unity and resilience.

Reference:

- Bhalla, Alok, (1997), **Life and Works of Saadat Hasan Manto**, Shimla: Indian Institute of Advanced Study.

- Chughtai, Ismat, (2012), **A Life in Words: Memoirs**. Translated by M. Asaduddin, New Delhi: Penguin.
- Dey, Arunima, (2016), **Violence Against Women During the Partition of India : Interpreting Women and their Bodies in the Context of Ethnic Genocide**, ES. Revista de FilologíaInglesa 37
- Flemming, Leslie A, (1978), **Another Lonely Voice: The Life and Works of Saadat Hasan Manto**, Lahore: Vanguard Press.
- Gilmartin,David, (2015),**The Historiography of India's Partition: Between Civilization and Modernity**, *Journal of Asian Studies*, 74, 1.
- Hasan, Khalid (trans.), (1987), **Bitter Fruits: The Very Best of Saadat Hasan Manto**, New Delhi: Penguin.
- Hasan, Khalid (trans.), (2004),**Mottled Dawn: Fifty Sketches and Stories of Partition**, New Delhi: Penguin.
- Iqbal, Hannah, (2024), **Diversifying Literature: Saadat Hasan Manto,** The Boar, https://theboar.org/2024/09/diversifying-literature-saadat-hasan-manto/
- Manzoor, Sarfraz (2016), **Saadat Hasan Manto: 'He anticipated where Pakistan would go',** The Guardian, June 11, 2016. https://www.theguardian.com/books/2016/jun/11/saadat-hasan-manto-short-stories-partition-pakistan
- Patel, Aakar (trans.), (2014), **Why I Write: Essays by Saadat Hasan Manto,** London:Westland Books.
- Saadat Hasan Manto, (2008), **Kingdom's End and Other Stories**, London: Verso.
- **Saadat Hasan Manto: Remembering the literary legacy of the playwright and author**, The Indian Express, May 11, 2022, New Delhi. https://indianexpress.com/article/books-and-literature/literary-legacy-saadat-hasan-manto-non-conformist-literature-7911114/
- Shaheen, Sabiha (2013), **Relevance of Saadat Hassan Manto's Writings in the Post-Colonial Era**, INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS, Volume 1, Issue 3 December 2013 |

ISSN: 2320-2882 https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT1134382.pdf

- Sing, Glory, (2020), **Saadat Hasan Manto: The Writer Who Is Not To Be Read,** Reclamation Magazine, March 19, 2020 https://reclamationmagazine.com/2020/03/19/saadat-hasan-manto-the-writer-who-is-not-to-be-read/comment-page-1/
- Talbot, Ian and Singh, Gurharpal, (2009), **The Partition of India**, Cambridge, Cambridge University Press.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Intervening Household as a Critical Unit of Research

Malinee Mukherjee *

Abstract: Households are believed, to be the fundamental unit of social organisation, across histories and cultures, bestowing every individual with their unique identity, roles, responsibilities and creating a collective community cohesiveness over time. Today, the interdisciplinary focus of research, has perceived households as a dynamic, fluid, plural, institution with its distinctive temporal and spatial element. The given paper, is an attempt to essay their varied epistemic and conceptual dimensions as a significant point of analysis. The write up is methodologically based on meta-analysis of a pool of secondary literature, both theoretical as well as conceptual on the varied aspects of household research. It is layered in different sections. At first, a basic conceptual analysis of household is given. Followed by it, comes the narrative of how household as an institution is distinct from family as a unit of study in the dominant discourse of social science. Then the varied theoretical constructsare given and finally a summation of the pertinence of household study are put forth. In a nutshell the paper is an attempt to portray how household as an analytical, empirical, and theoretical construct has become a pertinent unit of interdisciplinary research over the recent decades.

* Faculty, Department of Women Studies, Lady Brabourne College (Kolkata), West Bengal. And Guest Lecturer, Department of Human Development, University of Calcutta. e-mail: malinee.mukherjee@gmail.com

Key Words: Household, Social Science, Family, Social Institution.

Introduction: Household, as an analytical, empirical, and theoretical construct has become a pertinent unit of research over the recent decades. With the popularity of Becker's New Home Economics Model, household was conceived as a homogenous, unilinear entity and a primary unit of consumption. However, the given singular conceptualisation of households was not only limited in its aim and scope, but also gender blind and westernised. For exploring the myriad affective, kinship, cultural as well as politico, gendered, and economic elements of the intra and inter familial dynamics, multiple studies were later made across the realms of social science. Today, the interdisciplinary focus of research, has perceived households as a dynamic, fluid, plural, institution with its distinctive temporal and spatial element.

The given paper, is an attempt to essay the varied epistemic and conceptual dimensions of households with their key derivatives as a significantpoint of analysis.The write up is methodologically based on meta-analysis of a pool of secondary literature, both theoretical as well as policy oriented on the varied dimensions of household research. It is layered in different sections. At first, a basic conceptual analysis of household is given. Followed by it, comes the narrative of how household as an institution is distinct from family as a unit of study in the dominant discourse of social science. Then the varied theoretical constructs on households are given and finally a summation of the pertinence of household study are put forth.

Conceptualising Household: Households are believed, to be the fundamental unit of social organisation, across histories and cultures, bestowing every individual with their unique identity, roles, responsibilities and creating a collective community cohesiveness over time. Decades of research in social science have explored the significance of studying

householdas a gateway for exploring the broader canvas of social science research. Before we get into the varied nuances of household, a brief definitional overview of households are given forth.

United Nations (UN) World Population Housing Census has defined household as "persons living together who make common provision for food and other essentials for living" (United Nations, 2020). Household is distinct from all other social institutions on the ground that all its activities are organized through the intimate relations of marriage, parenthood, and kinship. They are defined as social and economic units consisting of one or more individuals, whether they are related by blood, marriage or not, those who live together and share both the 'pots' and 'roof' that is dwelling and food (Anthony, 2010). While the sociologists and anthropologists used the definition of members related through blood and marriage constituting a hearth group (common kitchen) as a household (family based on common residence which is different from other extended familial relationships without a common hearth), the Census of India and National Sample Survey Organisation have presently adopted a definition of household which is based on the criterion of group of members using a common hearth but not necessarily related by blood, kinship rulesand marriage. For the purpose of these surveys, household is a technical economic unit/category. According to the **Census of India** (2011), "A 'household' is usually a group of persons who normally live together and take their meals from a common kitchen unless the exigencies of work prevent any of them from doing so. Persons in a household may be related or unrelated or a mix of both. However, if a group of unrelated persons live in a house but do not take their meals from the common kitchen, then they are not constituent of a common household. Each such person was to be treated as a separate household. The important link in finding out whether it was a household or not was through the presence of common kitchen. There may be one member households, two member households or multi

member households" (Censusof India, Ministry of Home Affairs, Government of India,2011).

Households as Distinct from Families as Social Institutions : Household and Family forms the two very vital elements of social science research. Often used interchangeably, however, as research on these institutions unfolded, with their everchanging dynamics, the necessity to distinguish between 'family' and 'household' was felt. It was realized that a family do not necessarily consist of only one household, but of two or multiple ones. Members of each household may have separate residence yet may belong to same family and have familial bonding and accountabilities. Delineating the differences between household and family has been one of the major engagements of family studies in India. It is more apt to take 'household'as the unit of analysis to understand Indian social structure in the domain of field based empirical research

Household according to field-based scholars may be structurally similar or different from family. Family according to them "...is a grouping of households of a gnatically related men, their wives and unmarried sisters and daughters" (Shah, 1976; Uberoi, 1993). Thus, the focal object of study should be the household dimension of family rather than family itself (Uberoi,2001).It was opined thatit is much more than a mere physical and consumption unit. It 'represents a variety of things, ideas and images, and is a locus of social relationships with some of the deepest sentiments and emotions in human life' (Shah 1988, Patel 2005). There are a multiplicity of household and family types instead of just the stereotyped ideal of joint and nuclear family types (Patel,2005).

It is further posited that the intra household relationships among the family members forms a vital ground of household and family research. Researchers argued that even if households are compositionally and residentially nuclear, often they are actively joint with other households forming an emotional, economic, and physical network of family. Thus, the

commonly held notion of breakdown of joint family due to modernization and industrialisation is not an absolute truth, as the kinship bond remains undivided for most of the population in India. The changes in family that are taking place is more complex and vivid than a simple move towards nuclear family with the erosion of traditional values. Scholars argued that it is the joint household and not the joint family that is disintegrating. Several empirical studies pointed out that even after complete separation in property, income, and residence the mutual obligations and bonding between the members of the family continue to exist in a number of cases. This is actively manifested through fulfilment of responsibility of taking care of aging members of the family, supporting each other during financial and other crisis and times of need, participating in marriage and other ceremonies, and maintaining relationships up to three or four generations deep. Thus, scholars made the crucial point that decline in the size of the household cannot be inferred as breakdown of the family. Common residence, they held, was only one way of the manifestations of familial bonding which can exist without joint property and residence (Kolenda, 1987; Patel, 2005; Shah, 1973).

Household as a Theoretical Construct : The Household has been a subject of extensive academic enquiry across disciplines. It is distinct from all other social institutions on the ground that all its activities are organized through the intimate relations of marriage, parenthood, and kinship. There happen to be multiple epistemological frameworks on the study of household, across different disciplinary domain like Sociology, Anthropology, Economics, Demography, and the interdisciplinary domain of Gender Studies. These varied schools of thoughts offer distinct insights into the inter and intra relationship, kinship, power dynamics, production, reproduction, and consumption aspect of household along with the bargaining power, resource allocation, decision making, and roles and accountabilities of household members. Of the varied epistemic backdrop, some of the very pertinent ones briefed below.

One of the most influential theoretical frameworks for understanding the utility maximization and rational choice making in household comes from **The New Home Economics** Theory pioneered by Gary Becker (1991). Households, according to Beckerian model are defined as production units ("small factories") that produce commodities, both tangible and intangible like preparing meals, childcare, eldercare, housekeeping, nursing, companionship etc. These involve division of labour within the household, and input of time, skill, monetary and other market resources. Household as an unit carries both productive and reproductive activities.The New Home Economics (Becker, 1991) provides a powerful framework for understanding key decisions like marriage, fertility, consumption patterns, resource allocation. It is based on the ideology of Utility Maximization. For instance, if one spouse earns a higher market wage, they might specialize in market work, while the other specializes in home production. However, critiques have severely rebuffed this rationality as it oversimplifies complex social and emotional dynamics, and creates power hegemony and regenerates gender role stereotypes.

The Functionalist Sociological perspectives offer a more nuanced understanding of household as an institution performing fundamental functions for society, ranging from socialization of children, to emotional gratification, to economic support for its members. Households, according to Functionalism are embedded within the societal norms, roles distribution, and most importantly within gender and power relations. Talcott Parsons' (2023) concept of the "nuclear family" as the ideal functional unit for modern industrial societies is based on this perspective, pivoting the mutually complementary roles of instrumental (male breadwinner) and expressive (female homemaker) duties of both genders. While the functionalist school of thoughts on householdis significant in accentuating the societal contributions of households, it has however been criticized for its conservative rigid gender role stereotypes, overshadowing the fluidity and nuances of intra and interhousehold functions and structures.

The prolific discourse on the **Sociology and Geography of Household Space** forms another interesting genre of Household study that defines the political, anthropological, relational, and socio-cultural significance of space, more than just a physical entity. Key insights on household space can be borrowed from Pierre Bourdieu's theorisation on Social Habitus (Bourdieu,2005).

The **Marxian (**1879**)** school of thoughts has viewed household as grounds of class conflict, where the male members are the providers, with command over money, resources, and its concomitant power supremacy, whereas women are engaged in nurturing roles with a dependency stat-ure. Engels (1988) perspective of viewing Man as Bourgeois and wife as proletariat asserts the gendered class hegemony in household. Marxian's notion of women's reserve army of labour and Surplus labour has been polemically discoursed by the notion of Capitalist Patriarchy in the ambit of unpaid home-based labour.

The other very notable theory of household Research happens to be the **Conflict Theory**, that focuses on power struggles, hegemony, and inequalities within households, often rooted along the axis of class, gen-der, age and kinship. Several Gender and Feminist theories have been instrumental in exposing how patriarchal structures within the domestic boundaries can perpetuate gender imbalance. Sylvia Walby's (1989) con-cept of private and public patriarchy has vividly expropriated the multiple dimensions of patriarchal operations taking place in the mutuality of pri-vate and public space. Conflict theorists argue that decisions within house-holds are not always consensual but are often determined by who holdmore resources or power. Intra household issues like domestic violence, un-equal distribution of housework, son preferences and multiple other forms of gender-based hierarchy are aptly explained by the Conflict Theory. However, some critiques suggest that conflict theory over emphasise on power equations potentially overlooking cooperation and solidarity within

households.

Anthropological school of thoughts contribute a cross-cultural lens, demonstrating the incredible diversity of household structures and practices across different societies. **Descent theory** and **Alliance theory**, for instance, depicts how kinship systems shape household patterns and rules of residence and inheritance. While descent theory focuses on tracing lineage through either the male or female line (patrilineal or matrilineal), alliance theory examines how marriage creates alliances between different kin groups, influencing the composition and dynamics of households. These theories highlight the cultural embeddedness of household forms and challenge universalistic assumptions about family structures. Their strength lies in their ability to contextualize household behaviour within broader social and cultural systems, though they may sometimes be less adroit at explaining internal household dynamics beyond kinship rules.

The **household life cycle model** focus on the life course perspective of households, analysing how their composition changes over time due to a family's natural developmental cycle governed by events like marriage, divorce, births, deaths, and migration. This model posits that households typically progress through stages, from formation to expansion, contraction, and dissolution. This framework is very pertinent in understanding household consumption patterns, housing demands, and needs at different stages of life. While offering a useful descriptive framework, this life cycle model can sometimes be deterministic, not fully accounting for individual agency or the increasing diversity of household trajectories in modern societies.

Apart from the given major discourses on Household scholarship, the following are some of the significant constructs of household posited by some distinguished theoreticians belonging to the given schools of thoughts.

Naila Kabeer (1995), a noted Development Economists explains house-

holds as primarily family-based collectivity, concerned with the generational and daily reproduction (sleeping, rest, eating) of its membership. The household economy refers to those value creating activities by which this reproduction is assured and built upon. It encompasses the production of values for use and exchange through a variety of means like wage labour, market, and own production, as well as network. Kabeer (1995) expands the meaning of Household as grounds of **"Double Specification'.** The notion of double specification means where on one hand the boundaries of households are shaped by the specific cultural contexts at the local level and on the wider level at the extra-household environment with the broader set of opportunities and constraints.

Nancy Folbre (2002), the celebrated Feminist Economist, perceives the moral and political economy of household as one based on the relative bargaining power of its members and rejects the notion of pure altruism. She adds that Micro socio-economic analysis of the household must be situated within larger structural analysis of gender and age-based inequalities and their interaction with class structure and national position within the world capitalist system.

Amartya Sen's (1987), (Nobel Lauriteand Development economist) theorization of Households as units of 'Co-operative conflict' is based on the integrated notions of well-being, agency, entitlement, extended entitlement, perceived interest, perceived contribution, and fallback position. To quote Sen (1987), there are two types of problems that household confronts. One of co-operation (that is adding the totality of resources) and the other involving conflict (dividing the SumTotal of all resources among the household members). The combined arrangement of co-operation and conflict determines the varied power dynamics within the household. A household happens to be a site of both productive and reproductive activities. Sen, uses the term 'social technology' to designate multiple reproductive activities of household like food preparation, child-care, eld-

erly care etc. With an integrated view of the household, he emphasizes the importance of perception (Perceived interests, perceived contribution), in determining the 'break down position and bargaining power of women'. perception women's contribution, claims and fragility of women.

Heidi Hartmann (1981), the very distinguished Socialist Economist perceives families and households as the locus of gender, class, and political struggle. Hartmann (1981), has vividly critiqued women's unpaid domestic work termed specifically as housework, as the base of capitalist patriarchal structure. Hartmann has analysed the persistence and resilience of family forms amid varied social change.

Maria Mies (1982), another key Gender Anthropologist has coined the term 'Housewifization' of women's labour in respect to the private space of household. How the domestication of home-based labour is an inter play of market politics along with the embedded patriarchal psyche, forms the key theme of Mies's theorization of household and Household centric labour. Socialist Feminist like Delphy (1980) has given a materialistic feminist account of expropriation of women's labour by men (husbands) in the household. Housewives, thereby are conceptualised as the producing class and husbands as the expropriating class.

Conclusion: While summing up it needs to be pointed out that the given write up has essayed on the very concept of household as a veritable ground of knowledge production. By delineating the differences between family and household, the significance of the conceptual distinctiveness of household has been aptly highlighted. Household as a site of extensive academic enquiry, is now perceived as more than a fixed social entity with unified interest. Summing up from myriad disciplines of economics to sociology, to anthropology, to gender studies, the varied epistemic intervention on household has shown that it is a dynamic, fluid agent that keeps on changing with its concomitant social forces like economic change, modernization, along with natural developmental cycle of family. To sum

up while mapping through the varied discursive take on household, it needs to be seen as a locus of struggle set within the boundaries of kinship and intimacy, as a location of production, consumption, and redistribution, as a space of 'co-operative conflict', of 'Double Specification' and last but never the least, a site of politico moral economy that is shaped by the interplay of patriarchy and capitalism.

References

Becker GS. (1991) *ATreatise on the Family.* Cambridge, Harvard University Press.

Bourdieu, P. (2005). *The social structures of the economy.* (C. Turner, Trans.). Cambridge: Polity Press.

Census of India, 2011. https://www.cse.iitb.ac.in/~sohoni/TD603/2001metadata.pdf

Delphy, C. (1980) 'For A Materialist Feminism' pp 198 in Marks, E. and De Courtivron, Isabelle. *New French Feminism: An Anthology* Massachusettes: University of Mass Press.

Engels Frederick (1988) Engels on The Origin and Evolution of The Family, pp 710 *Population and Development Review,* Retrieved from DOI: 10.2307/1973630 https://www.jstor.com/stable/1973630

Giddens Anthony. (2010). Sociology. Cambridge: Polity Press.

Hartmann I. Heidi (1981) The Family as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework *Signs* Vol. 6, No. 3, pp. 369-370 Published by: The University of Chicago Press , 1981, https://www.jstor.org/stable/3173752

Kabeer Naila (1995), 'Benevolent Dictators, Maternal Altruists and Patriarchal Contracts : Gender and Household Economics', pp 95-110, in *Reversed Realities- Gender Hierarchies in Development Thought,* New Delhi, Kali for Women.

Kolenda,P.(1987).*RegionalDifferencesinFamilyStructureinIndia.*Jaipur: Rawat Publications.

Marx, K. (1879) Marginal notes to A. Wagner's *Textbook on Political Economy*. In *Value: Studies by Karl Marx*, trans. and ed. A. Dragstedt, London: New Park Publications, 1976; New York: Labour Publications. Google Scholar

Mies, Maria (1982) The Lace maker of Narsapur: Indian Housewives Produce for the World Market, Zed Press.

Nancy, Folbre (2002) *The Invisible Heart: Economics and Family Values,* The New Press, New York.

Parsons' Talcott (2023). *Functionalist View on the Nuclear Family.* Edu birdie. Retrieved June 16, 2025, from https://hub.edubirdie.com/examples/talcott-parsons-functionalist-view-on-the-nuclear-family-critical-essay/

Patel, Tulsi. (Ed). (2005). *The Family in India: Structure and Practice*. New Delhi: Sage Publications.

Sen, Amartya. (1987). 'Gender and Cooperative Conflict'. *Working Paper Wider.* WP 18.

Shah, A.M. (1968). 'Changes in the Indian family: an examination of some assumptions'. *Economic and Political Weekly*. 3(1/2), 127-134.

Shah,A.M.(1976).*TheHouseholdDimensionofFamilyinIndia*.Delhi: Orient Longman.

Shah, A.M. (1988). *The Family in India: Critical Essays*. New Delhi: OrientLongman.

Uberoi, Patricia (Ed). (1993). *Family, Kinship and Marriage in India.* Delhi: OUP.

Uberoi, Patricia. (2001). 'The family in India'. In Veena Das (Ed.). *OxfordHandbook of Indian Sociology*(275-307). Delhi: Oxford University Press.

United Nations, 2020. https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/

Walby, S 1989, 'Theorising Patriarchy', Sociology, vol. 23, no. 2, Basil Blackwell Ltd.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Duty Rights and Gandhiji: A Critical Study

Bapi Mondal*

Abstract: This paper critically explores Mahatma Gandhi's perspective on the intricate relationship between duty and rights, emphasizing his conviction that duties are the foundation upon which true rights emerge. Influenced by the Bhagavad Gita's doctrine of *Nishkama Karma* (selfless action). Gandhi's views on duty as an ethical imperative grounded in self-discipline, social interdependence, and moral responsibility. The paper examines how Gandhi's doctrine of Satyagraha— a blend of truth, non-violence, and self-suffering— redefines the concept of rights not as entitlements but as consequences of moral and spiritual growth. Rights, in Gandhi's view, are meaningful only when pursued in harmony with duties and used for social good. This paper also evaluates the continued relevance of Gandhi's thoughts in contemporary society, particularly in education, citizenship, and socio-political reform, suggesting that his ethical framework offers a powerful guide for building a just, disciplined, and spiritually awakened society.

Introduction

Mahatma Gandhi, one of the most influential thinkers and reformers of modern India, offered a profound moral and philosophical framework that

* Assistant Professor, Department of Philosophy, Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia. e-mail : mondal0103@gmail.com

emphasized the primacy of duty over rights. His views, shaped by deep engagement with Indian spiritual traditions—especially the Bhagavad Gita—and real-life experiences, challenge the modern liberal discourse that often prioritizes rights as the foundation of justice and social order. For Gandhi, the true source of rights lies in the conscientious performance of duties. He believed that when individuals sincerely fulfill their moral obligations towards themselves, their families, and society, rights naturally follow, just as spring follows winter.

Gandhi's emphasis on duty stems from his belief in the interconnectedness of all human beings. As social beings, we live in mutual dependence; thus, our duties toward others become the cornerstone of our moral life. His idea is not rooted in compulsion but in self-awareness and self-discipline. Inspired by the principle of *Nishkama Karma*—selfless action without attachment to results—Gandhi insists that duty must be performed not for personal gain but as a moral obligation.

Gandhiji's view on the concept of Duty

Duty for Gandhiji is moral obligation, which cannot be denied. Moreover he emphasized on duty than rights. As he says, "I suggest the right way. Begun with a charter of the Duties of man, and I promise the rights will follow as spring follows winter. I write from experience. As a young man, I began life by seeking to assert my rights and soon discovered I had none-not even over my wife. So, I began by discovering and performing my duty to my wife, my children, friends, companions and society, and I find today that I have greater rights, perhaps, than any living man I knew. If this is too tall a claim, then I say I do not know anyone who possesses greater rights than I".(Gandhi to H.G Wells. Harijan 13 october 1940)

Mahatma Gandhi, the social reformer, concentrated more on duty than rights in his social activities. He was not only a social reformer but also a freedom fighter. He always told all Indians to be concerned about their duties. As he says, "The true source of rights is duty. If we all dis-

charge our duties, rights will not be far to seek … The more we pursue, the farther will they fly."[2]For Gandhi, right and duty are two sides of a coin, which are co-related and inseparable. If we have a duty, then we must have a right.

Gandhiji says that rights follow duties. The claim of Rights without the performance of Duties is nothing but an indication of might. Rights consist of the performance of duties as a human being. One has to actdispassionately. In the true sense, action as a being connects one to the whole. It is to act not with a selfish motive but with a holistic vision. In other words, his vision is like the concept of *Naiskarm*ya (Niskamakama) of the Bhagavad Gita. 'real rights as a result of performance of duty'. Rights are derived from duties. Nishkama karma is the essence of life, by which duties are to be performed as one's pre-destined duty. Since all human activity is triggered by thoughts and desires that aim at prospective rewards in the future, Gita urges man to eschew any such thing, as it only leads to karma that may bear fruits in the future. As bearing fruits lead to karma and rebirths, the only solution is to perform karma without consideration of any fruit. A man who does all his dutiesdisinterestedly is called a *Stithtaprajna*. Gandhiji's concept of rights and duties is based on the true nature of human beings. We all have bodies and souls. By nature, we are social beings. As he writes, "Man is not born to live in isolation but is essentially a social animal independent and interdependent." So, from this, it follows that, since we all are independent and live for each other, we must perform our duties to sustain that interconnectedness.

Here his mentioned duty is not only for a small group but a duty for a large number of people. By performing his duty, the individual not only fulfils his need but also solves some purpose of the community. Individual action is here to be judged from a holistic perspective. While performing one's duty, one must remember that her duty performance should not bring any damage to the community. Here lies the idea of nationality. For

Gandhiji, nationality is not only a self- verdict but also a self-direction for the individual. So, the development of an individualistic approach leads to the development of the community. Or in other words, collective development comes through the individualist approach. So, in this context self - development is the first attempt of the individual. If there a self-development within, then the same will reflect on the outside. Therefore, Gandhi gives much importance to self-development. Development of internal is much more important in our life and living. Because of the way we think, we act accordingly. So, to act or perform our duties is decided by our thought process, i.e., how we think we act accordingly. Hence the internal development of our consciousness is the primary source of our life. As Gandhi writes, "Begin with a charter of Duties of Men…and I promise the rights will follow as spring follows winter. I write from experience. As a young man, I began life by seeking to assert my rights, and I soon discovered I had none, not even over my wife. So, I began by discovering performing my duty by my wife, my children, friends, companions and society, and I find today that I have greater rights, perhaps than any living man I know."[3] Therefore, to be human, one must righteously perform his duty. To fulfill his different needs, he has to perform his duties.

But the question is, why should we be careful about our duty and rights? One of the essential reasons is that he holds us as a part of it is better to say as a member of this nature, deliberately, we owe to the cosmos. We are born in particular surroundings where we endure our advantages and disadvantages. We live with our parents and teachers, where inherently, we are obedient to them. For Gandhiji the positive aspects of the obligation to parents and teachersare to carry an identity, our posh nature, and communication with others. Gandhiji firmly holds that we owe others our entire life but can never entirely repay. Being a human is not possible ever. Only one thing can be done: try to obey our duty as much as possible. It was stated to him that "man is a social being. Without

interrelation with society, he cannot realize his oneness with the universe. His social interdependence enables him to test his faith and prove himself on reality's touchstone. If man were so placed or could so place himself as to be absolutely above all dependence on his fellow beings, he would become so proud and arrogant as to be a veritable burden and nuisance to the world"[4] The bodily existence justifies right. The rights come with natural ethics through its spiritual aspect because man consists of body, senses, mind, intelligence, and spiritual power.

Gandhiji's Concept of Rights

On the other hand, rights are those necessary conditions of social life without which no person can generally realize his best self. Rights are to be exercised by the people for their uplift and development, which mean their elevation in society by promoting social good. Rights can never be exercised against social good at all. Laki says that our rights are "those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best".[5]

For Gandhi, rights are the basic products of social living. And rights only can be used in society. Rights have behind them the recognition of society as common claims for enrichment, which is why the state protects these rights. The famous western philosopher in the modern period John Locke insists that people have rights, such as the right to life, liberty, and property that have a foundation independent of the laws of any particular society.

Gandhiji was very much concerned about the right and as well as about duty. Due to that, his contribution to political philosophy is – Satyagraha,which is meant to be a new theory of rights. Passive resistance, a similar word to Satyagraha, is a method of securing rights by personal suffering; and is the reverse of resistance by arms.

Gandhiji holds that Satyagraha is a theory through which one be-

longs and practices moral growth, which supports the ability to seek the truth to deal with situations. A Satyagrahi, according to Gandhiji, sets as his goal the pursuit of truth for himself and those around him.

For having one's right, the true practice of Satyagraha demands hard work and the adaptation of a lifestyle which merely based on simplicity and self-abnegation, which is well designed to cultivate moral and psychological courage, fearlessness in the face of evil and violent opposition, and a complete detachment from the result of one's action. He felt Satyagraha not in terms of the right to resist but in terms of perpetrating a duty to resist perceived wrong.

In his autobiography, Gandhiji describes a Satyagrahi – "A Satyagrahi obeys the laws of society intelligent and his own free will because he considers it to be his sacred duty to do so. It is only when a person has thus obeyed the laws of society scrupulously then he is in a position to judge as iniquitous. Only then does the right accrue to him of the civil disobedience of certain laws in well–defined circumstances. My error lay in my failure to observe this necessary limitation".[6] Satyagraha is a new way of life where truth and non-violencearetied up. But only through the truth ofnon-violence alonecan nobodyrealize the universe or himself. Gandhiji has provided a new word for this new way of life. Satyagraha is a compound of two words, Satya (truth), which indicates existence, and agraha (insistence or adherence). Both of these two make a new way of life.

Gandhiji called satyagraha a science and art of life. He states that he is the author of satyagraha, and in his writing he has expressed that he was evolving that new way by living it and preaching it. He never claimed that the evolution of satyagraha was ever complete;instead, the development of satyagraha or liked with human evolution itself. For him, satyagraha is an increasing inquiry for truth and identification with it; it is a search through non–violence, and searches to be set up also through non–vio-

lence or love because there cannot be any identification without love or feeling of oneness. When found, it cannot be forced on others by violence. Satyagraha, Gandhi wrote in Hind Swaraj, 'bless him who uses it and him against it is used.'

The practice of Satyagraha is maintaining a solid grasp on Satya or God. Gandhiji's word is 'God is truth and Truth is God'. Self-control and ahimsa, which is spiritual energy. As he says – the word Satya (truth) is derived from sat, which means being. And nothing is or exists in reality except truth. That is why sat or truth is perhaps the most important name of God. It is more correct to say that truth is God than to say that God is truth… it will be realized that sat or Satya is the only correct and fully significant name for God. Gandhiji defines Satyagraha as 'truth force' and 'love force' or, more perfectly, 'soul force.' On Gandhiji's account, God is a living force; as we know, our life is full of force.

To find the truth is only a sign of beginning is to understand the truth; to experience the truth and express or establish it is the primary function of satyagraha. For him, satyagraha is an experiment to introduce truth and non–violence into political conduct. According to him though the truth is absolute, our knowledge and experience of realityare partial because whatever seems true to us may be untrueto others. He says, "In the application of satyagraha, I discovered that in the earliest stages that pursuit of truth did not admit of violence being inflicted on one's opponent, but that he must be weaned from error by patience and sympathy. For what appears to be true to one may appear false to the other."[7]

A Comparison between Gandhiji's Concept of Duty and Rights

It is being stated by Thomas Paine that – A declaration of rights is, by reciprocity, a declaration of duties also. Whatever is my right as a man is also the right of another, and it becomes my duty to guarantee and possess. In this regard, it is essential to observe that the idea of duty is interior to Gandhiji's thought, where he concentrated more on duty than

rights.Instead, it can be said it is on duty as the source of right. Similarly, it says, "When I say that the knowledge of there is not enough to enable a man to effect any appreciable or lasting improvement, I do not ask you to renounce these rights; I only say that they cannot exist except as a consequence of duties fulfilled and that one must begin with the latter in order to arrive at the former."[8] And, "[T]he very right to live accrues to us only when we do the duty of citizenship of the world. From this one fundamental statement, perhaps it is easy to define the duties of man and woman and correlate every right to some corresponding duty to be first performed. Every other right can be shown to be usurpation hardly worth fighting for."[9]

For Gandhiji, the term 'right' indicates a property which is personal orientation, which tells about our authority, our ownership. Sometimes it may be for individuals and sometimes for the community. But the term 'duty' goes through ethics and speaks about morality. It is based upon our ethical activity and deals with righteousness. Gandhiji assumes that duty always says to obedience which we use to give honor to others and we worship others. Ostensibly performing a duty means giving importance to others through which we build our character, or we may say if we rightly perform our duty, we do not bother about our rights. Gandhiji's account of duty teachesrenunciation and sacrifice as well.

Relevance of Gandhiji'sConceptof duty in Practical Life and Living

To adopt the moral means for the realization of the ultimate end of life, Gandhiji felt that the individual in the first instance is required to purify himself. According to him, self-purification needs adherence to these five moral vows, such as *Satya, ahimsa, brahmacharya, asteya, and aparigraha* by the individual in his life. Satya, the first vow, is similar to God is acquainted as *Saccidananda.* According to Gandhiji, acting ahimsa or non-violencecouldavoid injuring others in this world in thought, deed, and word. To be non-violent is to have benevolence or love for the whole

creation and humanity, even the evil-doer. *Brahmacarya* is the complete control over the feelings for the realization of truth. By the practice of *brahmacharya,* one would be the doer of self-less and would induce him to love the man-kind and serve it without distraction. The remaining two vows are -*Asteya* is not to steal anything, and *Aparigraha* is non – possession.

So, for him, by practicing these five vows, people would lead a disciplined moral life, purify theirsouls, and strive in thoughts, words, and deeds to feel his ultimate goal.

The human society for Gandhi is confederate; byevery individual, a large organization is made where many tyrants and the tormented are there. To secure justice and destroy oppression is the duty of all satyagraha. Satyagraha is a method of non–violence, direct against injustice. According to him, the term satyagraha phonetically means firm devotion to truth. It is similar tothe concept of justice which represents the fullness of the values of non–violence, freedom, and equality. Satyagraha expounds a solid adherence to these values in interpersonal relationships onthe socio-politicalbattlefield. Satyagraha is formulated by non–violence, meaning thereby, the term non–violence is an essential quality for being a satyagrahi. Fearlessness or being courageous is also an important quality for a satyagrahi. Then Satyagraha, in terms of the Gandhian way, teaches that evil-doers must be conquered with love and utmost respect. The ambition of a satyagrahi is to change the evil–doer to the cause of justice through inspiration and a constant appeal to his head and heart.

Gandhiji believes that the aim of education is not sheer earning degrees or getting a job; instead as he thinks its purpose should be to build character and groom good citizens. But the present situation goes differently; instead of becoming human, people are unemployed, and corruption is ruling in the education field. The sole purpose of education should not be to get a higher degree and a job. Instead, the youth should grasp

the Indian culture and values and contribute the society accordingly.

Gandhiji was very fond of a simple life where he never asked for luxurious furniture and everything in his entire life, but now, people are addicted to drugs, wine, etc. Suchpeople always lose their status in society and their families; more perfectly, they used to live an in disciplined life in society andtheir own families. Here one thing can be argued that if people listen to Gandhiji's voice and lead an everyday life, their lives will be effortless.

Thus, Gandhiji's ideals of ethical values in the society in the state reconcile the goal of spiritual improvement of the individual with his obligation to social and political life. That is why it seems most relevant and essential for forming and establishing a just political society by awakening the individuals and making them conscious of their true selves and humanizing and socializing them in spiritual and moral values.

Conclusion

Mahatma Gandhi's philosophy of duty and rights offers a profound moral vision that transcends conventional political and legal frameworks. By placing duty at the centre of human life, Gandhi reorients the discourse from entitlement to responsibility, from selfish claims to selfless action. For him, rights are not inherent privileges to be demanded, but the natural outcome of the sincere performance of one's duties. His deep belief in *Nishkama Karma*—action without desire for reward—and the practice of *Satyagraha*—truth-force rooted in non-violence and love—forms the ethical foundation of this vision.

Gandhi's understanding of human beings as socially interdependent and spiritually grounded reinforces the idea that true freedom and justice cannot be attained without moral self-discipline and inner transformation. Through this lens, duty becomes not a burden but a means to personal and collective upliftment. His views remain especially relevant in today's

world, where rights are often emphasized without a corresponding sense of moral obligation, leading to social fragmentation, injustice, and spiritual emptiness.

In a time when ethical crises dominate personal, social, and political life, Gandhiji's integration of spiritual discipline, social responsibility, and political action provides a much-needed framework for reimagining citizenship, governance, and human development. His thought reminds us that the path to a just and harmonious society begins not with the assertion of rights, but with the mindful performance of duties — a timeless lesson rooted in compassion, truth, and the moral unity of all beings.

Reference

1. Gandhi M, *Young India*, New Delhi, 8th January, 1925
2. https://www.civilserviceindia.com/subject/Political-Science/notes/rights-meaning-and-theories.html
3. https://www.mkgandhi.org/autobio/chap157.htm.
4. https://www.mkgandhi-sarvodaya.org/articles/ramanand.htm.
5. M.K. Gandhi, *The Collected Works of Mahatma Gandhi*(*CWMG*), New Delhi: {publication Division, ministry of Information and Broadcasting, 1958-1994, 43:370.
6. Mazzini Joseph, *The duties of man,*Everyman's library, London, 1929, pp 16.18.
7. Ray B N, *Reading Gandhi*, Authors press, New Delhi, 2008, p 198.
8. *The collected works of Mahatma* Gandhi, (*CWMG*), New Delhi: Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, 1958-1994, 71:430.
9. *The collected works of Mahatma* Gandhi, (*CWMG*), New Delhi: Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, 1958-1994, 71:430

Language Absorbing Caste Prejudice: A Study of Select Languages of India

Sujit Malick *

Abstract: India is a land of diversity; it is, surprisingly enough, as per the recent census in 2011, more than 19500 languages or dialects are spoken in India as mother tongues among the 121 core population. However, many of the Indian languages perpetuate the propaganda of the ruling class and bear the insignia of the upper caste in India. Sociolinguists often deduce that language is imbued with culture; it is true, but it also promotes the propaganda of the ruling class in India, often represented by the upper caste. Thus, in my paper, I explored the perception of Indian select languages like Bengali and Hindi, which are influenced by stereotypes, and awareness may be gained from the paper that will help to break the stereotype and minimise the prejudice.

Keywords: language, propaganda, caste , perception, stereotype.

Anthropologist Branislav Malinowski observes that language functions as a link in a concerted human activity, as a piece of human behaviour,and asa mode of action not an instrument of reflection. But link between language and caste is immediately apparent, depending upon the various diverse features.Interestingly, the definition of nation is problematic in

* Assistant Professor, Department of English, TDB College, Raniganj, West Bengal. e-mail: sujitmalick2014@gmail.com

multinational and post – colonial state which is further complicated the nationalist discourse which is based on the rhetoric and founded on the rocks of the caste system. India is the land of diversity; it is surprisingly enough, as per the recent census in 2011, more than 19500 languages or dialects are spoken in India as mother tongues among 121 core population. In 1889, G.A.Grierson, renowned philologist, intensively surveyed on Indian languages for the first time ever. Diligent survey of Grierson came out in 1903 in 19 volumes, comprising 800 pages, that included 179 languages and 544 dialects. But after this complete and comprehensive survey, no institute or individual hasconducted anysurvey so far. Ganesh Devy who individually undertook a The People's Linguistic Survey of India (PLSI), a single-minded ambition thatengaged almost 4000 volunteers withan aim of scrutinizing every detail of each language ofIndia. The deadline of submission of the report that Prof. Devy set in this project was 2020; he has already published 37volumes.Interestingly, he did not appoint a single linguist or academic rather he engaged labour driver,farmer, maid and other non-academicpeople, and trained them in a way to illicit the details of oral and written forms. US linguist, David Harrison of Swrathmore College, describes India as the land of diversity of languages, but it lacks proper documentation.India, as discussed above, is treated as the hotspot of language diversity and the Indian Constitution enshrines and promotes the language diversification with constitutional provision in the dedicated schedule for language, that is EightSchedule. It includes article 344(1) and 351 of the Constitution.

"Article 344(1) envisages that the President of India wouldappoint Chairman of commission and other members for ten years and make recommendation to the president" (Basu 315)

Article 351 captures the true spirit of language diversity, which promulgates that it is the duty of the Union to uphold value of the Hindi language in such a way that it shall accommodate various elements of the

composite culture of India and ensure the enrichment without distorting the uniqueness, forms, style and expression. At the beginning 14 languages were included in the Eight Schedule; Sindhi was added in 1967. In 1992 three more languages viz, Konkani, Manipuri and Nepali included in the list. Bodo, Dogri, Maithili, Santhali were added in 2004. It is quite interesting that 38 more languages are in a row to be accommodated in the Eight Schedule.

M.A.K. Halliday, a noted sociolinguistic, holds an opinion that there is astrong link between language and the social context. Due to wide variety of language and dialect, many of Indian languages perpetuate the propaganda of ruling class and bear the insignia of upper caste in India. sociolinguists often viewin the deduction that language is embossed with culture; it is true but it also promotes the propaganda and helps to sustain the ideology of the ruling class of India,often represented by the upper caste. Therefore,the praxis of caste is very important, here to discussand to consolidate the findings of my paper.The term 'caste' is derived from the Spanish word ' *caste*', meaning 'breed ' or linage'. Sanskrit appropriation of caste is '*varna* ' that means colour; since the Vedic era, Hindu society is categorized under four broad division of ' *Varna',* classifying from thehighest to the lowest. It starts from *Bramhins, Kshyatriyas ,* Vaisyas , and *Sudras* at the end . Since ancient period caste system has been playing a crucial role in every sphere of life and societal understanding.

"a Hindu hereditary class of socially equal persons, united in religion and usually following similar occupations, distinguished from other caste in the hierarchy by its relative degree of purity and pollution." (Prasad 3)

The highest caste of thesocial order is Brahmins, priestly class, and as per the Hindu mythology, they emerged from the mouth of God *Brahma;* they are there religiouspreachers.The origin of *Kshtriya* is supposed to be from the arms of Brahma, representing the warrior community while *Vaisyas* came from the thighs of *Brahma,* born to feed Brahman and

Kshtriya. *Sudras* are born from the feet of *Brahma,* belonging to the subordinate strata of previous community to serve the interest of them. Caste hierarchy is often perpetuated through language. R.A.Hudson views it in terms of socialinequality as Linguistic inequality as follows:

"Linguistic inequality can be seen as a cause (along with many factors of course) of social inequality, but also as a consequence of it, because language is one of the most importantmeans by which social inequality is perpetuated from generation to generation." (Hudson 205)

There are two types of linguistic inequalities pertaining to social disparities - Subjective Inequality and Linguistic Inequality. The Subjective inequality is a sort of prejudice that involves a way of speaking of individual who often believes about other person's abilities on the basis of how that individual articulate instead of examining his or her ability of conceiving the content of a given topic. for example, we often jump onto a conclusion that if an individual's accent is smarter, he or she belongs to the upper – strata of society. This deduction occursto due to an explanation of language-basedprejudice but there is still a gap between socialparameters." 'linguistic competence 'is linked with a person's linguistic knowledge, and community with an edge of knowledge of language" (Chomsky 79)

It produces inequality and tension between nation and caste; it happens due to the delineation of some major features of caste system: segmental division of society, hierarchy, restriction on feeding and social intercourse, civil andreligion disabilities and privileges of different section, lack of choice of occupation and restriction on marriage. The creed of the sociolinguistic could be traced since the inception of human civilization: language of the conqueror often became the hegemony of ruling class. For example, French happened to be the superior over English because of Norman Conquest; so, it happened in the case of Sanskrit language since Aryan settled in India almost 2000 years ago, and Sanskrit

became the medium of communication of ruler or priestly class. Most of the languages of India is derived from Indo- Aryan language group, and derivatives of Sanskrit language such Hindi Bengali, and even the languages from Dravidian group have been perpetuating or manipulating caste prejudice as we know language is one the important marker of culture. Sanskrit was deemed as the *lingua franca* and Prakrit, prose language, was treated as the language of lower class. People of lower caste even was not allowed to access to education.Therefore, through Sanskrit and its off shoot language, upper caste subjugated and humiliated so called oppressed class, "Caste is a form of social stratification in which individual`s status or position is determined" (Joseph 105)

HereI have attempted to explore how nuance of a few languages, such as, Sanskrit, Hindi, Bengali and Tamil, that demeaned and dehumanized *dalit* community, owing to the prejudice of so-called upper caste and this hasbeen permeated through language.Hence, we know the view ofthe dominant caste which is seeped into speech or written format of any text. A table is given below to show how Dalit people is being unconsciously forced to use distorted proper name, as they had no previous access to Sanskrit:

Sanskrit name	**Distorted in Bengali**	**Distorted in Hindi**	**Distorted in Malayalam**
Krishna	Kanai	Kishen	Kichen
Laxman	Lokha	Lakha	
Narayan	Naran		
Gobindan	Gobindo		Kovindan
Durga	Dugga		
Laxmi		Lachmi	Yechmi
Ganapati	Gana		

The table shows how *dali*t has been attributed with the distorted forms of Sanskritized names.Identity and social positionof dalitcommunity are often structured through the language they communicate, since The Laws of Manu (*manusmriti*)did not allow them to read Sanskrit. The New Shorter Oxford English Dictionary defines Caste position:

"Caste in as a Hindu hereditary class of socially equal person, united in religion and usually following similar occupation, distinguished from other caste hierarchy" (Brown 412)

In this dissertation, I would basically investigate afew proverbs and other usages of Bengali, oneof the schedulelanguages of India with more than 10 million speakers.Therefore, it is also treated as the marker of caste prejudice. For example, *bedertol*, (primary school of snake charmer) - this is one of the commonidioms of Bengali or Bangla language.*Bede*, a type of schedule caste or *dalit* community, is actually snake *charmar*community. The usage implies any chaotic situation in any place, showing howprejudice of language based on the caste stigmatizes the entire snake charmer community as a chaotic or indiscipline community because in Indian caste hierarchy they belong to the lower strata of the society.'*Jeman pacha kanthal, tamon muchi khadder'* which can be rendered in English as'rotten jack fruit is suitable for blacksmith customer only' which again indicates that bad individual deserves ill -treatment.But the bad individual, a negative concept, is aligned with the blacksmith community in general.So, the Bengali language bears the testimony of castediscrimination in this proverb as it treats the entire blacksmith community as bad entity which deserves ill-treatment. People around us often loosely apply such proverb rather they use it unconsciously but such unpremeditated backlash has been percolated from one generation to others.*Chandaler moto rag or ugra chandal* (asfurious as*Chandal*); fury or wrath, one of seven deadly sinshere becomes synonymous with *Chandal,*a *dalit* community in India.So the words such as violence,aggression insidiousness etc. are the

attribution of *dalit* community but the information released by the Crime Bureau is ironical yet interesting that more than 16000 odd crimes inflicted on *dalit* in recent past . West Bengal Board of Secondary Education prescribes a syllabus of Bengali at secondary level that contains a specific grammatical unit, included*bagdhara* (proverb) such *Kalur balad* (freelabor without payment), *Kalu,* oil monger community, and its bullock are signifier of free labour without payment; free labour here is associated with *kalu* , the oil monger , a backward community of India Or a popular idioms like *guruchandali dosh ,* we are more or less familiar it which means a queer amalgamation of *sadhu bhasa* (elegant Bengali) termed *guru* , a superior one , with *chandali* , *Chalit bhasa* (colloquial Bengali) . Therefore, such idiom explicitly promotes caste- backlash in the circle of so called progressive and *bhadrolok (gentleman)* Bengali and this immaculate Bengal has produced linguist like Sukumar Sen and Suniti Chatterjee but Bengali language absorbs caste prejudice in present century too. Idioms and phrasesare explained here,carrying out the legacyof casteprejudice, perpetuated through language, a potent tool of hegemony of upper class who manipulated culture in their favour. One day we were playing football at our community ground; one of our fellow players suddenly informed us that he was afraid of a particular player because of his so called black complexion who might be Santhal , a person with black complexion, short stature and so – called impressive look ,generally is called as *santhaler moto dekhte*, looking like santhal , a, tribal community of India.Bad look and Santhal are being essentialized which is highly biased in the praxis of caste and language, anew term has been coined “Castlect”:

“castles is an overt expression of the upper caste. It is speech variety that carries and represents the caste identity, featuring in a specific communication context. Theca sate system reflects social groupings of the Indian society, while “lect” refers to the dialectof idiolect.Thus, the

representationof individual through language can be stated as Castlect" (Girish 23)

Hindi, national language of India, with 32 odd million speakers; it basically originates from Sanskrit. Hindi catalogues various usages and idioms which explicitly contains expression of language prejudice; it holds a few beliefs that we hold on, without our awareness.*Chori chamari mat karna* , (do not steal like *chamar*), *chamar*, a blacksmith whom Indian Caste hierarchy treats as lower caste; in this idiom , the act or habit of stealing is associated with *chamar* or blacksmith. *Bhangi jaisa chal*, (style like that of *Bhangi*, a community who professionally collect sewage) Indecentstyle oretiquette is here equated with *Bhangi* community. So Hindi language expresses caste prejudice, treating a oppressed class as indecent, only on the basis that belong to the lower strata of the society. Proverb like *Kaha gangu teli kaqha raja Bhoj*, (don't equate oilmonger *Gangu* with King *Bhoj*.); it is told when an absurd comparison is hinted. But again, oilmonger community is being culturally subjugated through language. There are many examples strewn in Indian language, I have explored a few here to show how language being influenced by cultural hegemony perpetuated by the ruling class rather so-called upper caste.

Thus, I explored the perception of Indian select languages like Bengali and Hindi, whichare influenced bystereotypes, and awareness may be gained from the paper that will help to break the stereotype of language and will subsidise the prejudice by incorporating culturally shared ideas and creating examples that in future will change the perception of the dominant group and its people.

Works Cited:

Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis. 2015.

Brown, Lesley. The Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University Press .1994.

Chomsky, Noam. Aspect of Theory of Syntax,MIT Press .1965.

Girish, P.M . Castlect: A Critical Study of Language in India. 2003.

Hudson, R. A. Sociolinguistic. Cambridge University Press, 2017.

Joseph, Rattz. ProLINQ: Language Integrated Query. 2010.

Prasad, Chandra Bhan. Indian languages Carry the Legacy of Caste. 8thMay, 2007. http//www.rediff.com> news>mar. Web. accessed on 17th August 23, 2019

Humanism and Ethics: From Rabindranath Tagore's Viewpoint

Subrata Das *

Abstract: Philosophy,as a method advocates the advancement of Human Civilization since its very beginning period. Human beings lead their lives according to certain patterns and more or less conscious of their everyday affairs.Philosophy, as a guide to life, provides certain criteria for individuals to act rightly to develop their way of thinking and lead a virtuous life. Ethics is a Branch of Philosophy that discusses Human Conduct in relation to society and provides guideline for a smooth and integrated society where the good of the individual does not hinder the progress of mankind.Humanism is an anthropocentric Philosophy of life. A humanist may be atheist or a theist, but their goal is the same: doing good for others. They believe that moral values can exist without God.However,Indian civilization is theistic in manner,believes in the existence of one supreme reality that is pervaded in all creatures. So by doing good to others, an individual serves God as it is in every creation. Rabindranath Tagore's view on humanism is built through his own realization. Tagore's spiritual thinking states that service to humanity is a path to worship of divine.If we serve God not with rituals but by service to mankind,we will close to the supreme entity. Thus the humanistic views of Tagore inspire human

* Assistant Professor in Philosophy, Ramananda Centenary College, Purulia. e-mail: Subratadas2607@gmail.com

beings to be benevolent to others with a fellow feelings. It is the core thinking of ethics.

Keywords: Humanism, Welfare, Manifestation, Ultimate reality, Altruism, pervasive.

Human beings are the finest creation on Earth endowed with intellect in them that differs them from other species. From this sense, a human being differs good from bad and can understand what is right or wrong. It is the ability of human beings to analyze or to distinguish of right or wrong. As a branch of Philosophy, Ethics, we can say a systematic approach that directs human beings what to do in a particular situation or not. Ethics supports the act that is beneficial for an individual or in a broad sense, for a society. It is the normative science that provides morals for the judgement of actions. However, ethical judgement are relative. It may be judged from the perspective of a particular society or culture. Every culture has their narratives that they follow and lead their lives accordingly. It is called cultural relativism. It has also seen that a cultural value of a particular society is fruitless for the other community. But these relative truths establish a path through which a culture or nation may progress. Ethics is nothing but moral principles of a particular religious or social section or an individual being. Ethics is a study of human nature and conduct. Ethics represent the values that are useful for social progress and be helpful for harmony in different cultures.

As an anthropocentric view, Humanism stands for the welfare of human beings. According to this view, human beings are the only ones in earth with the potential to change its external environment for a better life. It proclaims the dignity of human beings above all else. This notion may be theistic or atheistic in nature, but its central theme is doing good for others as well as oneself. Humanists do not rely on any supernatural entity, such as God. To them, moral values can exist without the existence

of supreme entity. As a Philosophy, it is a view that declare humans to be the author of his own destiny. This humanist view is against fatalism. It upholds the belief that through hard work, a person can turn out the impossible into the possible. Humans have the capacity to build their world according to their own preferences.They do not believe that any transcendental God will change their lives through worship, rather, they believe in their own capabilities. A humanist always tries to be friendly to their surroundings and act with fellow feeling. Both eastern and western thinkers hold this view. However Indian thought on humanism is more pervasive and theistic in nature. Indian Philosophy and culture believe in a supreme entity, and view the material world as its creation. It believes, the supreme reality lives in the heart of all creatures. Thus, by doing good to others, a human being serves God-whatever name we may give it. This notion of unity with others was later identified as humanism in Indian culture.

Rabindranath Tagore was a versatile genius of India. He was born and raised in an environment where scholars of the Bengal Renaissance worked to eradicate orthodox social evils from British-ruled Indian society. Tagore was deeply influenced by Upanisadic thought from childhood. Later his humanistic ideas evolved through his own spiritual and Philosophical vision. Two core aspects of Tagore's view on humanism are-

1. Abandoning Samsâra and adopting Sannyâsa is not the path to Mokc a (liberation). Liberation can be achieved not by renouncing the worldly life but by actively engaging in it.
2. Union with God is not possible by rejecting the world; rather, it is achieved through service to living beings.

Tagore's humanism is not only centered on humanity but also spiritual in nature. According to him, liberation is possible only when we immerse ourselves fully in worldly life. It aimed at the welfare of the human

race. The presence of the Ultimate cannot be felt through the abandonment of this worldly life. The supreme lies amidst this world of experience–

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"[১]

Rabindranath chose human beings to serve God through serving others. He feels the manifestation of the Universal within all beings. Tagore believed that just as the image of a mother is most beloved to a child, the form of the supreme being is most acceptable to human beings when manifested in human form.People who are inspired by this ideal do not seek God in Temples,Mosques or Churches. They dedicate their lives to the welfare of humanity. In poem no 119 of 'Gitanjali'(Bengali Version), Rabindranath Tagore writes:

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কে আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরই মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার পরে।"[২]

In the poem, Tagore conveys that God is not confined to rituals or holy places but is present among the toiling and suffering masses. Rabindranath saw the manifestation of God in every human being. Moreover Tagore believed that the presence of the supreme is especially manifest where people are poor, deprived, marginalized or, oppressed. He was inspired by Upanisadic idea of oneness.The Isha Upanisad declares that the supreme pervades the entire Universe, and everything dwells in it-

ॐ इषवास्यमिदंसर्वम् यक्तिञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्।। [৩]

Thus, every human being is interconnected. If we deprive another, we deprive ourselves. We are all manifestations of the Ultimate reality. Indian notion of humanism does not distinguish between humans and the supreme; rather, it declares all human beings as sons of the immortal-

“सृन्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः” – यजुर्वेद [৪]

(“Listen, O Sons of Immortality! All the citizens of the World hear this!”)

Indian truth seekers (Rishi’s) felt the presence of the ultimate in every living being and proclaimed the ideal of serving others with fellow feeling. The concept of Yajña signifies service and sacrifice toward the elements that nurture and sustain us. This idea is also reflected in the beliefs of common people. The Indian worldview accepts ordinary human beings as divine (Nara-Nârâyana). Thus, Serving humanity is equivalent to serving God or the Ultimate Reality. Indian Philosophical tradition (From the Vedic period onward) expresses a sense of universal harmony.

Rabindranath’s humanistic philosophy was built upon a deep belief in Indian Ethical Thought. He was deeply influenced by the humanistic teachings of the Upanisads, Christianity, Buddhism, Vaishnavism, The Brahmo Samaj, and the mystic Philosophy of Bauls. V.S.Naravane insightfully remarks:

"The noble idealism of the Upanisads, the compassion and wisdom of the Buddha, the rationalism of Western thought, the love of the Vaishnavas, the humanism of Jesus, the inwardness of the great mystic poets of all ages and countries-everything has its place in Rabindranath's world-view and his way of life."[5]

In his writings, he often used the term 'Moner Maanush' to refer to the Ultimate Reality. India's rich spiritual and cultural heritage inspired Tagore, and this influence is evident in his works. It is not possible to discuss all of Tagore's creations in a single paper, therefore, I will focus on selected works that reflect his humanistic thought from an ethical perspective.

In '*Manusher Dharma*', Tagore Said:

''মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিতসাধনা করে। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানি কি করে। তেন সর্বমিদং বুদ্ধম। স্বচ্ছ মন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে, শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের তার থেকে বিরত হলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে। তখনই জানে আপনার প্রকৃতি।''[6]

The above words of Rabindranath Tagore suggest that the worship of Ultimate is meaningless if we do not realize our own identity and involve ourselves in the service of mankind. God lives among human beings and participates in all their activities. The poet Says in poem no 49 of 'Gitanjali'(Bengali Version):

''দিবসরজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে।
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে ওঠে
নয়ন মেলে চাই,
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে

দেখতে মোরা পাই।''[7]

His feeling of unity with mankind and his love for others held such a deep place in his heart that he dedicated all his works to God in the form of Man. To him, no worship of the supernatural is complete if we deprive a human being of dignity and care.As a Spiritual Humanist, Tagore acknowledges the existence of both- God and Man. He clarifies that by insulting or depriving a man's dignity we also insult God. In his literary works, man becomes more real to him than God. He perceives the divinity within man. Man can be uplifted from a personal existence to a divine spirit by cultivating his inner potential for the welfare of fellow beings.

''প্রতি ব্যক্তিমানুষের মধ্যে দুটি পৃথক কিন্তু পরস্পর-সংযুক্ত সত্তা অবস্থান করে। তাদের একটি দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনধারণ নিয়ে ব্যাপৃত। কাজেই তার দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কুচিত। অতিরিক্তভাবে তার মধ্যে একটি পৃথক মানব সত্তা আছেন, তিনি ব্যক্তি জীবনের সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করেন।''[8]

The finest development of the human heart is observed in affection, love and tenderness. By expanding this love, selfishness is refined,since both self-interest and altruism are coexist in every human being. This altruistic nature enables humans to do good by spreading love. A person does not find it difficult to make sacrifices for someone they love; rather, it brings joy to do so.

Thus, the meaning of human life is not confined to small desires or personal interests. Intelligence, emotional instincts and the drive to act are used to build meaningful relationships with the world. Through knowledge, action and love a deep connection with the world is established. In his Nobel Prize acceptance speech on 26th May,1921 Tagore said: "Man is not to fight with other human races,other human individuals but his work is to bring about reconciliation and peace and restore the bonds of friendship and love." [9]

If we take a look at Tagore's Novel 'Gora' we see a noble maternal

figure, Anandamoyee. She stands against her rigid husband Krishnadayal's harsh treatment of Gora, their adopted son, during the time of the mutiny even though she was berated as 'Khristani'(a woman with a Christian mindset). when Binoy decides to change his religion to marry Lalita(Pareshbabu's daughter), Anandamoyee expresses a noble vision of Indian heritage: "Hinduism has accommodated countless beliefs and practices. It will accommodate your belief too." [10]

She rises above institutional religion and embodies motherhood in its truest form.She even teaches her stubborn son Gora who rigidly follows puja-bidhi and casteism, to adopt a more humanistic outlook on life.A similar instance is found in Tagore's short story 'Kabuliwala' where the narrator moved by his conscience- "Ami-o pita,se-o pita"(I am a father,and so is he)-allows the Kabuliwala(Rahamat) to meet his daughter "Mini" at last of the story. Here Tagore shows that relationships transcend the boundaries of religion and sect. This story reveals Tagore's profound ethical insight into human relationships. It is the great ethical thinking of his humanistic outlook that is revealed in this story.

The central focus of Tagore's writing is the human being. In 'Ghare Baire'(The Home and the World),Nikhilesh encourages his wife Bimala cross her social boundaries and engage with the outside world. Tagore always tried to show the equality of women in his writings. Actually his travells to western countries made Tagore more conscious of the right of oppressed women. Characters like Binodini, Nirupama, Ashalata, Kamala, Bibha, Surama, Damini, Kumudini become representatives of these women.Time and again,Tagore sought to bring women out of the confines of the domestic sphere and establish them in positions of dignity. His ethical insight recognized the inherent potential in women. To reflect this, he created rebellious women characters like Lalita, Suchorita, Ela, Binodini, ketty Mittir, Labanya in his literary works.

Not only women-Tagore also created characters like Jagmohan, Sachis, Bilash, Amit Ray, Nikhilesh, Indranath, Atindra, Biprodas, Panchakdada who boldly questioned about the dogmas of social diseases that oppressed the natural flow of life.This reflects the greatness of Tagore's vision. He beautifully portrayed these characters under the influence of Upanisadic ethics and Western liberal humanism. Progress of a nation is only possible if men and women march together for the development of society. Equality is the core lesson of ethics. Ethical doctrines have always emphasized the importance of being truly human. With a humanitarian approach, society not only prospers, but the world itself becomes a nest-Yatra Biswam Bhabatyekanirham(where the world becomes a family).

Tagore in "The Religion of Man" sings the glory of Karma as a means to reach the mass-

"যিনি বিশ্বকর্মা এবং সকল মানব হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে আছেন তার সঙ্গে কখনোই নৈষ্কর্মের দ্বারা যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর সাথে যুক্ত হতে গেলে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে বিশ্বকর্মা হয়ে উঠতে হবে এবং সকলের স্বার্থে কাজ করতে হবে। সকলের জন্য বলতে অসংখ্য মানুষের জন্য কর্ম করা বোঝায় না। যে কোন মঙ্গলকর্মই তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সার্বজনীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। অনুরূপ যেকোনো হিত কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েই বিশ্বকর্মার সাক্ষাৎ অনুভব সম্ভব হয়। সেই মহাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইলে আমাদিগকে আপনার মাঝে মগ্ন না থেকে সকল ব্যক্তির হৃদয়ের সাথে আপনাকে মেলানোর অনুশীলন করতে হবে।"[11]

Based on the above brief discussion, we may conclude that Tagore as a humanitarian, emphasized the importance of goodwill, which eliminates ego and opens up a universal vision. According to him, a human being should act out of love and perform duties for the sake of others. Humanism, as a practical philosophy, promotes critical thinking and from an ethical standpoint, encourages individuals to work for the betterment of society without harming the interest of others. This can be defined as a pragmatic theory of ethics. Tagore also recognized the inherent potential in human beings and believed that, through this vision, an individual's sense

of empathy and fellow feeling becomes the means by which a person unites with the universe. Tagore believed so deeply in the greatness of the human spirit that he held man to be the highest revelation of the divine. God himself finds expression through the soul of men. His worldview was profoundly shaped by Raja Ram Mohan Roy's (1772-1833) advocacy of religious unity, human values, national consciousness and global brotherhood.

Tagore's humanism parallels that of Renaissance thinkers like Petrarch (1304-1374) and Erasmus (1466-1536), in that he acknowledges the reality of both- God and Man. However, unlike the more secular orientation of renaissance humanists, Tagore sees human greatness as deriving from the divine presence within. Thus, his humanism is inseparable from his spiritualism and cannot be termed purely humanistic like western view. Tagore believes that although God is the creator of the world, it is man who must give it purpose by instilling it with moral and spiritual values. Man's truth stems from his own inner potential and pursuit of perfection. As he evolves through many lives, both he and his vision of God grow greater. In this light, man has become more tangible and significant to him than God. Professor Humayun Kabir says: "Tagore's humanism is clearly revealed in his universality and sense of identity with all men, in his revolt against all types of tyranny and injustice, in his repudiation of asceticism and his acceptance of like in its fullness, in his exaltation of the human reason and the luminous quality of his faith, above all, in his respect for the human personality." [12]

Tagore travelled to countries such as England, France, America, Germany, China, Japan and Russia; consistently expressing his conviction that human values transcend national boundaries. He believed that each culture should be free to flourish independently while also encouraging a spirit of unity that allows diverse races to come together without losing their individual identities. In this respect, we should mention Binoy Gopal

Roy's comment on Tagore's Humanism: "History will always remember Rabindranath, for he is a Philosopher of man and for man. He feels and fights for humanity and in his Philosophy man forms the central theme. No Philosopher has ever accorded such a sublime place to man."[13]

Tagore's approach to humanism reflects his universal humanistic ideals, his empathy for all individuals and his unwavering opposition to oppression and injustice in any form.This conveys his ethical standpoint.Tagore's humanistic thinking are closely connected with the practical aspect of Ethics.

Reference:

1. Bandopadhyay, Hiranmoy: Upanisad O Rabindranath (Bengali Version), Kolkata: Nabapatra Prakashan,2022. p-174
2. Tagore, Rabindranath: Rabindra Rachanavali (Sulobho Sanskaran), Shastha Khanda, Visva-Bharati Granthanbibhag,1426(Bengali San). p-79
3. Vedalankar, Dilip: Vedic Humanism, Delhi: Vijaykumar Hasanand, 2001. p-xxii
4. Vedalankar, Dilip: Vedic Humanism, Delhi: Vijaykumar Hasanand, 2001. p-xxxi
5. S.Sarode, Atul: Rabindranath Tagore-A true humanist, New Delhi: Sarup Book publishers pvt ltd, 2015. p-32
6. Tagore,Rabindranath: Manusher Dharma(Bengali version), Kolkata: Visva-Bharati Granthanbibhag, 1418 (Bengali San). p-56
7. Tagore,Rabindranath: Rabindra Rachanavali(Sulobho Sanskaran), Shastha Khanda, Visva-Bharati Granthanbibhag,1426 (Bengali San). p-40
8. Bandopadhyay, Hiranmay: Upanisad O Rabindranath, Kolkata: Nabapatra Prakashan, 2022. p-154

9. Chaudhuri, Sutapa (ed.): Reading Rabindranath-The myriad shades of a genius, Jaipur: Aadi Publication,2018. p-9
10. Chaudhuri,Sutapa(ed.): Reading Rabindranath-The myriad shades of a genius, Jaipur: Aadi Publication,2018. p-9
11. Sengupta, Shankar(Translated): The Religion of Man by Rabindranath Tagore, Kolkata: Progressive Publisher, 2021. p-64
12. Kabir, Humayun: Rabindranath Tagore, London: University of London, 1962. p-146
13. Roy, Binoy Gopal: The Philosophy of Rabindranath Tagore, Bombay: Hindi Kitabs Ltd., 1949. p-147

Primary Education in Rural Areas of West Bengal: Challenges and Prospects

Shyamal Chandra Barman *

Abstract: Providing sustainable education and Enhancing significance of education in human life throughout the country as well as education in rural areas of the country the central government and state government has been initiated various educational programmes and some are came into force. In spite of these, the system of education in rural area in the country as well as rural area of West Bengal is still in a developing stage. The conditions of school in rural communities are still in a deprived than the urban areas schools. In this article explore, Primary Education in Rural Areas of West Bengal: Challenges and Prospects.

Keywords: Rural Education, development.

Introduction: "Education is the manifestation of perfection already existing in man" (Swami Vivekananda) Education is the primary right of every citizen of India. All the citizens, irrespective of caste, creed, race, religion, ethnicity, gender and socio-economic background have the right to acquire education. The constitution (Eighty-sixth Amendment) act, 2002 inserted Article 21-(A) in the constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years.

---

* Assistant Professor of Political Science, Chunaram Gobinda Memorial Government College, Purulia. e-mail: Scbarman2011@gmail.com

Enhancing significance of education throughout the country as well as education in rural areas of the country the central government and state government has been initiated various educational programmes. In spite of these, the system of education in rural areas is still in a developing stage. The conditions of school in rural communities are still in a deprived than the urban areas schools. In rural areas, the schools are being faced various challenges. As a result, we are failing to achieve our goal to provide equal and quality education to all.

Methodology: This study is fully based on secondary data. The data was collected from books, magazines, research articles, newspapers, documents and websites.

Objectives:

a. Explore the developmental way of rural education system in West Bengal

b. Explore the major challenges of rural education in West Bengal

c. Explore the tentative measures of rural education in West Bengal

The Major challenges of rural areas Primary Education in West Bengal stated as follows:

Lack of infrastructure: Lack of infrastructure is regarded as one of the major problems in rural school. Proper infrastructure enables the students to acquire academic skills in a appropriate manner. In rural schools students sit on floor, as there are not any chairs or desks within the classrooms. When there is lack of furniture, then students may learn, while sitting on the floor. But when there is lack of machinery, technology and equipment, then they are normally are unable to acquire an understanding of the academic concepts in an efficient manner.

Shortage of teachers: The shortage of teachers in rural schools is a major barrier within the course of development of the system of education. In

order to facilitate education, it is essential to recruit qualified and capable teachers. The teachers are vested with the responsibility to provide educational knowledge and concepts to the students to promote their growth and development in an effective manner. Student's and teacher's ratio also do not follow properly in rural schools. The government can't able to recruit sufficient teachers due to deficit of fund.

Drop out: lack of proper guidance and lack of awareness about significance of education in human life, the rural students is dropout from the school. There is not existing any counseling board to motivated to them and guide them to continue his/her education in rural areas.

Non- Teaching Staff: There is need to appoint non –teaching staff in every primary school in west Bengal rural school due to huge official works. Already there is not able to follow teacher student ratio for teaching learning after than again the teaching staff they maintain Mid-day-Meals, Book, uniform distribution etc. Moreover, they are performed assign duty like Census, inclusion of new electoral in electoral roll, exclusion and correction.

Lack of extra-curricular activities- Students belonging to all age-groups and backgrounds take pleasure in the acquisition of education, especially, when there are adequate provisions of extra- curricular activities. This include, dance, music, singing, sports, physical activities, role plays and so forth. When the students participate in these activities, then they develop motivation and enthusiasm towards learning. In rural schools, there is lack of extra- curricular activities, which is regarded as a hindrance in making provisions of good quality education to the students.

Unsatisfactory Teaching-Learning Methods– The teaching-learning methods that are put into practice in rural schools need to be improved. Research has indicated that due to inefficiency in these methods, students are unable to enhance their academic skills. The students studying the class five are unable to read class three textbooks. This shows that

teaching-learning methods that are made use of are not put into operation in a well-organized manner. It is the job of the teachers to ensure that teaching-learning methods are efficiently utilized. The teachers employed in rural schools normally do not possess the required educational qualifications and skills that are needed to facilitate learning among students. Hence, lack of skills and abilities on the part of the teachers is a major cause for the implementation of unsatisfactory teaching-learning methods.

Absence of Competitions and Events – Competitions and events are considered an integral part of education. The competitions are organized with regards to various areas, such as, academics, sports, physical activities, dance, music, singing, role plays, poetry and so forth. Participation in competitions augments the skills and abilities among the students and stimulates their mind-sets towards learning. Furthermore, students are able to develop effective communication skills and put in more confidence among them to improve. In rural schools, there are absence of competitions and events. When these are to be organized, then it is vital for the teachers as well as the staff members to possess adequate skills and knowledge. The absence of competitions and events is regarded as the major barrier within the course of acquisition of education.

Deficit of fund – Financial resources are considered to be of utmost significance within the course of development of the system of education. To make provision of appropriate teaching-learning methods, learning materials, infrastructure, civic amenities and facilities and to bring about improvements in the overall quality of education, it is essential to possess sufficient financial resources. In rural schools, there is shortage of funds, due to which, the individuals not are able to make quality education available. In some cases, the school environmental conditions are in a deprived, as there are lacks of furniture, equipment, blackboards etc. Hence, it can be stated that due to lack of financial resources, necessary equip-

ment and materials are not available to the students in enhancing their learning.

Measures to Improve Rural Education

The measures which are required to be initiated to bring about improvements in the system of education have been stated as follows:

Role of VEC (Village Education Committee): There is Village Education Committee in each primary school take care of this institution. But the role of VEC is disappointing. The committee should do performed active role to improve rural areas primary education system. The members of the committee as follows a. all teaching staff of the institution, b. Panchayat members of this panchayat constituency, c. One secondary school teacher from this area d. Two representatives from guardian e. Shikha Bondhu

Up-gradation of Teaching-Learning Methods – The teaching-learning methods needs to be upgraded and implemented in accordance to the students oriented. The different types of teaching-learning methods are, giving notes regarding lesson plans, making the students read and then provide verbal explanations, providing explanations of the concepts on the blackboards, making the students play the role of characters within the lesson plans, giving practice exercises, organizing tests and so forth. When the teachers make use of different teaching-learning methods, they need to possess efficient skills and ensure students learn adequately. Up-gradation of teaching-learning methods is one of the essential aspects to improve rural system of education. But on the part of the students also, it is vital to pay adequate attention, particularly when they are learning academic concepts.

Use of Technology– In digitalize era, technology has gained prominence in the implementation of various tasks and activities. The internet connectivity should be increased in rural area. In education also at all levels, use of technology is rendering a significant contribution in augmenting learning and understanding among students. It is comprehen-

sively used in urban educational institutions, but in rural schools, there is still lack of technology. In most of the rural school there is no internet connectivity. Therefore, making use of technology in the system of education is regarded important. The various types of TLM (Teaching Learning Materials) such as, computers, lap-tops, projectors, smart phones, mobile apps and so forth would facilitate understanding of the concepts. The students as well as the teachers make use of internet to enhance knowledge in terms of various concepts. Both central and state governments and non-government organizations are allocating a great amount for the development of Information and Communication Technology (ICT) and rural education (Roy, 2012). The staff members also make use of technology to carry out the administrative functions. This is common in educational institutions in urban areas and private school. When one has to prepare a document, letter, notice or send messages or information, then technology is made use of to a major extent. Due to lack of technology, the education system in rural areas is experiencing set-backs. The use of technologies in education system regarded as important part.

Organization of Workshops – Workshops are normally organized in urban schools and higher educational institutions on a large scale. They are organized in terms of a particular topic or concept, which students normally find complicated. The main objective of organization of workshop is to make provision of knowledge to the students to enrich their understanding. In rural schools, it is vital to organize workshops to facilitate understanding of the concepts among the students, which they find difficult. In workshops, usually professionals are invited from other educational institutions. They deliver speeches, provide information and generate awareness, which enables the students to understand better. Assignments too are provided to the students, with the aim offending out how much they have learned and understood. Therefore, it can be stated that organization of workshops is regarded as one of the essential aspects to improve the system of rural education.

Need to arrange teacher guardian meeting: The teacher guardian meeting should be arranged by the school managing committee. All teachers and guardians are assembled there and discuss about academic affairs and also about school management. The guardian will give feedback to teacher about academic improvement of pupils.

Active role of managing Committee:

Implementation of Extra-Curricular Activities–In schools, apart from appropriate teaching-learning methods and instructional strategies, particularly regarding the academic concepts, it is necessary to implement extra-curricular activities. The provision of extra-curricular activities stimulates the mind-sets of the students and motivate them towards learning and attending schools. The various forms of extra-curricular activities that are considered an integral part of education are, artworks, handicrafts, music, singing, dance, sports, physical activities, role plays and so forth. When students, belonging to rural communities for instance, learn making of artworks, handicrafts, or participate in sports, physical activities or dance and music, then they feel pleasurable and contented. In rural communities, individuals also develop interest in usually any one of extra-curricular activities, and make it a career. They put into practice the activities to even supplement their income.

Implementing Proper Evaluation Procedures – Evaluation is regarded as one of the essential aspects to find out how much the students have learned and understood. Evaluation procedures help in identifying the flaws and inconsistencies and making improvements. The most common forms of evaluation procedures are giving class and home-work assignments, conducting tests, exams, competitions and so forth. In rural schools, exams are conducted, but the system of examinations is not well-developed. It is essential to put into operation, proper evaluation procedures. The teachers need to ensure that when they complete the lesson plan of any subject, they give class as well as home-work assignments to

the students. When the students perform well, then it is understood that they are making use of teaching-learning methods in an appropriate manner. On the other hand, when students experience set-backs, then it is essential to bring about improvements in teaching-learning methods. Hence, implementation of proper evaluation methods would not only facilitate improvements in the performance of the students, but also in the teaching methods.

Rewarding Students – Rewarding students, particularly when they perform well academically is regarded as an important aspect to improve the system of education. The main objective of education is to lead to effective growth and development of the students. When they get enrolled in schools and work diligently and enthusiastically to enhance their academic performance, then it is vital for the teachers to reward them. Rewards may be in the form of sweets, stationary items, writing appreciative statements on the notebooks and so forth. When the students are given rewards, then they feel pleasurable and motivated towards learning. Research has indicated that through rewards, students feel encouraged towards attending schools on a regular basis and this leads to a decline in the rate of absenteeism as well.

Providing Adequate Infrastructure – Making provision of adequate infrastructure would render an effective contribution in facilitating not only acquisition of education among the students, but also assisting teachers as well as the staff members to carry out their job duties appropriately. In schools, availability of proper furniture, desks and chairs, heating and cooling equipment in accordance to the weather conditions, machinery, technology, learning materials, such as, blackboards, books, stationary and so forth, would not only augment understanding of academic concepts among the students, but also enable them to feel pleasurable and contented within the school environment. The infrastructural facilities in schools contribute in making the school environmental conditions pleas-

ant and amiable.

Financial Assistance – Individuals normally feel hesitant in getting enrolled in schools due to financial problems. Therefore, making provision of financial assistance is regarded to be of utmost significance that would encourage enrolment of students in schools. This is made available in the form of scholarships and grants. Scholarships are made available to the students, usually on the basis of their merit. When they perform well in class, achieve good grades, then they are made available scholarships and other forms of financial assistance. Apart from scholarships, the forms of assistance are provided to the students in the form of mid-day meals. The schools provide nutritious meals to the students, so they do not have to be concerned regarding getting meals from homes. The availability of financial assistance provides contentment to the individuals, mainly belonging to deprived and marginalized sections of the society.

Arrange of counseling meet for the Parents - In rural communities, parents are in some cases unwilling to get their children enrolled in schools, particularly girls. They possess the viewpoint that girls are meant to acquire training in terms of the implementation of household chores, as they have to eventually get married and go to marital homes. They possess the viewpoint that in their marital homes, they would not be able to make use of their educational skills and abilities. On the other hand, they believe in sending their male children to schools and augment their academic skills and abilities. They feel that male children would acquire employment opportunities and enhance the reputation of their families, when they acquire education. Therefore, to enable the parents to encourage education among girls is necessary not only for development of the system of education, but also overall rural development. Hence, the main purpose of organization of classes for the parents is to enable them to recognize the significance of education for their children and how it can lead to improvements in their overall quality of lives.

Conclusion

Education is regarded as a mechanism that leads to effective growth and development of the individuals and enable them to sustainability their living conditions adequately. The system of rural education is not in a well-developed and there are number of problems associated with it. These include, unsatisfactory teaching-learning methods, lack of transportation facilities, lack of infrastructure, lack of extra-curricular activities, lack of financial resources, absence of competitions and events, shortage of teachers, conflicts and disputes and discriminatory treatment. The lack of resources is one of the major problems, which include, financial resources and human resources. Due to lack of resources, schools are experiencing problems in making advancements in the system of education. These problems and challenges are imposing number of unfavourable effects upon the students. As a result of these problems, there is a decline in the retention rate of the students, increase in the rate of absenteeism, and girls, when experience discriminatory treatment or any form of criminal act, usually drop out, before their educational skills are honed.

There is a need to formulate measures for bringing about improvements in the system of rural education. These are, up-gradation of teaching-learning methods, use of technology, organization of workshops, implementation of extra-curricular activities, implementing proper evaluation procedures, rewarding students, providing adequate infrastructure, financial assistance, equal opportunities, and organization of classes for the parents. When these measures would be put into operation in an appropriate manner, then improvements would be bought about in the system of rural education.

The Government of India has been launched National Education Policy (NEP)-2020 for sustainable education for all, by the 86th amendment of the constitution of India provides right to education for the children's of age six to fourteen years. Despite efforts, the government remains unable to

fully provide basic amenities for primary education in rural areas primary education. Both the government and non-governmental organizations should prioritize providing fundamental facilities for primary education in rural areas.

Reference:

Datta,Rimmi, Mete, Jayanta (April 2024) Opportunities, Challenges, and Future Directions for the integration of digital education into school education in West Bengal

Chattopadhyay, Raghabendra et al (1998): Status of Primary Education in West Bengal (A project sponsored by UNICEF, Kolkata), Government of West Bengal, Kolkata

Kapur Radhika (2019) Concept of Rural Development in India, Faculty of Social Science, University of Delhi, 110007

Roy, Dayabati & Banerjee Partha Sarathi (2012), Economic and Political Weekly, EPW.

Chandra Sekhar, CP, VK Ramachandran and R Ramakumar (2001): "Issues in School Education in Contemporary Kerala' paper prepared for UNICEF, India Country Office, New Delhi.

Drèze, Jean and Amartya Sen (2002): India: Development and Participation, OUP, New Delhi,

Government of West Bengal (1992): Report of the Education Commission. (2001): Annual Report 2001, Department of School Education.

Mukherjee, Kaushik. Bera, Gouri, Sankar. (2017)The Challenges and opportunities to implement Inclusive Education in West Bengal

(2001-2002): Economic Review.

Maithili, N (2002): 'Community Pressure for Higher Quality of Education: Rural Primary Schools in Karnataka, Economic and Political Weekly, June 15, 2002.

Nambissan, Geetha B, Mona Sedwal (2002): 'Education for All: The Situation of Dalit Children in India' in R Govind (ed), India Education Report 2002, OUP, New Delhi.

Nayar, Usha (2002): 'Education of Girls in India: An Assessment' in R Govind (op cit).

PROBE Public Report on Basic Education (1999), OUP, New Delhi.

Ramchandran, Vimala, Aarti Saihjee (2002): 'The New Segregation Reflections on Gender and Equity in Primary Education', Economic and Political Weekly, April 27.

Rana, K, Abdur Rafique and Amrita Sengupta (2002): The Pratichi Education Report, Number 1, TLM Books, Delhi.

Sen, Amartya (2002): Introduction to the Pratichi Education Report, Pratichi, New Delhi.

(2001a): India and the World, Dorab Tata Memorial Lectures, Lecture 1, February 20, 2001, Mumbai.

(2001b): Class in India, Jawaharlal Nehru Lecture, November 14, 2001, New Delhi.

Shariff, Abusaleh and Ratna M Sudarshan (1996): "Elementary Education and Health in Rural India: Some Indicators' in Nitya Rao, Luise Rurup, R Sudarshan (eds), Sites of Change, Friedrich Ebert Stiftung, New Delhi.

Sitaramau, A S (2002): 'Status of Elementary Teachers in India' in R Govind (op cit).

Sujatha, K (2002): 'Education among the Scheduled Tribes in India' in R Govind (op cit).

Yadav, M S and Meenakshi Bharadwaj with Mona Sedwal and Neeti Gaur (2002): 'Learning Condition and Learner Achievement in Primary Schools: A Review' in R Govind (op cit).

Dreze, Jean and Amartya Sen (2002): India: Development and Participation, OUP, New Delhi.

Government of West Bengal (1992): Report of the Education Commission-(2001): Annual Report 2001, Department of School Education-(2001-2002): Economic Review.

N. Tara's (1985): "Education In A Rural Environment"

Nayar, Usha (2002): 'Education of Girls in India: An Assessment in R Govind (op cit)

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Religious Tolerance Education through Upanishadic thought in Contemporary India

Bamapada Bauri *

Abstract: India, a land of immense religious diversity, has historically promoted pluralism and spiritual coexistence. However, the current socio-political environment reveals growing challenges to religious tolerance, especially among the youth. In this context, religious tolerance education becomes a critical tool for nurturing inclusive citizenship and social harmony. Religious intolerance remains a critical issue globally, often serving as a catalyst for social division, discrimination, and violence. Education has the potential to be a powerful tool in countering religious intolerance by promoting mutual understanding, respect, and coexistence. Amidst growing sectarianism and socio-religious polarization, the philosophical wisdom of the Upanishads offers a profound basis for nurturing mutual respect and inclusivity. This article explores how Upanishadic teachings can serve as a foundational framework for religious tolerance education in modern India.

Key words: Religious Tolerance, Education, Religious Literacy, Upanishads, wisdom, Pluralism, Interfaith Dialogue.

Introduction: India's religious landscape is one of the most diverse in the world. With a popular comprising Hindus, Muslims, Christians, Sikhs,

* Assistant Professor, J.K College, Purulia.
e-mail: michelbpb@gmail.com

Buddhists, Jains, Parsis, Jews, and others, the Indian state has historically emphasized secularism and peaceful coexistence. However, in recent years, the rise of communalism, identity politics, and hate speech has threatened interfaith harmony. Religion plays a central role in the lives of billions of people. However, divergent religious beliefs and practices often lead to misunderstanding, prejudice, and conflict. In multi-religious societies, religious intolerance can fuel discrimination, social exclusion, and even violence. In response to these challenges, educators and policymakers have turned their attention to religious tolerance education as a tool for building inclusive and harmonious societies. Religious tolerance education refers to educational practices that promote respect, understanding, and acceptance of diverse religious beliefs and practices. India's spiritual history is deeply intertwined with its capacity to accommodate and coexist with diverse belief systems. From the Vedic period to modern times, Indian society has witnessed both profound interfaith harmony and instances of communal discord. As communal tensions occasionally the social fabric, the urgency of cultivating religious tolerance through education becomes more pressing. The Upanishads—ancient philosophical treatises that form the core of Vedantic thought—offer a timeless vision of unity and compassion that transcends sectarian boundaries.

This paper examines how Upanishadic teachings can inform educational strategies that foster religious tolerance in contemporary India. It seeks to identify the philosophical elements in the Upanishads that support inter-religious harmony and propose pedagogical practices through which these can be integrated into mainstream education.

Religious Tolerance in Contemporary India: India is home to a multiplicity of religious traditions: Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism and Jainism.Besides these tribal religion and rural religion have their own characteristics. A bird's-eye view of all these will present the vivid picture of religion of India. However, the rise of identity politics, communal violence,

and social media polarization have threatened the syncretic heritage of Indian pluralism.

The discussion of Contemporary India is incomplete without a discussion of Religion in India since Indian society and culture have been primarily religion. Religion is instinctive to man. Man is the only religious being. As reason distinguishes him from animals, he can similarly be distinguished through religion. Religion manifested itself in man's social tendency. Finding God potent in everybody the devotees sacrificed their life for the Divine Power who is in the form of society. In the Gita the worshipper of God has been ordered to engage in the service of all living beings. Love and service are accorded considerable importance in the Christian religion. Islamic religion has encouraged the tendency of brotherhood. Buddhist religion has preached non-violence, compassion, and sympathy. Similarly, even in ancient tribal religions, the people recognizing the same totem or God were organized. Religion has always generated a sense of belongingness in society. All religions have emphasized sacrifice and forbearance. Christ said that if a person begs your coat, give him your coat as well and if slapped on one cheek, present the other. This religious tolerance is in evidence from Christ to Martin Luther, Buddha to Ashoka, and from ancient Indian saints to Gandhi. All the founders of religion the world over Christ, Buddha, Mohammed and Hindu seers and saints have preached love and non-violence. Jainas a Buddhists treated non-violence as the supreme duty. Religion also augments the feeling of world brotherhood. As far as a religious person is concerned, everyone has been made by God and all worship Him in different forms and names. In this way, religion generates a sense of the "world is the family."

But all these good activities in the name of religion in society do not imply that immoralhave not been done under a religious pretext. The society has also been harmed as it has been assisted by religion and consequently

some people want to eradicate the name of religion from society. Women have been mercilessly exploited in the name of religion, in human history. Same religious law-givers have stripped her of all rights and made her the slave of man. Bloody wars have been fought for centuries both East and West on the same pretext. The pages of human history are cluttered with accounts of bloodsheds of the crusades and the *jihads.* In India, many religious fanatics wielded cruelty to other religious people, again in the same religion. In this way, religion was responsible for currents of hatred and despising which pulsate in society. If God had lent his ears to these religious people in their pleas for the destruction of others, man would not have soiled the face of this planet today. In Hindu-Muslim communal riots in India, Hindus are tortured in Bangladesh, World War going to be start in the name of religion between Israel and others. Viewing these inhuman activities in the name of religion, one doubts whether religion makes man a saint or devil. All defects attributed to religion are the defects of religionism. Religionism is as false and harmful as racism, casteism, groupism and narrow nationalism. So religious tolerance is important educational subject in contemporary India.

The Upanishads: A Philosophical Overview: The Upanishads are the very basis of Indian culture and spiritual heritage. No one can ever understand or appreciate the essence of Indian culture without making a study of the Upanishads. They are like the 'forefathers' of the Indian culture and civilization. All the beliefs, rituals and festivals, all philosophical systems in India and the lives and teachings of mystics and saints of India are rooted in the Upanishads. They are books of discoveries most of it about human personality, its structure and uniqueness, and about the ultimate nature of godhead and the universe we live in. One reads in the Upanishads of a sage lost in intense meditation, coming face to face with the Immortal Core of human beings, rising and addressing the whole creation. This divinity of man is one of the most important messages of the Upanishads.

The Upanishads were discovered by the pure minds of the Vedic Rishis. A Rishi is one who 'sees' a truth. The word Upanishad also means 'sitting devotedly near.' Hence it represents the 'spiritual wisdom' imparted in private to worthy pupils and people, but zealously guarded from unworthy ones.

The Upanishads, also called Vedanta ("the end of the Vedas"), are a collection of texts composed between 800 BCE and 200 BCE. Although there many Upanishads, there are ten among them which are called principal Upanishads. These are- Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chhandogya and Brihadaranyaka Upanishads. They mark a transition from ritualistic religion to philosophical inquiry. While they belong to the broader Vedic corpus, their focus is more introspective and speculative, centered on metaphysical questions about the nature of reality, the self, and the universe.

Key Philosophical Concepts:

- Atman and Brahman: The Upanishads posit a fundamental unity between the individual soul (Atman) and the universal reality (Brahman). This non-dualistic vision implies that all beings share the same essence.
- Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti: This famous verse, though from the Rig Veda, is echoed in the spirit of the Upanishads. It means, "Truth is One, sages call it by many names." This inclusive perspective forms the philosophical bedrock for tolerance.
- Neti Neti (Not This, Not That): This method of negation encourages the seeker to transcend labels and narrow definitions, allowing for a deeper appreciation of all faiths.
- Aham Brahmasmi: The realization "I am Brahman" underscores the shared divinity of all beings, cutting through social and religious divisions.

Upanishadic Thought as a Basis for Tolerance: The Upanishads are often in the form of dialogues between a teacher and disciple about the Ultimate Reality which is of the nature of consciousness. The following compilation from various Upanishads has been done from pupil's point of view. The ideas contained in the Upanishads are very profound thoughts, some of the highest and best ideas mankind has ever thought of.

*Universal Consciousness:*The Upanishads assert that Brahman is the ultimate reality that permeates all creation. This non-sectarian view encourages students to recognize the divine in all beings, regardless of religious affiliation. Such understanding naturally leads to empathy and respect for difference. Hence Kathoponishad says-

अग्निर्यथैको भुवनं प्ररिष्टो रुपं प्रतिरुयो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपं रुपं प्रतिरुपो बहिश्च।। [1]

Just as fire, though one, having entered the world, assumes separate forms in respect of different shapes, similarity, the Self inside all beings, though one, assumes a form in respect of each shape; and(yet) It is outside.

वायुर्यथैको भुवनं प्ररिष्टो रुपं रुपं प्रतिरुयो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपं रुपं प्रतिरुपो बहिश्च।। [2]

As fire, though one, having entered the world, assumes separate forms in respect of different shapes, similarity, the Self inside all beings, though one, assumes a form in respect of each shape; and (yet) It is outside.

Unity in variety in the plan of creation. However men and women may vary individually, there is unity in the background. About living with others Upanishad says-

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।
अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि।
नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोषास्यानि। [3]

Let your mother be a goddess to you. Let your father be a god to you. Let your teacher be a god to you. Let your guest be a god to you. The works that are not blameworthy are to be resorted to, not the others. Those actions of ours that are commendable are to be followed by you.

Brihadaranyakopanishad says-

असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय।। [4]

From untruth lead me to Truth, fromdarkness (of ignorance) lead me to light (of knowledge). From death lead me to immorality.

The invisible is the Infinite, the visible too is the Infinite. There cannot be two infinites, for they would limit each other and would become finite. Also, each individual soul is a part and parcel of the Universal Soul, which is infinite. Therefore, in injuring his neighbor, the individual injures himself.[5]

Inner Transformation: The central focus of the Upanishads is self-realization. The idea that peace and understanding emerge from within encourages people to look beyond external rituals and doctrines and appreciate the spiritual goals common across religions—truth, compassion, and unity.

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय–
स्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः।
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति
हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।। [6]

Both the good and the pleasant approach a man. The wise man, pondering over them, discriminates. The wise chooses the good in preference to the pleasant. The simple minded, for the sake of worldly well-being, prefers the pleasant. Foolish man chooses enjoyment for the pleasure of his body.

One who has not desisted from bad conduct, whose senses are not under control, whose mind is not concentrated, cannot attain this Self through knowledge. Go on doing good, thinking holy thoughts continuously; that is the only way to suppress base impressions. Hence Upanishad says-

> सत्य वद। धर्मं चर। स्वध्यायान्मा प्रमदः।...
> सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। [7]

Speak the truth. Practice righteousness. Make no mistake about study...There should be no inadvertence about truth. There should be no deviation from righteous activity. Here the word '*Dharma*' refers moral qualities.

The uncontrolled and unguided mind will drug us down, down, forever...rend us. So, it must be controlled. Hence Upanishad says—

> मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च।
> अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्।। [8]

The mind is chiefly spoken of as of two kinds, pure and impure. The impure mind is that which is possessed of desire, and the pure is that which is devoid desire.

Realisation of the truth is the essential thing. Whatever you do for your religion, unless it helps towards the manifestation of the Self, know that is all no use.

*Education of Sacrifice:*By emphasizing inquiryover blind belief, the Upanishads invite students to question and understand the roots of all religious traditions. This open-mindedness discourages fanaticism and fosters inter-religious curiosity. Selfishness is the chief sin, thinking of ourselves first. Hence Upanishad says—

> ईशा वास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्।
> तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।। [9]

Whatever there is changeful in this ephemeral world— all that must be enveloped by the Lord. By this renunciation (of the world), support yourself. Do not covet the wealth of anyone.

Brihadaranyakopanishad says—

> दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत् त्रयं
> शिक्षेद् दमं दानं दयामिति।। [10]

Subdue the senses, do acts of charity, be compassionate. Practice these three virtues— control of the senses, charity, and compassion. He who has more of this unselfishness is more spiritual.

Thus,The Upanishadic idea of unity can be linked with constitutional values like fraternity, secularism, and justice. When people internalize these values spiritually, they are more likely to practice them socially. Educational Institutions can adopt Upanishadic frameworks in peer mediation programs. Concepts like non-duality and the interconnectedness of life can be powerful tools in resolving conflicts rooted in identity. In a globalized world, Upanishadic teachings provide a non-Western yet universal spiritual philosophy that can complement global citizenship education. It fosters respect not by tolerance of the other, but by recognizing the other as the Self.

Conclusion: In an era of ideological polarization and inter-religious suspicion, the Upanishads offer a luminous path of spiritual inclusivity, introspective discipline, and philosophical unity. Rather than promoting tolerance as mere endurance of the other, they invite a deeper realization of the shared divine essence in all beings. By integrating these teachings into educational frameworks, contemporary India can nurture not just informed citizens, but awakened human beings—capable of empathy, dialogue, and peace. A Sanskrit Scholar and Indologist, Paul Deussen (1845-1919) has said— "Whatever may be the discoveries of the scientific mind, none can dispute the eternal truths propounded by the Upanishads……the Upanishads have tackled every fundamental problem in life. They have given us an intimate account of reality…. On the tree of wisdom there is no fairer flower than Upanishads, and no finer fruit than the Vedanta Philosophy." The future of religious tolerance in India may well depend not on more laws or surveillance, but on a renewed commitment to the ancient yet ever-relevant ideal: "Tat Tvam Asi"—Thou art that.

Endnotes:

1. Kathopanishad, 2.2.9
2. Kathopanishad, 2.2.10
3. Taittiriopanishad, 1.11.2
4. Brihadaranyakopanishad, 1.3.28
5. Swami Vivekananda, CW, 1:385
6. Kathopanishad, 1.2.1
7. Taittiriopanishad, 1.11.1
8. Amritbindu Upanishad, 1
9. Ishabasyopanishad, 1
10. Brihadaranyakopanishad, 5.2.3

References:

1. Swami, Atmashraddhananda (2018), 'Upanishads for Students',Sri Ramkrishna Math Printing Press, Mylapore, Chennai.
2. Sharma, Dr. Ramnath (1981), 'Indian Society and Social Institution', Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, New Delhi.
3. Swami, Santoshananda (2013), 'Upanishad-Sankalan', Rama Art Press, Belghariya, Kolkata.
4. Acharya, Sugatananda Avadhuta (2014), 'HE LIVED AMONG US', Ananda Printers, Kolkata.
5. Harmony Foundation (2021), Tolerance Toolkit Report.
6. Government of India (2020), National Educational Policy (NEP)
7. Wikipedia.

The Educational Ideals of Rabindranath Tagore: A Philosophical Review

Santu Kandar *

Abstract: Rabindranath Tagore's philosophy of education was embedded in his personal experiences, Indian traditions, and animagination for comprehensive learning. His early disappointment with traditional schooling formed his sensitivity towards children's education, which led him to establish SantiniketanVidyalaya and later Visva-Bharati University. Through these establishments, he attempted to reform education by amalgamating nature, creativity, and experiential learning, moving away from inflexible, restrictive methods.

Tagore's educational philosophymergedEastern and Western philosophies, highlightingthe mother tongue as the key medium of instruction while admitting the value of English. He saw education as a way to unite humanity, free from nationalist pride and political influence. His approach was not only philosophical but also practical, as seen in Sriniketan, which made education accessible to all, especially the rural masses.

Tagore developed an innovative and comprehensive model of education with combiningscientific, psychological, and sociological perspectives, His philosophy continues to motivate modern education, offering a

* Assistant Professor, Dept. of Philosophy, Ramkrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrha.
e-mail: santuphilvm@gmail.com

progressive substitute that encourages individuality, creativity, and overall harmony. This article examines the essence of Tagore's educational philosophy, its practical applications and its lasting influence on modern education.

Keywords: Education, Integral Education, Man making Education, Traditional Education, Western Education, Eastern and Western philosophies, Visva-Bharati.

Rabindranath Tagore, an ingenious poet, philosopher, and educationist, transformed the concept of education in India. He tried to create an education system that would free the mind, inspire creativity, and establish a link between man, nature, and society, influenced by his childhood experiences. Rejecting the stiff and colonial model of education, he envisaged a holistic and global approachthat combines art, philosophy, science, and culture.

His educational experiments led to the formation of SantiniketanVidyalaya and later Visva-Bharati University, where he executed his ideals of freedom, self-expression, and experiential learning. Through Sriniketan, he enlarged education to rural communities, securing that knowledge was not limited to the elite.

Tagore's pedagogy drew inspiration from Indian traditions, Upanishadic philosophy, and modern Western thought, integrating scientific, psychological, and sociological knowledge. Because of its emphasis on experiential learning, the use of the native language, and the relationship between teacher and student, its educational model was unique and enduring.

Although Rabindranath Tagore is primarily recognized as a poet in the history of Bengali literature, his contributions span several genres including poetry, novels, plays, short stories, and more. Allaspects of life

finds illuminated in the light of his artistic creations. He did not, however, intend to engage in formal philosophical discourse. This has led to differing opinions as to whether he should be considered a philosopher.

However, if one examines his works withcuriosity, one find that while he does not systematically analyzephilosophy in the traditional sense (such as epistemology, metaphysics, or ethics), his songs, poems, novels, and plays show specific philosophical patterns. His view of life and the world suggests that he is a philosopher-poet, with a pragmatic approach to philosophy.

"*Sîmâr mâjhe asîm tumi, vâjâo âpan sura.*

Âmâr modhye tomar prokâs tâi eto madhur."[1]

An analysis of this verse reveals an expression of *visistadvaitavada* (Qualified Non-Dualism). Ramanuja, one of the leading proponents of this philosophy, asserts that both *Cit* (individual soul) and *Acit* (the material world) are as real as *Brahman*. Likewise, this lineemphasizes the coexistence of the finite and the infinite. These philosophical ideas are subtly incorporated in all of Tagore's writings.So, while he may not be a philosopher in the usual sense, his work reflects a very philosophical outlook. Let us nowsee how his philosophy is reflected in his educational teachings.

Rabindranath Tagore had a profound influence on education. His ideas brought a new dimension to pedagogy and educational philosophy. As a child, his experiences in various schools were far from pleasant, which led to dissatisfaction with the conventional education system.Because of this dissatisfaction he made his first experiment in Shilaidaha, where he sought to free children from the strict discipline ofconventional schooling. It was there, with his son Rathindranath and a few children from the village, he began an alternative method of teaching.

This first experiment, nurtured in the peaceful and abundant natural environment of theShilaidaha countryside, later matured into his broader

vision of education. Its most concrete manifestation was the establishment of SantiniketanBrahmacharya Ashram. Even though he was deeply immersed in literature, Tagore felt a strong urge to follow through on his educational aspirations. He believes that "…a fundamental flaw in the current system prevents education from becoming an integral part of life. If this defect is not corrected, education will remain something external and disconnected from true personal and social growth."[2]

This view serves as an introduction to Tagore's philosophy of education. Inspired by the ancient Indian *Gurushishya* (master-disciple) tradition, he envisioned an ashram-based system that encouraged holistic learning.

Rabindranath Tagore was deeply influenced by Upanishadic thought from a young age, absorbing its essence through his family environment. According to the Upanishads, spiritual power is universalthroughout all creation and exists within nature, human society, and the soul of each individual. Despite the apparent diversity of the world,the ultimate purpose of human life is to attain this unique divine presence in the form of happiness. Tagore considered this vision of the world soul to be the highest pursuit of life, and formed the foundation of his educational philosophy.

For him, the best education was not only about acquiring information but also about making life in harmony with the universe. He believed that true education should encourage unity between humanity, nature, and the world, transcending all diversity to find anabsolute and comprehensive unity.

However, the education system introduced by theEnglishin colonial Indiacontrasted sharply with this ideal. For Tagore, it functioned as a factory that produced only workers rather than complete individuals. He considered modern education to be closely linked to certain urban professions (civil servants, clerks, lawyers, doctors, and government officials)

while it remained completely disconnected from the real lives of the people. He said, -

"Where cultivation is being done, where the miller's grindstones turn and the potter's wheel spins, no touch of education has reached. People are picking up pebbles of notes and loading sacks of degrees, but this is not the nourishment of life. It is merely the burden of accumulation, not the glory of true living."[3]

According to Rabindranath Tagore, this type of education stifles imagination, independent thinking, and conceptual understanding. It is like a slow death in the kingdom of Saraswati, where the bent thorns indicate a lack of true intellectual and human development.

Tagore sought to liberate education from the rigid, artificial system imposed by the British and envisioned a model that harmonized nature and human society. His goal was to establish a proper balance between education and life. He designed an educational facility inSantiniketan for this purpose, where students could immerse themselves in nature, allowing him to nourish their minds and fill the void left by traditional education.

He believed that an ideal school should be located far from crowded settlements, in the open air, and in a free, and spacious environment. "Education, he believed required both the serenity of the forest and the guidance of a *Guru*. The forest symbolized a living, breathing home, while the *Guru* embodied wisdom and benevolence. He envisioned a revival of the ancient tradition, where students would practice celibacy (*brahmacharya*) and complete their education within this natural and spiritual environment."[4]

According to Rabindranath Tagore, the true aims of education should be:

1. "The holistic development of the student, which allows him to per-

ceive soul of the world in its true essence.

2. Culture of religion, as well as moral and ethical values aligned with Indian ideals.
3. Awaken a scientific mind, which allows students to explore and understand the mysteries of nature.
4. Promote social development, foster respect for ancient traditions and Indian culture."[5]

Tagore integrated these goals into a broader vision, asserting that the aim of education should be to help individuals realize their full potential, develop a personal philosophy, achieve rhythmic self-expression, and develop strong character.

He considered schools to be true centres of cultivation of human culture. He therefore believes that the school curriculum must fully reflect this culture. To achieve this, he suggests taking into account language and literature, philosophy, history, geography, arts, music, rural development and various social activities. It also incorporated the Ramayana and Mahabharata to introduce students to Indian culture and strengthen their language skills. Furthermore, regarding mental and creative development, he emphasized that painting;dance, music and travel were an integral part of education.

Tagore was strongly against rote learning. He argued that no ideal teaching method could be limited to rigid frameworks. Instead, he suggested that education be guided by three basic principles:

1. "Freedom
2. Opportunities for creative self-expression
3. Active interaction with both people and nature"[6]

He asserted, "Happiness teaches me, sorrow teaches me. I cannot rule otherwise. There is no salvation without freedom."[7]

Rabindranath Tagore did not equate freedom in education with arbitrariness. For him, freedom meant self-control- the ability of students to develop themselves through creative activities. He believed that true education must provide freedom for creative expression. According to him, a child is born into two fundamental forces: nature and societyand education must find a balance between them. To achieve this harmony, he established the ashram school at Santiniketan, where the natural environment and the ashram community would play a vital role in the education of the children.

The language of instruction was an essential aspect of Tagore's philosophy of education. He was very concerned about the excessive influence of English on the British education system of the time. He strongly believed that "the mother tongue should be the primary medium of instruction"[8], a principle that was not recommended in colonial India. To demonstrate the importance of learning the native language, he focused on Japan, where significant progress has been made in mastering the native language.

Tagore says-

"Saying that nutritious food for the people of a country can only be found in an English hotel is as absurd as claiming that knowledge cannot be pursued properly without the English language."[9]

His dream was to merge English and Bengali like the Ganges and the Yamuna, enriching the universities of Bengal and transforming them into centers of learning and enlightenment.

Another important aspect of Tagore's philosophy of education was the teacher-student relationship. He viewed this as kinship rather than authority and subordination. According to him, a teacher must be a guide and an educator, not just an instructor. He believed that a true teacher gives life and the teacher only gives lessons.

In his essay *Shiksha Vidhi*, he writes, "Man learns from man, just as water fills a reservoir, flame ignites flame, and life is transmitted by life."[10]

Similarly, in Ashramer Rur Vikash, he emphasized that a good teacher must be patient and has a natural affection for students; "Those who are fit to be teachers are those who are patient, who have natural affection for students."[11]

Tagore encouraged teachers to cultivate patience and humanity. He believed that the teacher in an ancient Tapobana (forest hermitage) was not a machine but a seeker of humanity, and those students should be able to connect with the soul of their teacher.

He beautifully expressed this sentiment in his poem *Madhyahne* from *Chhabi O Gaan*, written during his youth:

"Sei singadha tapovan Ciraphullatarugan
Harinsbaktaruchaya
Hethaymaliniandi Baheyenaniravadhi,
Risikanyakutirermajhe…"[12]

Rabindranath Tagore attached great importance to the spirit of service and depth of knowledge of the teacher. He believed that an ideal teacher is someone who is not yet hungry for knowledge, constantly seeking wisdom rather than mastery. For him, true teaching was not about exercising authority but about fostering a warm, mutual exchange of ideas and support.

In his essay *Tapovan*, reflects on the transformative power of nature in education- "In ancient India, the solitude of the forest did not stifle human intellect; rather, it nurtured a strength so profound that the stream of civilization released by the forest life (Aranyavas) has continued to nourish India to this day... the two great epochs of Indian history—the Vedic and the Buddhist-were both born in the heart of the forest."[13]

For Tagore, education was not limited to the classrooms but was an

ever-evolving journey where the teacher and the student grew together in an atmosphere of freedom, knowledge and harmony with nature.

Tagore'seducational philosophy followed and applied Indian traditions to a great extent, which he attempted to integrate into a new vision of Indian national education system through Visva-Bharati.

The essence of his educational thought resonated with the 'Integral Education'[14] of Sri Aurobindo and the 'Man-making Education'[15] of Swami Vivekananda. The aim of Sri Aurobindo's'Integral Education' is to build a human being a complete person, who is physically sound, emotionally balanced, mentally sharp, physically awakened and spiritually conscious. On the other hand the aim of Swami Vivekananda's 'Man-making Education' is building a man strong, fearless, moral and spiritually awakened. However, Tagore believed that India's national education philosophy could not be modelled on the European system, which, in his view, was a tool ofpolitical manipulation and nationalistic pride, which often fuelledethnic conflicts and wars. He completely rejected this approach, emphasizing that India's true educational ideal lay in the Upanishadic vision of '*Bhumâ*'[16] - the great, the infinite.

He declared that domination was not the goal of India; rather, ultimate fulfilment lies in unity, not in material accumulation but in self-realization and truth. In his scathing critique, he pointed out that zeal of nationalist was corrupting education, making it pride and occult. His goal was to free education fromimprison of narrow nationalism.

Tagore recognized that in the modern world, geographical boundaries were fading, and humanity was coming closer together. He believed this global unity should be based on love, not hatred, and envisioned Visva-Bharati as a center for this harmonious exchange- a place where cultures could engage in meaningful dialogue and mutual enrichment.

It is important to emphasize that his educational philosophy was not just an abstract ideal but a living reality. Sriniketan, the rural development

wing of Visva-Bharati, is a testament to this vision, embodying its belief in education that combines knowledge with practical application, self-reliance and service to society.

Rabindranath Tagore opposed any rigid or restrictive teaching methods. Instead, his approach to education was experiential, developed through stories, travel, and a deep connection with nature. In this sense, his educational philosophy was both deeply Indian and materially grounded, visionary yet practical.

Although he vigorously defended the mother tongue as the ideal language of instruction, he did not exclude English. This shows their generosity of thought: a belief in full, deep learning rather than rigid opposition. He was also against limiting education to the privileged upper classes. Sriniketan, his rural development institution, embodied his vision of public education, making learning a practical right and not a privilege.

In 1921, he changedShantiniketan Vidyalaya Ashram into Visva-Bharati University, with mission of bridge the gap between people and foster universal humanity. His purpose was to harmonize Eastern and Western cultures, encouraging a global relationship rooted in shared learning and mutual respect.

Today, Visva-Bharati University continues to uphold its ideals, working tirelessly towards its vision of a central university dedicated to unity, creativity and the advancement of knowledge for all humanity.

Tagore's philosophy of education was profoundly shaped by his childhood experiences. His own unpleasant encounters with conventional schooling made him particularly sensitive to the needs of children, inspiring his lifelong efforts to reform education.

The establishment of Santiniketan Vidyalaya and later Visva-Bharati University was a direct reflection of this vision. Throughout the National Education Movement, he remained faithful to his mission to reshape the

education system, proposing an alternative based on freedom, creativity and holistic learning.

Just as his personal life was a fusion of art, philosophy and humanism, his conception of education was an amalgamation of various intellectual ideas of the 18th and 19th centuries. He created a model of education in India by the combination of scientific, psychological and sociological principles, thereby setting a progressive and enduring example for the 20th century and beyond.

So, in conclusion we can say that,Tagore's educational philosophy was a pioneering attempt to redefine learning as an all-inclusive, experiential and liberating process. His aimwas to bridge the gap between education, nature and society. By establishing Santiniketan, Visva-Bharati and Sriniketan, he has provided a practical model of education that inspires creativity, individuality and humanitarian values.

The rejection of rigid colonial education and the emphasis on freedom, self-expression and learning the mother tongue made its pedagogy diverse and progressive. He believed that education should not only impart knowledge, but also foster moral character, artistic sensitivity, and a spirit of universal harmony.

Tagore's vision is still pertinent today and offers an alternative to learning by rote and tests. His ideas continue to motivate modern educational reforms, showing that education is not only about obtaining knowledge but also about growing individuals competent of making notable contributions to society. His legacy serves as a guide to a more inclusive, creative and person-centered approach to learning.

References:

1. Thakur, Rabindranath. Gitanjali, Allahabad: Indian Press, 1320 Bangabda, pp- 140.

2. Thakur, Rabindranath. Siksha Sanskar, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Siksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 562.
3. Thakur, Rabindranath. Shikshar Herpher, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, 25 Baishakh, 1368, pp- 542.
4. Thakur, Rabindranath. Shiksha Sanskar, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 566.
5. Thakur, Rabindranath. Shiksha Samasya, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 567.
6. Thakur, Rabindranath. Shikshabidhi, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 623.
7. Ibid, P. 623.
8. Thakur, Rabindranath. Shikshar Herpher, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368,pp- 537.
9. Thakur, Rabindranath. Shiksha Sanskar, RabindraRachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 557.
10. Thakur, Rabindranath. ShikshaVidhi, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 625.
11. Thakur, Rabindranath.Ashramer Sur Vikash, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, pp- 726.
12. Thakur, Rabindranath. Madhyahne, Rabindra Rachanavali, (Vol-1). Shiksha sachib, Paschimbanga Sarkar,Ashar, 1387, pp- 149.
13. Thakur, Rabindranath.Tapovan, Rabindra Rachanavali, (Vol-11). Shiksha Sachib, Paschimbanga Sarkar, 25 Baishakh, 1368, Pp- 597.
14. Pavitra, Hilaire. Education and the Aim of Human Life, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1991, pp- 72
15. Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-4). Advaita Ashram, October 2007. pp-212.
16. Brihadaranyaka Upanishad- 2/4/5.

Trash and the City: Environmental Review of Solid Waste Practices in Kolkata

Samik Chakraborty *

Abstract: The present study focuses on the impact of solid waste on environmental quality in the Kolkata Municipal Corporation area. Two electoral wards have been selected to examine the overall scenario of the city. A purposive sampling technique, along with qualitative methods such as observation, record keeping, case study, in-depth interviews, focus group discussions, and SWOC Analysis, has been employed to obtain the best possible outcomes. The study indicators include the amount and composition of waste generated and disposed of, greenhouse gas emissions from dumping grounds, modes of waste disposal, frequency of waste collection, the location and weekly cleaning status of roadside garbage bins, as well as the associated challenges. The major findings have been categorized into four sections: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Challenges (SWOC). The continuous increase in the volume and complexity of waste, poor public awareness, overflowing garbage bins and the resulting hazards, along with a shortage of workforce, are some of the key concerns that require immediate attention.

Keywords: Waste, Vat, KMC, Dhapa, EIA.

* Assistant Professor in Geography, Manbhum Mahavidyalaya, Purulia, West Bengal. e-mail: samikmmv@gmail.com

Introduction

Urbanization and rapid population growth are key drivers behind the increasing volume of solid waste around the world. The global trend of waste generation can be inferred from the exponential growth of the world's population (Babayemi and Dauda, 2009). The changing lifestyle of urban residents has added a new dimension to this issue, as it contributes significantly to the generation of solid waste, particularly in the form of non-biodegradable products. Lewis Mumford, in his chronological classification of cities, demonstrated how cities have evolved with increasing size and warned that they may eventually turn into necropolises if environmental considerations are ignored. The careless practices in waste management may be one of the primary contributors to this outcome. The United Nations Environment Programme (UNEP) has acknowledged solid waste management as one of the global challenges that requires urgent attention. In collaboration with the International Solid Waste Association, UNEP has published the *Global Waste Management Outlook*, which highlights the magnitude of solid waste generation, its impact on public health and environmental quality, the status of waste disposal, shortcomings in existing management practices, the implementation of the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle), and possible remedial measures. This report was prepared in accordance with the resolution passed by the UNEP Governing Council at the Rio+20 Summit. Despite growing concerns, the issue of solid waste management remains insufficiently addressed. Around 3 billion people globally still lack access to solid waste collection and proper disposal facilities (Babalola et al., 2010). Uncontrolled dumping and open burning of solid waste are two major practices severely affecting public health and environmental quality (Agamuthu and Fauziah, 2007). A major obstacle to achieving sustainable solid waste management is the continued reliance on a linear approach. There is a widespread belief that the government or Urban Local Bodies (ULBs) alone are responsible for managing solid waste. As a result, public involvement remains minimal, whereas

the opposite should be encouraged. A circular system is essential—one where all stakeholders, including the public, actively participate alongside the government to achieve sustainable solid waste management goals. Furthermore, the 3Rs must be properly implemented on a global scale (Omran et al., 2009). These are vital components of integrated solid waste management planning. Developed countries have made significant progress in waste recycling (Diaz and Otoma, 2013).

Some important statistics on the global solid waste scenario help in understanding the current situation. More than 2 billion tons of solid waste are produced worldwide every year. Domestic, commercial, industrial, and construction sectors are the major contributors to this waste. There are significant differences in solid waste management between developed and developing countries. Population explosion, rural-to-urban migration, and the increasing size and number of cities are key factors behind the rising per capita waste generation in developing countries (Bartl, 2014). Moreover, in some cases, the per capita rate of waste generation is even higher than the rate of economic growth. Assessing current trends, it is predicted that the solid waste output of low-income cities in Africa and Asia will double within the next 20 years. Globalization also plays a critical role in shaping the global solid waste scenario. It has led to developing countries becoming major producers of industrial and hazardous waste—a status once held by developed nations. Despite limited access to basic services, certain developing countries have made significant progress in organizing sustainable solid waste management systems (Ghiasinejad and Abduli, 2007). In these countries, per capita solid waste generation has been increasing since the 1970s and had doubled by the year 2000, stabilizing around 2005. However, developed countries still account for half of global solid waste generation. Since the 1990s, these countries have shown notable progress, with waste collection services rising from around 50% on average. Over 2 billion people in developing countries still lack access to proper waste collection services. Improper

solid waste management has serious impacts on public health and environmental quality (Ogwueleka, 2009). Gastrointestinal and respiratory diseases, particularly among children and the elderly, are major health issues caused by mishandled waste. Additionally, the pollution of air, surface water, groundwater, marine ecosystems, and land contributes to widespread environmental damage. Continuous air pollution from waste burning can even contribute to long-term climate change.

Moreover, unmanaged solid waste is responsible for reduced agricultural productivity, flood-related damages, and economic losses in the business and tourism sectors. As previously mentioned, uncontrolled disposal and open burning are among the biggest barriers to integrated solid waste management (Sharholy et al., 2008). Eliminating such practices is critical for achieving 100% controlled waste disposal. Since the 1990s, many developing countries have made significant progress in this area. Still today, nearly 3 billion people around the world do not have access to controlled waste disposal facilities. The GWMO has also reported a positive correlation between controlled waste disposal and income levels—high-income populations have almost achieved universal access to controlled disposal. Implementing the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) strategy remains one of the most effective approaches for achieving integrated solid waste management. However, funding for solid waste management (SWM) remains significantly lower in many major cities compared to other municipal services, and it must be increased. Public-private partnerships can be an alternative way to raise funds and adopt modern waste management strategies (Aliu et al., 2014). However, this continues to be a challenge for many countries. Taxes could be imposed on producers in proportion to the amount of waste they generate. Even low-income individuals might be willing to pay such taxes if they are assured a clean and healthy environment. An extensive public awareness campaign is also essential (Oyoo et al., 2010).

Issues such as climate change, public health, poverty, food security, resource utilization, and sustainability in production and consumption are closely linked to waste management (Singh et al., 2014). These aspects are significantly affected if waste management is not properly addressed. Long-term emissions of greenhouse gases from landfill sites—particularly methane—are among the primary contributors to changes in climate patterns. However, in recent years, improvements have been observed in landfill gas emissions, with a reduction of approximately 15 to 20 percent. Nearly 1.3 billion tons of food are wasted globally each year (Lou et al., 2013; Oelofse and Nahman, 2013). This amount of wasted food could feed the entire global population suffering from hunger twice a day, and simultaneously reduce about 9% of global landfill gas emissions if such wastage were prevented. The quantity of biodegradable waste must be minimized, as it is a key source of greenhouse gas emissions. Waste management serves as a critical indicator for assessing environmental quality (Eisted and Christensen, 2013). Additionally, a clean city reflects good governance. The goal of a clean city can be achieved by implementing a flawless solid waste management system through a holistic approach.

In Africa, the solid waste management sector has proven to be a source of sustainable livelihoods and economic opportunities for marginalized communities. In Europe, approximately one million people were engaged in waste management in the year 2000, and this number doubled within the next ten years. Today, around 15 to 20 million people are employed in small-scale, informal waste sectors worldwide. Estimates suggest that an additional 9 to 25 million new jobs could be created in this sector in the near future. The United Nations Environment Programme (UNEP) has established *Global Waste Management Goals* in alignment with the Post-2015 Development Agenda of the Sustainable Development Goals (SDGs). Since waste management is not only a global or national concern but also varies widely across local and regional contexts, UNEP has divided its goals into two phases: the first to be achieved by 2020, and

the second by 2030. By 2020, two critical objectives were to be met: providing 100% safe and cost-effective waste collection services to all, and completely prohibiting uncontrolled dumping and open burning of waste. The targets for 2030 include implementing eco-friendly waste management strategies, especially for hazardous waste; creating employment opportunities through full implementation of the 3Rs; and reducing global food waste by at least 50%, with redistribution to the underprivileged. Moreover, the current waste management system needs to shift from a linear to a circular model, involving every stakeholder in the waste generation and disposal process (Gasim, 2019). It is essential that municipal authorities are financially equipped to operate effective waste management systems. UNEP has also set specific benchmarks for developing countries. The poorest nations require international aid to improve their solid waste management systems, and the global community must step forward to direct support to the cities of these vulnerable nations. In addition, the goal is to ensure 100% waste collection coverage in cities with populations exceeding one million. Open burning of any type of waste must be strictly prohibited. Further disposal of solid waste should be entirely stopped in large dumping grounds, especially those still operating under uncontrolled and open conditions. A holistic and integrated approach is needed to manage all residual waste streams. UNEP supports the integration of sanitation systems with solid waste management and emphasizes that hazardous waste must be handled with adequate safety measures. Financial backing must be ensured, and collaborative capacity development programs across executive, procedural, and corporate sectors are strongly recommended.

In light of above considerations, the present study aims to critically examine the current practices of solid waste management, with particular focus on its impact on environmental quality in the Kolkata Municipal Corporation (KMC) area. The geographical area of Kolkata is approximately 187 sq. km; however, the Government of West Bengal has passed a

resolution to incorporate an additional area of nearly 19 sq. km from the Joka Gram Panchayat, located at the southernmost boundary of the city, under the jurisdiction of the Kolkata Municipal Corporation (KMC), as it is a natural extension of the district. The KMC is divided into 144 electoral wards and 16 Borough Committees.

Materials and Methods

The present study is based on both secondary and primary sources of information. Secondary data have been collected from various repositories of government and non-government organizations, such as the Central Pollution Control Board, India; West Bengal Pollution Control Board; Urban Development & Municipal Affairs Department, Government of West Bengal; Solid Waste Management Department, KMC; Information Technology Department, KMC; Global Waste Management Outlook (ISWA, UNEP); A Source Book on Environment of Kolkata, KMC; Methane to Markets: Assessment Report on Dhapa Disposal Site, Kolkata; Master Plan on Solid Waste Management, KEIP, KMC and Statistical Abstract, West Bengal (2015).

Kolkata (Borough Map)

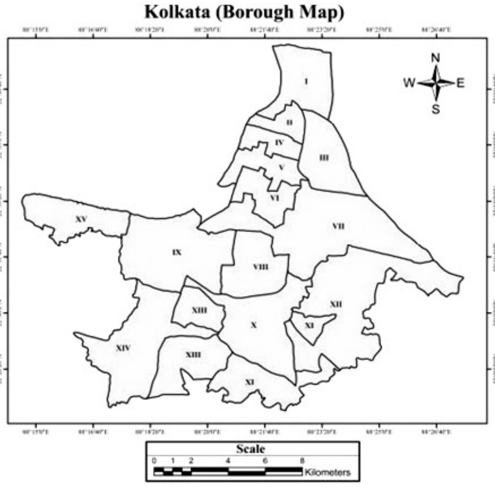

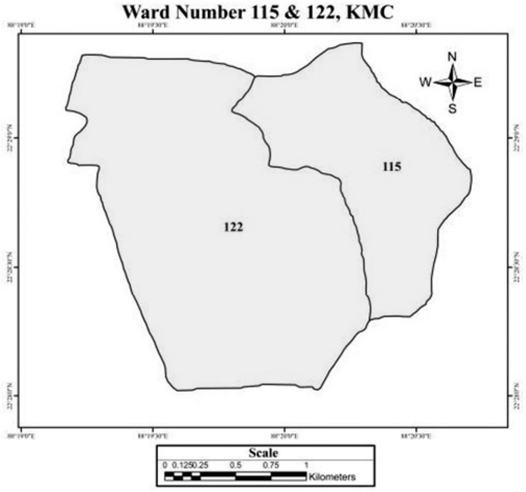

Fig. 1: Location of the study area

An extensive field survey was conducted, covering 600 households in Ward Numbers 115 and 122 of the Kolkata Municipal Corporation (KMC). Data were collected through observations, record keeping, case studies, in-depth interviews, and focus group discussions. The study aimed to gather local insights and support planning at the micro level, rather than relying on a broad, generalized model. A purposive sampling technique was employed, supported by a structured questionnaire. Half of the data were collected from familiar households and the other half from unfamiliar ones, enabling validation of the information obtained. A SWOC (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Challenges) analysis was carried out to interpret the key findings.

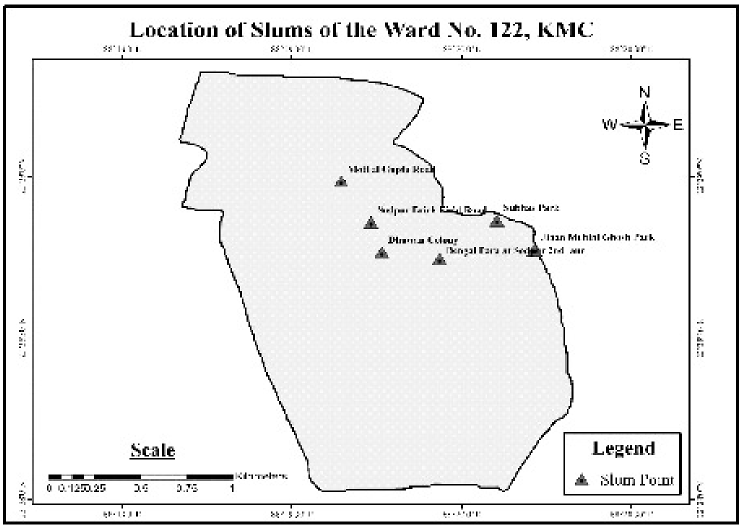

Fig. 2: Location of slums in ward no. 122, KMC

The source segregation of waste began in 2011 in seven electoral wards under the Kolkata Municipal Corporation (KMC), with Ward Number 115 being one of them (alongside Wards 33, 47, 64, 103, 110, and 130). In contrast, Ward Number 122, situated next to Ward 115, is where the author has personally witnessed the persistent issues of poor waste management and frequent waterlogging during the monsoon. Ward 115 is primarily home to residents from high to moderate income groups, while Ward 122 is largely populated by individuals from moderate to low income backgrounds. Notably, Ward 122 contains six slum areas—Subhas Park, Jiban Mohini Ghosh Park area, Bangal Para in Sodepur 2nd Lane, Taj Club area on Sodepur Brickfield Road, Dhawan Colony, and Shanti Math on Motilal Gupta Road. The central aim of the study was to conduct a comparative assessment between a well-managed ward and a typical one. For this reason, these two specific electoral wards were chosen for detailed analysis in the present study.

Ongoing waste management strategies implemented in the KMC region

The Kolkata Municipal Corporation (KMC) is the primary authority responsible for managing solid waste in the city. Notably, KMC provides this service without charging any fee from residents. While KMC has its own organizational structure and workforce for managing solid waste, it relies on private agencies for transporting waste from primary storage points to the Dhapa dumping ground. Approximately 45,000 residents in Kolkata generate around 4,286.51 metric tons of waste daily, averaging 823.83 grams per person. Of this total, 3,577.14 metric tons comprise general garbage, while 709.37 metric tons consist of silt and debris. Additionally, another 3% of the total waste comes from markets and office establishments. Households contribute 55% of the total waste generated in the city. Markets are also significant contributors, with 252 registered markets and many unregistered local markets across Kolkata.

The composition of Kolkata's solid waste includes 51% biodegradable materials and 33% inert materials and other waste. Recyclables include 4.5% green coconut shells, 6% paper, 5% plastic, 0.3% glass and ceramics, and 0.2% metals (SWM Dept., KMC). Household waste primarily consists of 45.09% fruits and vegetables and 8.84% paper. Roadside litter contains 19.2% organic waste and 17.8% ash and fine earth. Market waste comprises 32.37% leaves, hay, and straw; 25.71% fruits and vegetables; and 7.96% coconut shells. Waste from hotels and restaurants contains 18.38% fruits and vegetables, 17.09% fine particles, 15.29% plastic, and 12.71% paper (Chakrabarti, 2013).

Experimental household-level waste segregation began in 2011 in seven wards (33, 47, 64, 103, 110, 115, and 130). However, only 4.4% of the city's population currently benefits from this service. Waste recovery is limited to 20% of total waste generation—17% through recycling and 7% through composting. In central areas, the waste recovery rate is about 22%, compared to 15% in peripheral areas (Chakrabarti, 2013). Recyclables

like newspapers, cardboard, bottles, and glass are typically sorted separately and sold to local vendors. A large number of ragpickers also collect recyclable materials from roadside bins and the Dhapa disposal ground. However, there is currently no mechanism in place to measure the total volume of recyclable waste. Market waste generates about 300 metric tons of biodegradable leftovers daily, which private agencies collect and convert into compost. KMC handles the majority of waste collection across the city, with private agencies assisting in about 10% of cases.

Domestic waste collection currently covers 75% of households, exceeding the national average of 51%. However, 25% of areas remain inaccessible for door-to-door collection. The frequency and reach of waste collection vary between central and peripheral areas. In the city center, around 80% of households receive daily waste collection, compared to 60–70% in outer areas. While central areas enjoy near-daily collection, services are often irregular in the outskirts. KMC claims to collect about 97% of total waste regularly (Chakrabarti, 2013). The remaining waste often ends up in open drains, ponds, and vacant lots due to careless disposal practices by residents. Household waste is mostly collected using tricycles and handcarts, which then deposit waste into roadside bins or mobile containers. These bins frequently overflow, as most have a capacity of around 30 metric tons. Waste from these collection points is transported to the Dhapa dumping site. About 70% of this transport is handled by private trucks—around 600 trips daily, each carrying an average of 5.5 metric tons. These trucks are uncovered and only covered with tarpaulins after loading. Meanwhile, KMC operates around 315 trips daily using its own vehicles, which carry between 3.5 and 5 metric tons of waste each. Ultimately, nearly 97% of the city's waste ends up at the Dhapa dumping ground on the eastern edge of Kolkata. Of this total, around 300 metric tons of biodegradable waste are regularly diverted to composting plants.

Environmental concern sregarding the Dhapa Disposal Ground

A significant surge in waste generation has been recorded between 1981 and 2012. In 1981, the annual waste generation was 18,000 megagrams (Mg), which rose sharply to 1,329,200 Mg by 2011. Throughout this period, the volume of waste produced each year consistently increased. The primary factors contributing to this rise include a growing urban population, and the daily influx of commuters. The mounting pressure on the Dhapa disposal site is clearly evident from Table 1.

Table 1: Annual waste disposal and accumulated waste at the Dhapa disposal site

Year	Annual Waste Disposal (Mg)	Amount of Wastein Place (Mg)
1981	18000	18000
1982	20700	38700
1983	23800	62500
1984	27400	89900
1985	31500	121400
1986	36200	157600
1987	41600	199200
1988	47800	247000
1989	55000	302000
1990	63300	365300
1991	72800	438100
1992	83700	521800
1993	96300	618100
1994	110700	728800
1995	127300	856100
1996	146400	1002500

Year	Annual Waste Disposal (Mg)	Amount of Waste in Place (Mg)
1997	168400	1170900
1998	193700	1364600
1999	222800	1587400
2000	256200	1843600
2001	294600	2138200
2002	338800	2477000
2003	389600	2866600
2004	448000	3314600
2005	515200	3829800
2006	592500	4422300
2007	681400	5103700
2008	912000	6015700
2009	1277500	7293200
2010	1303100	8596300
2011	1329200	9925500
2012	1042100	10967600

Source: Assessment Report on Dhapa Disposal Site, Kolkata, India, KMC

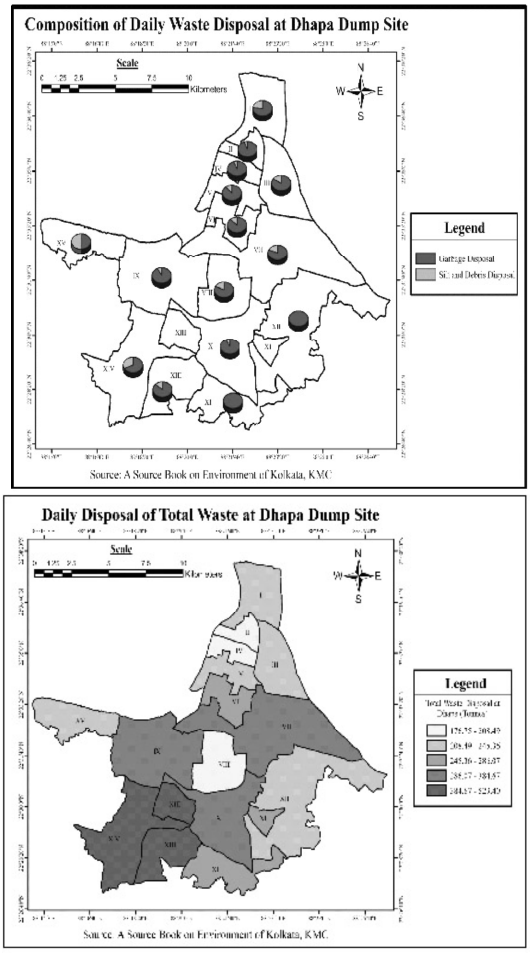

Fig. 3: Status of waste disposal at Dhapa dump site, KMC.

However, a noticeable decline of 287,100 Mg was observed in 2012. This reduction in waste disposal rates from 2012 onwards may be attributed to the initiation of waste recycling practices. Although the annual disposal rate shows a downward trend, it appears contradictory when

considering the total volume of waste accumulated at the site, which continues to rise. This is because new waste is consistently being deposited on top of the existing waste.One of the most significant contributors to environmental degradation in Kolkata is the continued use of traditional open dumping methods. Although Borough XV has a separate dumping site, the majority of the waste generated throughout Kolkata and its adjoining municipalities is still being deposited at Dhapa. Despite having infrastructure such as segregation facilities, incineration units, waste-to-energy plants, and composting systems, these efforts have not been sufficient to prevent the pollution caused by the existing waste mounds at the site. The KMC authorities are consistently striving to improve the condition of Dhapa and reduce the associated environmental damage.

Table 2: Emission of methane from Dhapa dumping ground

Year	Methane Generated from Dhapa Site (t/yr)	Amount of Methane Combusted (t/yr)	Green House Gas Reduction (t-CO²e/yr)
2009	19607	11764	247049
2010	17097	10258	215420
2011	15022	9013	189281
2012	13287	7972	167414
2013	11819	7092	148922
2014	10566	6340	133133
2015	9487	5692	119541
2016	8552	5131	107753
2017	7735	4641	97465
2018	7019	4211	88435

Source: A Source Book on Environment of Kolkata, KMC

Dhapa has long served as the primary dumping ground for Kolkata. Over time, the sheer volume of accumulated garbage has made complete removal virtually impossible. While the KMC is attempting to expand the dumping area, this approach fails to adequately address the root of the problem. Due to limited alternatives, authorities are often compelled to burn large quantities of dry waste, further compromising air quality. The surrounding environment continues to deteriorate—land buried under waste has lost its fertility, groundwater contamination is on the rise, and harmful landfill gases, particularly methane, are being emitted, posing a threat to the atmosphere. The site is also a breeding ground for scavengers such as vultures, crows, rats, gophers, mosquitoes, and flies, and its stench is noticeable even from a distance. However, it is worth highlighting that since 2009, the emission of methane and other greenhouse gases from the Dhapa site has shown a declining trend, largely due to the effective operation of waste-to-energy conversion plants.

Environmental issues of waste in the sample wards

Residents of the selected wards were asked to estimate the amount of waste they generate daily. In Ward No. 115, the average estimated daily waste generation is around 3.5 kg. About 94% of respondents reported producing no more than 2 kg of waste per day, with approximately half indicating they generate around 1 kg daily. The majority fall within the 0.5 to 1 kg range of waste generation per day.

In contrast, the volume of waste generation in Ward No. 122 is notably higher than in Ward No. 115. The maximum daily waste generation in this ward exceeds 6 kg. Similar to Ward 115, the majority of residents—approximately 93.35%—produce up to 2 kg of waste per day. This figure is nearly identical to that of Ward 115. Additionally, 2.66% of the population generates around 3 kg of waste daily, while 1.33% contribute 4 kg per day. Notably, 2% of the respondents are responsible for generating as much as 5 kg of waste each day.

Table 3: Average household waste per day (percentage)

Amount of Daily Waste Generation (kg)	Total Response (Percentage)	
	Ward Number 115	Ward Number 122
Below½	25.35	27.35
½-1	52.00	46.00
1- 1½	10.66	8.00
1½-2	8.00	12.00
2- 2½	1.33	0
2½-3	2.00	2.66
3–3½	0.66	0
3½-4	0	1.33
4- 4½	0	0
4½-5	0	2.00
5- 5½	0	0
5½-6	0	0.66

Source: Field findings

Environmental issues related to waste segregation

As previously noted, Ward No. 115 has been provided with a basic waste segregation facility by the municipal authority, which includes distributing buckets to help residents separate non-biodegradable waste. However, field investigations reveal that only 64% of respondents in this ward actually adhere to waste segregation practices. Negligence in this regard is seen across all socio-economic and educational groups, despite a reasonable level of awareness. In contrast, Ward No. 122, which lacks formal

segregation infrastructure, shows that only 24% of residents voluntarily separate their waste. Recyclable non-biodegradable materials like paper, plastic, glass, and bottles are often sold to local vendors, which has led to a lower volume of such waste in both wards when compared to biodegradable waste. Given the growing volume of waste and its harmful impact on the environment, the implementation and promotion of the 3R principle has become increasingly urgent. Municipal bodies must take active steps to enforce and popularize this approach. Proper waste segregation should be treated as a foundational step toward preventing further environmental degradation.

Environmental concerns related to waste disposal

The methods used for waste disposal significantly influence environmental quality. Improper disposal not only harms the environment but also has a direct impact on public health and hygiene. Common sights such as littered streets, overflowing community bins, and growing garbage piles on vacant plots reflect poor waste disposal practices in urban areas. While residents are often blamed, such behaviors are sometimes a result of inadequate municipal services. In the absence of regular collection, some individuals, in an attempt to reduce waste volume, resort to burning dry waste within or near their homes, an act that severely pollutes the air. A similar scenario unfolds at the Dhapa dumping ground, where large volumes of waste are burned due to a lack of alternatives, given the massive accumulation of garbage over time. This process, known as incineration in solid waste management terminology (Wang and Wang, 2013), continues due to limited options available to the Kolkata Municipal Corporation (KMC).

Improper waste disposal contributes to the contamination of air, water, and soil. When waste accumulates in one place for long periods, it degrades land quality. The most widely adopted waste collection method globally is door-to-door collection, and Kolkata follows this model. KMC attempts to provide this service consistently, but various challenges—

such as limited manpower, budget constraints, inadequate equipment, poor road conditions, and heavy workloads often hinder seamless execution. Another common disposal method involves community bins, locally known as *vats*, which serve as the initial collection points for household waste. These bins also collect waste from other urban sources. In some areas, mobile waste containers are deployed and transported to dumping grounds once full. However, irresponsible practices like discarding waste into drains, vacant lots, roadsides, and even water bodies are still observed—not always out of necessity, but sometimes due to deliberate negligence. On a positive note, a small portion of residents compost green waste for gardening or use it as animal fodder, but such practices remain limited.

Table 4: Modes of waste disposal

Modes of Waste Disposal	**Total Response (%)**	
	Ward Number 115	**Ward Number 122**
Doorto Door	76.77	61.08
Vat	3.17	14.02
Vacant Land	6.34	17.64
Road	0.52	0.94
Drain	1.05	5.42
Pond	2.11	0
Burning	5.29	0.45
Fertilizer	3.70	0.45
Useas Fodder	1.05	0

Source: Field findings

A majority of residents in both wards express confidence in the daily door-to-door waste collection service, reflecting a commendable level of civic awareness and responsibility. In Ward 115, 76.77% of respondents prefer this system, compared to 61.08% in Ward 122. Only a small proportion—2.11% in Ward 115 and 14.02% in Ward 122—use community bins (vats) for waste disposal. Despite a notable 15.69% difference in the usage of door-to-door collection between the two wards, an alarming 17.64% of residents still discard their waste on nearby vacant lands, which clearly indicates a disregard for municipal services. In Ward 115, 5.29% of residents burn dry waste, whereas in Ward 122 this figure is significantly lower at just 0.45%. Composting practices are also more prevalent in Ward 115, showing a more proactive attitude toward green waste management. Furthermore, the number of individuals who dispose of waste in drains, ponds, or on roads is nearly double in Ward 122 compared to Ward 115. A small group of residents in Ward 115 also reuse biodegradable waste as livestock fodder. Overall, based on both acceptable and improper methods of waste disposal, Ward 115 demonstrates a greater commitment to environmentally sustainable waste management practices than its adjacent counterpart.

Environmental issues related to waste collection frequency

The term *waste collection frequency* refers to how often household waste is collected. In this context, the focus is solely on the collection of domestic waste, as issues concerning the emptying of community bins (vats) are addressed separately.

Analyzing the frequency of waste collection helps us understand the overall volume of waste generated in both wards. Notably, 2.68% of residents in Ward 115 and 6% in Ward 122 still do not receive door-to-door waste collection services. Specifically, in Ward 115, 10.66% of residents report not receiving regular collection of non-biodegradable waste. The majority of responses from both wards indicated that waste is collected

Table 5: Frequency of waste collection

Waste Collecting Days	Total Response (%)		
	Ward No.115		Ward No.122
	Biodegradable Waste	Non- Biodegradable Waste	
0	2.68	10.66	6.00
1	1.33	12.66	3.33
2	3.33	52.66	2.66
3	36.00	15.36	15.33
4	4.00	2.00	10.00
5	4.00	0	4.00
6	43.33	2.66	44.00
7	5.33	4.00	14.68

Source: Field findings

daily, excluding Sundays, with nearly 45% confirming this schedule. A significant portion of residents from both wards also reported that their waste is collected at least three times a week. Since non-biodegradable waste generation is relatively low, the municipality has intentionally limited its collection to a maximum of three times per week. Despite this, some variability exists. 52.66% of respondents noted that non-biodegradable waste is picked up twice weekly. Interestingly, 14.68% of Ward 122 residents and 4% of those in Ward 115 reported enjoying uninterrupted waste collection year-round, barring major disruptions. While Ward 122 generally lags behind Ward 115 in several waste management aspects, it surpasses Ward 115 in this regard. However, the municipality must pay closer attention to the 4.66% of residents in Ward 115 and 5.99% in Ward 122 who receive waste collection only once or twice a week. These seemingly

minor lapses can lead to larger issues, as they often form the underlying causes of environmental degradation and irresponsible waste disposal practices, factors that frequently go unnoticed by authorities.

Environmental Concerns related to roadside vats

Ward No. 122 contains seven vats, while Ward No. 115 has only two. Vats function as the initial storage points where household waste is deposited before being transported to the Dhapa dumping site by trucks. Residents living close to these vats often use them for daily waste disposal. Additionally, SWM workers typically refuse to collect bulky items such as polystyrene, cardboard, and hazardous materials from households, which are then discarded in the vats. For individuals who do not receive consistent door-to-door waste collection services, these vats become the only viable option for disposing of their waste.

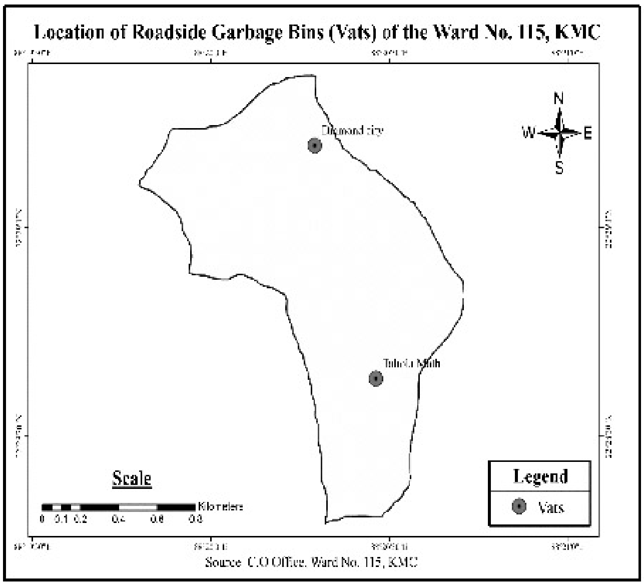

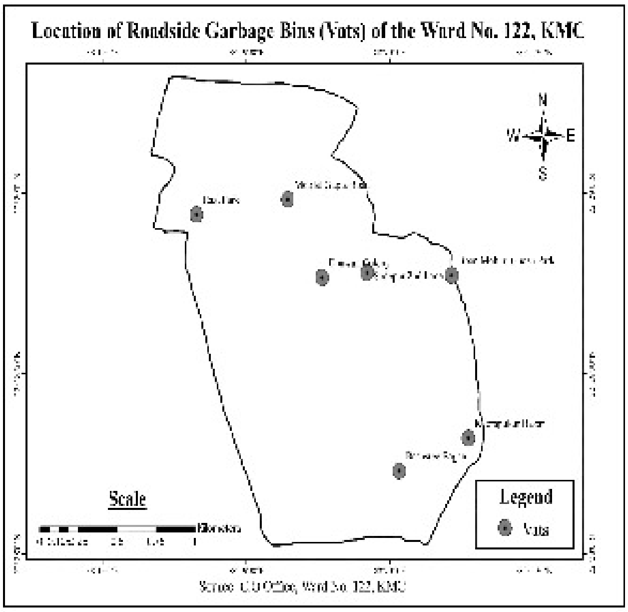

Fig. 4: Distribution of vats across the Ward Nos. 115 & 122, KMC

Approximately 7.36% of residents in Ward 115 and 5.36% in Ward 122 have access to a vat located within 100 meters of their homes. On the other hand, about 3% of the population in both wards needs to travel 1 kilometer or more to reach the nearest vat. Ward 122 is equipped with 7 vats, while Ward 115 has only 2. As a result, when vats in Ward 115 become overloaded, waste collectors often dispose of waste in vats located in adjacent Wards 97, 114, and 122. In terms of service coverage, a single vat in Ward 115 caters to approximately 3,500 households and 15,959 people, whereas each vat in Ward 122 serves around 1,142 households and 5,599 people.

The frequency at which vats are unloaded is closely linked to the overall quality of the environment. If vats are left uncovered or not prop-

Table 6: Weekly vat maintenance frequency

Unloading of Vats (in Days)	Total Response (%)	
	Ward No.115	Ward No.122
0	89.33	45.33
1	1.33	12.00
2	3.33	9.35
3	2.00	8.66
4	0	2.00
5	0	6.00
6	1.33	4.00
7	2.68	12.66

Source: Field findings

erly maintained, they can pose serious environmental risks. In Ward 115, 89.33% of residents and 45.33% in Ward 122 expressed significant concern, stating that vats in their areas are rarely, if ever, unloaded. Conversely, 2.68% of respondents in Ward 115 and 12.66% in Ward 122 reported that the vats are cleaned on a regular basis. A small portion of respondents—1.33% in Ward 115 and 4% in Ward 122—noted that vats in their neighborhoods are cleared daily, excluding Sundays. However, in most instances, vats are typically cleared only once to three times per week.

Table 7: Difficulties Surrounding Municipal Waste Vats

Nature of Problems	Total Response (%)	
	Ward No. 115	Ward No. 122
Unpleasant odour	34.78	25.53
Messy appearance	34.78	26.97
Excess accumulation	18.84	22.87
Overflow onto adjacent roadways	11.60	24.63

Source: Field findings

When biodegradable waste is left in the vats for too long without being cleared, it starts to decompose, causing foul smells. Around 34.78% of respondents in Ward 115 and 25.53% in Ward 122 reported unpleasant odours from unclear vats. Additionally, overflowing garbage that isn't removed regularly leads to an unpleasant sight. This was described as visual pollution by 34.78% of people in Ward 115 and 26.97% in Ward 122. Overfilled vats are another serious concern. After waste is removed, garbage often spills onto nearby roads, worsened by street animals dragging it further. These issues also vary with the seasons. In Kolkata, waterlogging is a frequent problem, especially in low-lying areas during the monsoon. In such times, clogged drains and blocked roads from scattered garbage cause significant disruptions for residents.

Conclusions

To conclude the study, a SWOC analysis—representing Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Challenges—has been utilized. In this context, the "Opportunities" segment also serves as the set of recommendations derived from the research. Although such an analysis typically fits within the section on analysis and key findings, it has been intentionally placed here for clarity. Additionally, a general set of suggested dos and don'ts for the entire Kolkata Municipal Corporation area has been provided, aligning with the guidelines set by the Global Waste Management Outlook (GWMO).

Strengths	Weaknesses
1. Household-level waste collection services 2. Shared neighborhood waste containers 3. Waste compaction and transportation units	1. Conventional waste management practices 2. Outdated tools and equipment 3. Limited number of waste collection sites 4. Insufficient workforce

Strengths	Weaknesses
4. Initial-stage waste separation at source 5. Employment of workers under the 100 Days Job Scheme (MGNREGA) 6. Night-time waste collection operations 7. Organic waste processing through vermi-composting facilities	5. Lack of adequate compactor facilities 6. Limited waste separation at source 7. Poorly maintained or incomplete data systems 8. Lack of sufficient financial resources 9. High expenses related to waste transportation 10. Extensive administrative coverage area 11. Dependence on a single waste disposal site

Opportunities	Challenges
1. Ensuring a sufficient and skilled workforce 2. Allocating designated waste disposal areas within each ward 3. Implementing environmentally sound incineration methods 4. Mandating segregation of waste at the source 5. Establishing separate bins for biodegradable and non-biodegradable waste 6. Practicing sanitary landfill techniques	1. Inconsistent waste removal 2. Frequent water accumulation and flooding 3. Uncovered waste bins and drainage systems 4. Lack of public awareness 5. Complex and challenging waste composition 6. Excessively burdened landfill site 7. Environmentally unsafe incineration methods

Opportunities	Challenges
7. Introducing user-based waste management charges 8. Imposing financial penalties on violators of waste regulations 9. Encouraging community involvement in waste management 10. Achieving 100% waste collection coverage 11. Implementing a robust monitoring system 12. Promoting collaboration between public and private sectors 13. Setting up dedicated research units focused on waste management 14. Deploying advanced waste collection equipment 15. Organizing public awareness and education programs 16. Conducting regular environmental audits 17. Strictly adhering to the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R) 18. Establishing composting facilities for organic waste 19. Routine pruning of trees to prevent obstruction 20. Enhancing financial investment in waste management initiatives 21. Maintaining a reliable database with open public access 22. Developing waste-to-energy conversion facilities	8. Contamination of water sources due to improper waste disposal 9. Increased risk to public health 10. Improper practices in waste disposal 11. Uncontrolled and rapid urban growth 12. Inaccurate or manipulated waste management data

The Global Waste Management Outlook (GWMO) recommends four key action areas for achieving sustainable waste management. Foremost among these is the emphasis on waste prevention, where the implementation of the 3R approach—Reduce, Reuse, and Recycle—is considered most effective. Promoting source-level segregation of waste, particularly at the household level, is essential, as it provides a cost-effective solution that can ease the financial burden on municipalities. Furthermore, the practices of unregulated open dumping and incineration must be entirely banned. While the introduction of waste collection tariffs is encouraged, such fees must remain affordable for all income groups. Energy recovery from landfill gas emissions should also be prioritized. Additionally, a dedicated strategy is required for the management of hazardous waste. It is important to note that these recommendations should be adapted to fit local conditions and tailored action plans must be formulated accordingly.

The GWMO underscores the importance of ensuring equal access to solid waste management services for all individuals. Active public participation, along with the integration of informal sector workers into the waste management system, can provide a more inclusive and comprehensive approach. It is essential for citizens to be informed about their responsibilities in handling waste. Ongoing monitoring and evaluation of current solid waste management practices are crucial for assessing progress. Rather than regretting unintended errors, these should be viewed as learning opportunities, with efforts made to address and rectify the shortcomings. Formulating an effective waste management policy requires incorporating local knowledge and insights. Careful observation is necessary to track and understand changes over time.

Municipalities need to clearly understand their financial inflows and outflows, as any new solid waste management (SWM) strategies will inevitably require adequate funding. Therefore, they should actively seek private investment in the SWM sector. A suitable financial model should be designed based on local conditions. There is no universal template that

fits all. While some general strategies may be applicable, each municipal authority should adopt a tailored framework that blends global best practices with local needs. Waste generators should be charged tariffs proportionate to the amount of waste they produce. Incentives, such as discounts, can be offered to those who follow the principles of reduce, reuse, and recycle (3R). Additionally, a compassionate approach should be adopted to accommodate the financially disadvantaged.

A comprehensive set of national-level guidelines is essential, encompassing legislative, economic, and social dimensions. Citizens must be made aware of both their capabilities and limitations regarding waste management. Departments responsible for solid waste management should be equipped with appropriate infrastructure, sufficient financial resources, skilled personnel, and full decision-making autonomy. The existing database systems require significant improvement, with an emphasis on ensuring data accuracy and reliability. Developing a habit of regular data collection should become a part of routine operations. To promote transparency, all relevant data should be made publicly accessible through official websites. Additionally, specific performance benchmarks should be established for every aspect of solid waste management, and the entire system should be organized to function in alignment with these standards.

References

1. Agamuthu, P., & Fauziah, S. H. (2007). Sustainable management of wet-market waste. In Proceedings of the International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 239–243.
2. Aliu, I. R., Adeyemi, O. E., & Adebayo, A. (2014). Municipal household solid-waste collection strategies in an African megacity: Analysis of public–private partnership performance in Lagos. Waste Management & Research, 32(9 Suppl), 67–78. https://doi.org/10.1177/0734242X14544354

3. Babalola, A., Ishaku, H. T., Busu, I., & Majid, M. R. (2010). The practice and challenges of solid waste management in Damaturu, Yobe State, Nigeria. Journal of Environmental Protection, 1, 384–388.
4. Babayemi, J. O., & Dauda, K. T. (2009). Evaluation of solid waste generation, categories and disposal options in developing countries: A case study of Nigeria. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 13(3), 83–88.
5. Bartl, A. (2014). Moving from recycling to waste prevention: A review of barriers and enablers. Waste Management & Research, 32(9 Suppl), 3–18.
6. Chakrabarti, C. (2013). A source book on environment of Kolkata. Kolkata Environmental Improvement Project, Kolkata Municipal Corporation.
7. Diaz, R., & Otoma, S. (2013). Constrained recycling: A framework to reduce landfilling in developing countries. Waste Management & Research, 31(1), 23–29.
8. Eisted, R., & Christensen, H. (2013). Environmental assessment of waste management in Greenland: Current practice and potential future developments. Waste Management & Research, 31(5), 502–509.
9. Gasim, A. L. K. (2019). Municipal solid waste management in Juba City: A case study of Juba City, South Sudan. International Journal of Scientific and Research Publications, 9(1), 476–488.
10. Ghiasinejad, H., & Abduli, S. (2007). Technical and economic selection of the optimum transfer-transport method in solid waste management in metropolitan cities. International Journal of Environmental Research, 1(2), 179–187.
11. Lou, X. F., Nair, J., & Ho, G. (2013). Potential for energy generation from anaerobic digestion of food waste in Australia. Waste Management & Research, 31(3), 283–294.
12. Oelofse, S., & Nahman, A. (2013). Estimating the magnitude of food waste generated in South Africa. Waste Management & Research,

31(1), 80–86.

13. Ogwueleka, T. C. (2009). Municipal solid waste characteristics and management in Nigeria. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 6(3), 173–180.
14. Omran, A., Mahmood, A., Abdul, A. H., & Robinson, G. M. (2009). Investigating households' attitude toward recycling of solid waste in Malaysia: A case study. International Journal of Environmental Research, 3(2), 275–288.
15. Oyoo, R., Leemans, R., & Mol, A. P. J. (2010). Future projections of urban waste flows and their impacts in African metropolises. International Journal of Environmental Research, 5(3), 705–724.
16. Singh, J., Llaurenti, R., Sinha, R., & Frostell, B. (2014). Progress and challenges to the global waste management system. Waste Management & Research, 32(9 Suppl), 800–812.
17. Sharholy, M., Ahmad, K., Mahmood, G., & Trivedi, R. C. (2008). Municipal solid waste management in Indian cities: A review. Waste Management, 28, 459–467.
18. Wang, H., & Wang, C. (2013). Municipal solid waste management in Beijing: Characteristics and challenges. Waste Management & Research, 31(1), 67–72.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Transformative Impact of Blockchain Adoption on the Auditing Profession

A. Shanker Prakash *

Abstract: This study examines the socio-economic implications of blockchain technology within the accounting and auditing profession, grounded in empirical evidence and informed by the Technology Acceptance Model (TAM) and the Diffusion of Innovation Theory. The research investigates 265 accounting and finance professionals to study perceived usefulness, ease of use, organizational readiness and governance concerns associated with blockchain adoption. Structural Equation Model using Smart PLS 4.0 software confirms that operational efficiency, perceived usefulness and transparency significantly influence blockchain adoption, while regulatory uncertainty and skill gaps remain key deterrents. However, the study underscores blockchain's potential to enhance automation, transparency, fraud detection and stakeholder trust, alongside risks such as job displacement,high initial investment costs and challenges integrating with legacy. The analysis emphasizes the critical need for proactive policy interventions, workforce development initiatives, and robust regulatory frameworks to maximize the benefits of blockchain technology while mitigating potential risks and ensuring equitable adoption within the accounting and auditing profession.

* Assistant Professor, Department of Commerce, Saheed Anurup Chandra Mahavidyalaya (Affiliated to the University of Calcutta).
e-mail: iyer.prakash2@gmail.com

Keywords: Blockchain technology, Accounting and auditing, Socio-economic implications, Operational efficiency, Transparency and trus.

1. Introduction

Blockchain technology is rapidly transforming the global technological landscape, As per Grand View Research, the global blockchain technology market was valued at approximately USD 31.3 billion in 2024 and is projected to reach USD 1.43 trillion by 2030 . This represents an extraordinary compound annual growth rate (CAGR) of 90.1% from 2025-2030. Such exponential expansion underscores blockchain's increasing relevance andwidespread adoption across industries. Among the sectors poised for significant disruption, accounting and auditing stand out due to blockchain's potential to revolutionize the way financial information is recorded, verified and audited.

The emergence of blockchain prototypes in auditing, particularly EY's blockchain based audit initiatives marked a significant shift in auditing practices around 2016.Traditionally, accounting practices relied on centralized databases mechanism and heavily dependent on third-party verification processes. Blockchain challenges this paradigm by introducing a decentralized, immutable ledger that ensures secure, transparent and tamper-proof financial record-keeping, thereby reducing the dependence on third-party verification processes.

Within accounting, blockchain enhances operational efficiency by automating routine tasks such as reconciliations and compliance checks. This automation reduces human error and frees accounting professionals to focus on strategic activities like financial analysis and advisory roles. Furthermore, blockchain's immutable nature ensures that all transactions are permanently recorded and auditable, thereby increasing the reliability and integrity of financial reporting.

In the auditing domain, blockchain enables access to real-time, secure financial data through "read-only" nodes, allowing for continuous auditing and real-time verification of financial statements. This capability significantly reduces the time and cost associated with traditional audits, while enhancing audit quality and stakeholder trust. As a result, blockchain supports the development of more responsive and transparent assurance practices.

Blockchain adoption in accounting and auditing carries profound socio-economic implications. As the global economy becomes more interconnected and digitally driven, the need for accurate, real-time financial information is more critical than ever.Blockchain's decentralized architecture and cryptographic security address this need by offering a resilient infrastructure for financial information management. Its application also helps mitigate fraud, enhance regulatory compliance, and support adherence to evolving legal and ethical standards.

However, the adoption of blockchain is not without its challenges. Regulatory uncertainty, governance issues, technical integration with legacy systems, and a lack of skilled professionals pose significant obstacles. Additionally, the risks related to cybersecurity, scalability, and interoperability require careful examination and proactive mitigation. Addressing these concerns is critical for the successful integration of blockchain into mainstream accounting and auditing practices.

Although literature acknowledges blockchain's technical potential, few studies offer empirical evidence on its socio-economic impact within the auditing profession—especially in the Indian context. This study addresses that gap by evaluating how accounting professionals perceive blockchain's usefulness, efficiency, and governance challenges using a mixed-methods approach.

2. Need for the Study

The adoption of blockchain technology in accounting and auditing presents both transformative opportunities and complex challenges. While its benefits in enhancing transparency, automation, and data integrity are increasingly acknowledged, full implementation remains hindered by several barriers, as outlined below:

i. **Unexplored Regulatory Dimensions:** Key regulatory and governance issues related to blockchain—such as those involving crypto-assets, taxation frameworks, and financial disclosure requirements—remain insufficiently addressed in current literature.

ii. **Implementation Barriers:** Widespread adoption is hindered by persistent challenges, including cybersecurity risks, limited system interoperability, and a growing skills gap among accounting and auditing professionals.

iii. **Limited Auditing Research:** The impact of blockchain on the auditing profession is not well understood. Research is limited on topics such as blockchain-enabled real-time audits, audit evidence derived from distributed ledgers, and its implications for internal control and risk assessment mechanisms.

iv. **Evolving Accounting Models:** Emerging innovations like triple-entry bookkeeping, immutable audit trails, and smart contract-based automation demand a reassessment of traditional accounting structures and standards.

While large auditing firms have taken proactive steps in piloting blockchain-based audit solutions, such as real-time audit trails and automated compliance checks, there remains a gap in academic research evaluating these industry innovations and their broader socio-economic impacts. This study aims to bridge that divide.

3. Objectives of the Study

i. To explore the transformative potential of blockchain technology in accounting and auditing practices, focusing on its ability to enhance transparency, efficiency, and accuracy.

ii. To analyse the regulatory and governance challenges associated with blockchain adoption in accounting, including implications for crypto-assets, taxation, and disclosure requirements.

iii. To examine the perceived risks and barriers to blockchain implementation, such as cybersecurity concerns, interoperability issues, skill gaps, and resistance to change within the accounting and auditing profession.

4. Literature Review

Blockchain technology introduces an immutable and transparent ledger that is fundamentally transforming traditional accounting and auditing practices (Nakamoto, 2008; Swan, 2015). Its decentralized architecture enhances data integrity, reduces fraud risk, and improves the reliability of financial information (Wood et al., 2016; Pilkington, 2017; Tapscott & Tapscott, 2018). The implementation of smart contracts allows for automated execution of predefined actions, further streamlining accounting operations and record-keeping (Buterin, 2014; Mougayar, 2016; Zheng et al., 2017).

In the auditing domain, blockchain provides tamper-resistant records that enable faster and more accurate transaction verification (Yermack, 2017; Coyne & McMickle, 2017). Wang and Kogan (2018) proposed a blockchain-based model for continuous auditing, reducing the reliance on traditional audit sampling techniques. Weigand et al. (2020) highlighted blockchain's potential to strengthen audit assurance, especially in sectors requiring high levels of traceability and compliance.

Empirical studies have begun to validate these theoretical claims.

Hashem et al. (2023), in a study on Egyptian banks, found that blockchain adoption significantly enhances audit efficiency and reliability by enabling real-time audit trails and minimizing manual reconciliations. Prasad and Sinha (2023) reported similar results in the Indian context, demonstrating that blockchain implementation improved audit quality, particularly in areas of internal control validation and fraud prevention.

Sharma (2025) further explored the integration of blockchain into management accounting systems and found measurable improvements in data transparency and reduction of transactional errors, with implications for real-time assurance. Similarly, Seshadrinathan and Chandra (2025) applied the Technology–Organization–Environment (TOE) framework to accounting firms in South Asia and concluded that organizational readiness and trust were critical enablers of blockchain acceptance in audit processes.

Despite these promising developments, blockchain implementation continues to face substantial challenges. Studies by Babich and Hilary (2020), Deloitte (2016), and PwC (2018) identify key barriers such as regulatory uncertainty, interoperability issues, and lack of skilled personnel. Hsieh and Brennan (2022) emphasize specific auditing complexities arising from crypto-assets, including ownership verification, valuation volatility, and custodial risks. These findings underscore the pressing need to revise existing audit and assurance standards to accommodate blockchain-enabled environments.

Additionally, integrating blockchain with established financial reporting frameworks remains a complex task. PwC (2019) noted that while blockchain enhances transparency, current IFRS and GAAP standards are not fully equipped to address issues related to fair value estimation, intangible asset recognition, and smart contract interpretation. A 2024 study published in the International Journal of Accounting Information Systems confirmed that the absence of updated regulatory guidelines remains a deterrent for widespread blockchain adoption in financial re-

porting.

Real-world applications continue to demonstrate blockchain's potential. Fahdil et al. (2024) conducted multiple case studies across Gulf-based firms, showing that blockchain integration led to reduced audit cycle times, improved fraud detection, and better regulatory alignment. A recent systematic review by Alexandri et al. (2024), covering over 75 peer-reviewed studies, synthesized evidence on blockchain's impact on auditor independence, reporting quality, and ethical assurance practices.

Furthermore, studies by Farahani et al. (2021) reveal that blockchain's interoperability with IoT can further enhance auditing processes by enabling real-time data capture and reducing the risk of manual data manipulation. Global firms such as EY, Deloitte, KPMG, and PwC have also pioneered blockchain-based audit solutions, including real-time transaction verification, automated evidence gathering, and smart contract auditing (EY, 2023; KPMG, 2022). These corporate innovations align with academic findings, confirming that blockchain is poised to redefine the audit profession in terms of operational efficiency, transparency, and stakeholder trust.

Taken together, the reviewed literature affirms blockchain's transformative potential for the auditing profession. However, achieving this transformation requires not only technological readiness but also regulatory evolution, workforce upskilling, and ethical integration. These factors continue to shape the trajectory of blockchain's adoption in accounting and auditing globally.

5. Research Methodology

This study employs a **mixed-methods research design** to provide a comprehensive explore the socio-economic implications of blockchain technology in accounting and auditing. A combination of quantitative and qualitative data was collected to capture both measurable trends and rich contextual insights.

5.1 Research Design and Sampling Strategy

A mixed-methods approach was chosen to align statistical findings with real-world perceptions. The sample consisted of **265 accounting and finance professionals in India**, selected using **purposive stratified sampling** to ensure diverse representation from large firms, SMEs, consultancies, and regulatory bodies. This diversity allowed the study to capture varying levels of organizational readiness and technology adoption maturity.

5.2 Data Collection Tools

Data were collected using a structured questionnaire comprising Likert-scale and closed-ended items. **Survey themes focused on** operational efficiency, automation, trust and transparency, perceived usefulness, fraud mitigation, skill preparedness, and governance barriers related to blockchain.

5.3 Analytical Framework

Quantitative data were analysed using **Structural Equation Modeling (SEM)** via **SmartPLS-4.0 software**. Reliability, validity, and model fit were evaluated using standard metrics such as Cronbach's Alpha, Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE), and the Fornell-Larcker criterion. Path coefficients and bootstrapping (t-values, p-values) were used to test hypotheses. Qualitative data from open-ended responses were thematically coded to gain insights into organizational barriers, workforce readiness, and policy expectations.

5.4 Reliability and Validity

The questionnaire was pilot tested with 20 professionals for clarity. The constructs demonstrated strong internal consistency: **Cronbach's alpha values exceeded 0.7**, confirming reliability.

6. Results and Findings

6.1 Measurement Model Evaluation

The constructs exhibited acceptable reliability and convergent validity.

Table 1: Reliability and Convergent Validity

Construct	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Perceived Usefulness	0.84	0.89	0.68
Ease of Use	0.81	0.87	0.66
Organizational Readiness	0.79	0.85	0.61
Perceived Transparency	0.86	0.9	0.71
Operational Efficiency	0.88	0.92	0.75
Governance Concern	0.8	0.86	0.64

(**Source-** Author's compilation 2025)

Discriminant Validity

Discriminant validity was verified using the Fornell-Larcker criterion.

Table 2: Fornell-Larcker Criterion

Construct	PU	EoU	OR	PT	OE	GC
1. Perceived Usefulness	**0.824**					
2. Ease of Use	0.643	**0.812**				
3. Organizational Readiness	0.527	0.602	**0.781**			
4. Transparency	0.613	0.585	0.592	**0.843**		
5. Operational Efficiency	0.678	0.594	0.537	0.645	**0.866**	
6. Governance Concern	-0.391	-0.428	-0.402	-0.362	-0.319	**0.8**

(**Source-** Smart-PLS 4 software 2025)

To assess the measurement model, the constructs were evaluated for reliability and convergent validity. As shown in **Table 1**, all constructs have Cronbach's Alpha values above 0.79, exceeding the recommended threshold of 0.70, confirming internal consistency. Composite Reliability (CR) values are all above 0.85, while Average Variance Extracted (AVE) scores exceed the minimum required value of 0.50, establishing convergent validity.

Additionally, **Table 2** displays the Fornell-Larcker criterion for discriminant validity. The diagonal bold values represent the square root of AVE, and these values are greater than the inter-construct correlations in their respective rows and columns. This confirms that each construct is distinct from others in the model, satisfying the requirement for discriminant validity.

6.2 Structural Model and Hypothesis Testing

Table 3: Path Coefficients and Significance

Hypothesis	**Path Coefficient (β)**	**t-value**	**p-value**	**Decision**
H1: Operational Efficiency → Adoption	0.37	5.93	<0.001	Supported
H2: Perceived Usefulness → Adoption	0.34	5.47	<0.001	Supported
H3: Transparency → Adoption	0.31	4.88	<0.001	Supported
H4: Ease of Use → Adoption	0.28	4.26	<0.001	Supported
H5: Organizational Readiness → Adoption	0.22	3.64	<0.001	Supported
H6: Governance Concern → Adoption	-0.19	2.92	0.004	Supported (Negative)

(**Source-** Smart-PLS 4 software 2025)

The structural model was analysed to test the hypothesized relationships. As detailed in **Table 3**, all six hypotheses were statistically supported with p-values below 0.05 and t-values well above the critical value of 1.96. The strongest predictor of blockchain adoption was **Operational Efficiency** ($\beta = 0.37$, $t = 5.93$), followed by **Perceived Usefulness** ($\beta = 0.34$, $t = 5.47$) and **Perceived Transparency** ($\beta = 0.31$, $t = 4.88$). Notably, **Governance Concern** had a negative and statistically significant effect ($\beta = -0.19$, $p = 0.004$), indicating that higher concerns regarding governance and regulation reduce the likelihood of adoption.

6.3 Model Fit and Predictive Relevance

The model's explanatory strength and robustness were assessed using a range of fit indices summarized in **Table 4**. The R^2 value for blockchain adoption is **0.67**, indicating that 67% of the variance is explained by the model, which reflects substantial explanatory power. The Q^2 value of **0.41** suggests strong predictive relevance, and an SRMR of **0.061** indicates a good model fit (threshold < 0.08).

The f^2 valuesindicate medium effect sizes for **Operational Efficiency (0.26)**, **Perceived Usefulness (0.23)**, and **Transparency (0.20)**, suggesting these constructs have meaningful influence on adoption. VIF values for all constructs range between 1.24 and 2.19, well below the multicollinearity threshold of 5, confirming that there is no collinearity issue among predictors.

The results validate the theoretical framework proposed in this study. Operational efficiency, trust-building through transparency, and perceived usefulness emerged as critical determinants for blockchain adoption in accounting and auditing. Governance concerns serve as a barrier, aligning with qualitative feedback regarding regulatory ambiguity, insufficient policy guidelines, and digital skill shortages.

Table 4: Model Fit and Interpretation

Metric	**Value**	**Interpretation**
R^2 (Blockchain Adoption)	0.67	Substantial explanatory power
Adjusted R^2	0.65	Acceptable model adjustment
Q^2 (Predictive Relevance)	0.41	Strong predictive relevance
SRMR	0.061	Good model fit
f^2 (Effect Sizes)	Operational Efficiency: 0.26	Medium effect size for major constructs
	Perceived Usefulness: 0.23	
	Transparency: 0.20	
VIF (Variance Inflation Factor)	Range: 1.24 – 2.19	No multicollinearity detected
Bootstrapping (Path Significance)	All major paths significant at $p< 0.05$	Supports model robustness
Path Coefficients (β)	OE ! 0.37	All positive and significant
	PU ! 0.34	
	PT ! 0.31	
	EoU ! 0.28	
	OR ! 0.22	
AVE (Average Variance Extracted)	All constructs > 0.60	Meets convergent validity threshold
Composite Reliability (CR)	All constructs > 0.85	Excellent construct reliability
Cronbach's Alpha	All constructs > 0.80	Strong internal consistency

(**Source-** Smart-PLS 4 software 2025)

6.4 Findings

The results of the structural model analysis confirm the hypothesized relationships and provide meaningful insights into the drivers and barriers of blockchain adoption within the accounting and auditing profession.

Among the six constructs tested, **Operational Efficiency** emerged as the most influential predictor of blockchain adoption (**â = 0.37**, **f^2 = 0.26**, **t = 5.93**, $p <$ 0.001). This indicates that professionals perceive blockchain as a valuable tool for streamlining financial processes, reducing redundancy, and enhancing task automation. Its medium effect size emphasizes the practical appeal of efficiency gains in resource-constrained accounting environments.

Perceived Usefulness also plays a significant role (**â = 0.34**, **f^2 = 0.23**, $p <$ 0.001), reinforcing the idea that professionals are more likely to adopt blockchain when they perceive it as helpful for improving decision-making, internal control, and audit accuracy. Similarly, **Perceived Transparency** demonstrates a strong positive impact on adoption (**â = 0.31**, **f^2 = 0.20**), showing that trust, auditability, and data immutability are essential drivers for acceptance, particularly in highly regulated financial settings.

While **Ease of Use** (**â = 0.28**, $p <$ 0.001) and **Organizational Readiness** (**â = 0.22**, $p <$ 0.001) also contribute positively to adoption, their slightly lower effect sizes suggest that although usability and resource availability are relevant, they may not be sufficient on their own without demonstrable value creation.

Notably, **Governance Concern** exerts a statistically significant **negative influence** on adoption (**â = ‼ 0.19**, **t = 2.92**, $p =$ 0.004). This indicates that apprehensions related to unclear legal frameworks, cybersecurity risks, taxation policies, and compliance burdens are major barriers. These concerns were echoed in qualitative responses, where several participants cited lack of regulatory direction and absence of audit-specific blockchain

guidelines as deterrents.

The model's explanatory power is robust, with **R^2 = 0.67**, meaning the five predictors account for 67% of the variance in blockchain adoption behaviour. **Q^2 = 0.41** confirms strong predictive relevance, while the **SRMR value of 0.061** demonstrates a good model fit. Additionally, all **Variance Inflation Factor (VIF)** values fall between **1.24 and 2.19**, indicating no multicollinearity among predictors. Bootstrapping (5,000 samples) confirmed that all path coefficients are statistically significant ($p < 0.05$), establishing the model's validity and reliability.

6.5 Practical Implications

Firms should address the blockchain talent shortage by investing in specialized upskilling in areas like smart contract auditing and digital forensics. Regulators must issue clear blockchain audit guidelines and data protocols to reduce uncertainty and foster trust. Audit firms can enhance efficiency and fraud detection by adopting blockchain for real-time assurance and continuous auditing. SMEs can overcome cost and skill barriers through collaborative models like blockchain-as-a-service and shared platforms.By addressing these gaps, firms and regulators can pave the way for secure, efficient, and transparent financial ecosystems enhanced by blockchain.

7. Conclusion

Blockchain technology holds significant potential to transform the accounting and auditing professions by enhancing operational efficiency, data transparency, and trust in financial reporting. This study empirically confirms that operational efficiency (β = 0.37), perceived usefulness (β = 0.34), and perceived transparency (β = 0.31) are the strongest positive predictors of blockchain adoption. These factors collectively explain 67% of the variance (R^2 = 0.67) in adoption behaviour, underscoring the growing interest among accounting professionals in leveraging blockchain for

automating manual tasks, improving audit accuracy, and enhancing regulatory compliance.

Conversely, governance concerns (β = -0.19) significantly hinder adoption, highlighting challenges such as regulatory uncertainty, cybersecurity risks, and lack of legal clarity. These findings suggest that while the technological promise of blockchain is well recognized, its full integration into the auditing ecosystem requires overcoming substantial institutional and policy barriers.

To facilitate successful adoption, organizations must invest in robust digital infrastructure, implement blockchain-specific training and capacity-building initiatives, and collaborate with policymakers to develop transparent and adaptive regulatory frameworks.These actions will be critical in shaping a resilient, ethically grounded, and future-ready financial ecosystem, where blockchain enhances the credibility, traceability, and effectiveness of audits.

8. Limitations and Future Research

While this study offers valuable insights into the socio-economic implications of blockchain adoption, several limitations should be acknowledged.

First, the study's geographic focus on India may limit the applicability of findings to other regulatory and technological environments.

Second, although self-reported data effectively capture perceptions and behavioural intent, they may introduce subjective bias despite the use of validated instruments and ensured anonymity.

Third, the cross-sectional design captures perceptions at one point in time, necessitating longitudinal studies to observe changes in adoption behaviour over time.

Finally, ethical dimensions such as data sovereignty, algorithmic accountability, and auditors' evolving roles were not explored in depth and present opportunities for future research

References

i. Adhami, S., Giudici, G., & Martinazzi, S. (2018). Why do businesses go crypto? Journal of Economics and Business, 100, 64–75. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.001

ii. Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin: Unlocking digital cryptocurrencies. O'Reilly Media.

iii. Babich, V., & Hilary, G. (2020). Distributed ledgers and operations: What operations management researchers should know about blockchain technology. Manufacturing & Service Operations Management, 22(2), 223–240. https://doi.org/10.1287/msom.2018.0752

iv. Beck, R., Müller-Bloch, C., & King, J. L. (2018). Governance in the blockchain economy: A framework and research agenda. Journal of the Association for Information Systems, 19(10), 1020–1034. https://doi.org/10.17705/1jais.00518

v. Buterin, V. (2014). Ethereum: A next-generation smart contract and decentralized application platform. Ethereum Foundation. https://ethereum.org/en/whitepaper/

vi. Carlin, B. I. (2019). Blockchain and the future of financial services. Annual Review of Financial Economics, 11, 357–379. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110118-123055

vii. Coyne, J. G., & McMickle, P. L. (2017). Can blockchains serve an accounting purpose? Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14(2), 101–111. https://doi.org/10.2308/jeta-51949

viii. Dai, J., &Vasarhelyi, M. A. (2017). Toward blockchain-based accounting and assurance. Journal of Information Systems, 31(3), 5–21. https://doi.org/10.2308/isys-51804

ix. Deloitte. (2016). Blockchain: Enigma. Paradox. Opportunity. Deloitte UK. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-blockchain-full-report.pdf

x. EY. (2023). How blockchain could introduce real-time auditing. https://www.ey.com/en_my/assurance/how-blockchain-could-introduce-

real-time-auditing

xi. Farahani, B., Firouzi, F., & Luecking, M. (2021). The convergence of IoT and distributed ledger technologies (DLT): Opportunities, challenges, and solutions. Journal of Network and Computer Applications, 177, 102936. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102936

xii. Hsieh, S., & Brennan, G. (2022). Issues, risks, and challenges for auditing crypto asset transactions. International Journal of Accounting Information Systems, 46, 100569. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100569

xiii. Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2017). The truth about blockchain. Harvard Business Review, 95(1), 118–127. https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain

xiv. KPMG. (2021). Blockchain: What does it mean for the audit? https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/za/pdf/2021/blockchain-what-does-it%20mean-for-the-audit.pdf

xv. Mougayar, W. (2016). The business blockchain: Promise, practice, and application of the next Internet technology. Wiley.

xvi. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

xvii. Pilkington, M. (2017). Blockchain technology: Principles and applications. In F. Xavier Olleros & M. Zhegu (Eds.), Research handbook on digital transformations (pp. 225–253). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781784717766.00019

xviii. PwC. (2019). Cryptographic assets and related transactions: Accounting considerations under IFRS. https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-16/cryptographic-assets-related-transactions-accounting-considerations-ifrs-pwc-in-depth.pdf

xix. Roszkowska, P. (2020). Fintech in financial reporting and audit for fraud prevention and safeguarding equity investments. Journal of Accounting and Organizational Change, 17(2), 164–196. https://doi.org/10.1108/JAOC-01-2020-0007

xx. Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. O'Reilly Media.

xxi. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world. Penguin.

xxii. Tiron-Tudor, A., & Deliu, D. (2022). Reflections on the human-algorithm complex duality perspectives in the auditing process. Qualitative Research in Accounting & Management, 19(2), 255–285. https://doi.org/10.1108/QRAM-06-2021-0083

xxiii. Weigand, H., Elsas, P., & van der Linden, E. (2020). The impact of blockchain technology on the future of audit and assurance. Accounting Horizons, 34(3), 123–141. https://doi.org/10.2308/acch-18-030

xxiv. Wood, G., et al. (2016). Ethereum: A secure decentralized transaction ledger. Ethereum Foundation. https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

xxv. Yermack, D. (2017). Corporate governance and blockchains. Review of Finance, 21(1), 7–31. https://doi.org/10.1093/rof/rfw074

xxvi. Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends. Proceedings of the 2017 IEEE International Congress on Big Data, 557–564. https://doi.org/10.1109/BigDataCongress.2017.85

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Divergence of Indian Stock Market From Global Market Post-COVID

Bishal Routh [1] Joy Sarkar [2]

Abstract: In this paper, we investigate the ambiguity surrounding whether the Indian stock market is integrated or segmented following the COVID-19 pandemic. Since COVID-19, we have seen a continuos increase in the diverse pattern of daily returns. The methodology employed in the study makes it unique, as it enables us to determine whether the Indian Stock Market is partially integrated or segmented. This differs from the two common methods used in literature: correlation and cointegration.

The analysis based on the Pukthaunthong and Rolls framework found that pre-COVID, the market was nearly perfectly aligned with the global market; however, in COVID and post-COVID, the influence of global factors is considerably reduced, indicated that the market is more of a segmented one. The result of consolidated data exhibits a similar pattern: that is, the Indian stock market is more segmented than integrated.

1. Introduction

Financial market theories propose that in fully integrated markets, investors shoulder both global and local assets in their portfolios; such portfo-

1 Assistant Professor, Balarampur College. Purulia.
e-mail: bishalrouth94@gmail.com
2 Assistant Professor, University of North Bengal.

lios carry equivalent risk and exhibit identical expected returns, regardless of the market. Conversely, in fully segmented markets, asset prices differ between countries, with prices and returns predominantly influenced by domestic risks. The majority of markets, notably emerging ones, exhibit partial integration, where prices reflect a blend of local and global factors, consequently determining expected returns based on both risk sources (Bekaert and Harvey, 1995).The original impetus behind stock market integration studies was to explore the advantages of diversification attained through investments spanning global stock markets (Chancharat, 2009). Grubel (1968) developed international portfolio diversification on the backdrop of Markowitz's (1950) theory of portfolio diversification, which highlights that segmented markets offer significant benefits in terms of both risk mitigation and return enhancement. Given the non-synchronous movements of national economies, investors can diversify their portfolios across multiple countries, a practice recognized for its benefits over many years. International diversification, compared to domestic diversification, minimizes risk by balancing individual country risk factors, thereby diminishing portfolio systematic risk to encompass only 'world' risk factors—those shared across all countries. Numerous researchers have compellingly advocated for international portfolio diversification over solely domestic diversification within the mean-variance portfolio analysis framework (Alder & Dumas, 1983; Eun & Resnick, 1988; Lessard, 1973; Solnik, 1974).

Over the past two decades, numerous countries have undertaken liberalization and deregulation measures in their capital and foreign exchange markets. Additionally, advancements in technologies have significantly lowered transaction and information costs associated with global investments. Consequently, investors have become increasingly cognizant of the potential gains from international investment, leading to greater market integration.

The issue of stock market integration holds significant implications for both investors and corporate managers. As stock markets become more intertwined and move in tandem, the diversification benefits of investing across multiple countries have diminished.

On 5th March 2024 benchmark index Nifty 50 of the Indian Stock Market witnessed a sharp decline of 200 points (approx.), whereas the previous closing of global markets was closed nearly above 200 points positive. Such a divergence is rare among the major global indexes in an era where the financial market is highly integrated. This has prompted consideration of whether the domestic market is diverging from the global market. Thus, the question arises: Is the Indian Stock Market integrated or segmented? Investors and portfolio managers are keenly interested in the segment of the equity market across the globe, seeking to optimize risk-return dynamics in their investment portfolios. They aim to discern which countries' stock prices move in sync, which move opposite, and which show little correlation. Given the intricate nature of foreign investment, its identification of a segmented market is of great use to investors.

Hence, this paper tried to investigate which factors, global and domestic dominate the returns of the Indian Stock Market in the process of identifying whether the market is integrated or segmented post-COVID. The structure of the paper is outlined as follows: Section 2 presents a literature survey of Stock Market Integration. Section 3 delves into the chosen methodology for the study. Section 4 explores the characteristics of the data, while Section 5 presents the empirical results and practical implications. Finally, Section 6 provides the concluding remarks for the paper.

2. Literature Review

Stock market integration describes how markets across regions move together, leading to identical returns on assets for a given level of risk. As Bekaert and Harvey (1995) explain, full integration arises when assets with

equivalent risk offer the same expected returns regardless of market conditions. The liberalisation of international capital markets and removal of various barriers have empowered investors, portfolio managers, researchers, and policymakers to engage actively with stock market integration, as their decisions depend on its outcomes. Studies in this field have significantly influenced international portfolio diversification, investment strategies, and the financial stability of economies.

Before 1997, only a handful of studies, such as Hamao et al. (1990), Arshanpalli and John (1993), Fun and Shim (1989), Mittoo (1992), Campbell and Hamao (1992), Agmon (1972), and Bekaert and Harvey (1995), explored stock market integration. Over the past two decades, however, research has expanded considerably. Notable contributions include Elyasiani et al. (1998), Huang et al. (2000), Nielsson (2007), Jeon and Jang (2004), Janakiramanan and Lamba (1998), Masih and Masih (1999), Siddiqui (2008), Ratanapakorn and Sharma (2002), and Ewing et al. (1999). These studies employed advanced econometric tools such as Unit Root Stationarity Tests, Cointegration Tests, Causality Analysis, VAR and VECM models, Impulse Response Functions, and Variance Decomposition Analysis to investigate inter-market linkages.

Geographically, the majority of studies focus on India (Raj and Dhal, 2008; Chittedi, 2010; Bose and Mukherjee, 2005; Dhal, 2009; Subramanian, 2009; Mukherjee and Bose, 2008, etc.), followed by the US (Hassan and Naka, 1996; Campbell and Hamao, 1992; Yang et al., 2006; Hamao et al., 1990; Anorou et al., 2003; Parker and Rapp, 1999, etc.), the UK (Antoniou et al., 2007; Fraser and Oyefeso, 2005; Dunis and Shannon, 2005; Veraros and Kasimati, 2007; Phylaktis and Ravazzolo, 2002; Cheng and Glascock, 2005, etc.), Malaysia (Majid et al., 2009; Ibrahim, 2005, etc.), and Australia (Kim et al., 2005; Lamba and Otchere, 2001; Narayan et al., 2004; Roca et al., 1998; Narayan & Smyth, 2005; Leong and Felmingham, 2003, etc.).

Grubel (1968) developed the international portfolio diversification theory. The theory is based on a simple macroeconomic model to examine the benefits for investors obtained by diversifying internationally. It is well documented that segmented markets offer a great deal in terms of both risk reduction and return improvement. Since the fortunes of different nations do not always move together, investors can diversify their portfolios by holding assets in several countries. The benefits of international diversification have been recognised for decades. International markets provide the opportunity for diversification. Local market investors may select low-risk, expected-return investments. In international markets, investors shift to high-risk, high-expected-return projects because they can diversify their overall risk.

However, in the course of the last two decades, many countries have liberalised and deregulated their capital and foreign exchange markets. Moreover, the recent advancements in computers and telecommunications led to a major reduction in transaction and information costs associated with international investments. Besides, investors might have become aware of the potential gains from international investments. The markets have become more integrated.

The issue of stock market integration is of considerable importance to both investors and corporate managers. As stock markets become more integrated and move increasingly together, the diversification benefits of investing in many countries may well be reduced. Important questions remain: Are there benefits from international portfolio reallocations? Are certain markets integrated or segmented? Should investors have to switch portfolio decompositions to achieve efficient portfolios? In what terms may countries be selected in international portfolio diversification?

Stock market integration studies were originally motivated by the intention to examine the diversification benefits gained by investing across global stock markets. Some recent studies, such as Richards (1995), Kanas

(1998a), Chang (2001), Ng (2002) and Phylaktis and Ravazzolo (2004), found no evidence of stock market integration, on the other hand others (Kasa, 1992; Syriopoulos, 2004) have indicated an increased degree of stock market integration over time. Therefore, the empirical findings are mixed. In addition, earlier market integration studies were based on various versions of asset pricing models, while more recent studies have tended to rely on econometric techniques. .

International diversification allows a risk reduction, relative to domestic diversification, by offsetting individual country risk factors, thus reducing portfolio systematic risk to 'world' risk factors alone, i.e., factors common to all countries. The case for international portfolio diversification, as opposed to purely domestic diversification, has been convincingly argued by some researchers within the framework of mean-variance portfolio analysis.

Covariation among equity returns in different countries is of interest to investors and portfolio managers looking for investment portfolios in terms of a more efficient risk-return tradeoff. They may want to identify the countries whose stock prices move in tandem, those that move in opposite directions, and those that are little related to one another. Given the complexities of foreign investment, investors and portfolio managers may wish to select the countries for investment first, then identify propitious securities in the market selected.

3. Methodology

We have used the framework developed by Pukthuanthong and Roll (2009) to measure stock market integration. This method consists of multifactor regression in which a return of a particular index is regressed on global factors that influence the return of the various indices across the globe. Principal Component Analysis was used to extract a common factor (global factor) from the return of a series of 19 indexes (USA, Mexico, Brazil, UK, Australia, HongKong, China, S.Korea, Japan, Europe, Switzerland,

Sweden, Italy, Canada, France, Germany, Ireland, Norway, and Mauritius). The following equation represents our model,

$$R_i = f(G_x)$$

Where $f(G_x)$ represents the Global Factors as a function of R_i, which represents the return of Nifty 50 as a proxy Indian Stock Market. R-squared in such a regression model is considered as the measure of degree integration. If R squared is less than 0.50, then the respective market is dominated by domestic factors (more of a segmented market). If R squared is more than 0.50, then the respective market is dominated by global factors (more of an integrated market).

This method offers distinct advantages compared to correlation and cointegration. Firstly, it enables the consideration of multifactor models, whereas correlation is limited to bivariate models. Even when regression is employed, it suffers from multicollinearity issues. Secondly, cointegration provides overly rigid conclusions regarding market integration, failing to account for partial integration or segmentation.

4. Data

The daily return series of 20 indexes (including India) was collected from 1st January 2019 to 31st July 2023. The main reason for selecting such recent observations was that we didn't want to dilute the result by including outdated observations as the economic environment might not be same as compared to a recent period. We split data into three parts to get a better trajectory of the time-varying nature of integration. The selection of the COVID-19 period was the toughest thing to do merely because of longevity and widespread crises. It is not like other crises where the epicenter (for financial collapse) can be easily identified simply because China downplayed the crisis when it was endemic. When it spread across the globe, the actual gravity of the situation was understood; hence, we took

the Indian stock market observation over the WHO and Government announcement to decide the starting point.

First, a pre-COVID period which ranges from 1st January 2019 to 11th February 2020. Second, COVID-19 ranges from 12th February 2020 to 31st January 2022. The main reason behind such a time stamp was simply based on observation over any other method. From 12th February 2020, the Indian stock market started witnessing the effects of COVID-19 so much so that out of the next 26 days, only 5-day returns were positive. The date of the lockdown announcement witnessed the biggest drop, 12%. Third, the post-COVID period ranges from 1st February 2022 to 31st July 2023. Lastly, an analysis was conducted on the consolidated period.

5. Empirical Analysis

The empirical evidence reveals that the Indian stock market was highly integrated before Covid, while the level of interconnection between the domestic and global market decreased significantly in Covid and post-Covid.

Pre-COVID-19 extracted factors 1 and 2 from the global index explain 98% (R-squared 0.98) of the return of the Indian stock market, which can be vividly explained as global factors influencing the returns 98%, whereas the domestic factor has only 2% influence. The result is presented in Tables 1 and 2.

COVID-19 was more critical to interpret as it is well documented in literature that in a crisis period, the markets exihibit co-movement (Lau & McInish, 1993; Lee & Kim, 1993). However, results contradict this statement as only 47% (0.47 R-Squared) of returns were influenced by the global factor, and domestic factors influenced 53% (residual). The main reason behind such divergence could be the segregation of factors in mid-crisis (see Routh & Sarkar, 2024). It is well documented that in the 1st wave of COVID-19, a surge of retail investors in the Indian stock market was witnessed, leading to an extensive and extended bullish run (see Routh &

Sarkar, 2024). The same is reported in Tables 3 and 4.

Post-COVID-19, the influence of the global factor further decreased by 12% (0.35 R-squared), making the Indian stock market further segmented in comparison to the pre-COVID-19 and COVID-19 periods. Hence, the Indian stock market has shown a unique pattern of divergence since COVID-19, which contradicts previous studies claiming the market was in a co-move crisis period. And since post-COVID, the segmentation of the Indian stock market has surged. This is perfectly depicted in the result obtained from consolidated data. The post-COVID period analysis is presented in Tables 5 and 6.

The regression outcome of consolidated data reveals that the global factor only influences 38% (0.38 R-squared) returns; thus, it concludes that COVID-19 and the post-COVID period have overpowered the pre-COVID period. Thus, even consolidated data shows a divergence pattern of the Indian Stock market from the global market. The same can be observed from Tables 7 and 8

6. Conclusion

In this paper, we investigated the ambiguity of whether the Indian stock market is an integrated or segmented market post-COVID-19. Instances of diverse patterns of daily return have been continuously increasing since COVID-19. The method that makes studies unique is that they use multivariate analysis, which lets us say whether the market is partially integrated or segmented. This differs from the two common methods used in literature: correlation and cointegration.

The analysis based on Pukthaunthong and Rolls' framework we found that pre-COVID, the market was nearly perfectly aligned with the global market; however, in COVID and post-COVID, the influence of global factors are considerably reduced indicating that the market is more of a segmented one. The result consolidated data similar pattern; that is, the Indian stock market is partially segmented.

Table 1: Factor Loadings (Rotated) for pre-COVID perio

Rotated loadings:		
	Factor 1	**Factor 2**
Australia	0.993727	-0.043207
Brazil	0.984833	0.004314
Canada	0.998298	-0.002381
China	0.982889	-0.012754
Europe	0.996850	0.078378
France	0.996038	0.086908
Germany	0.994558	0.085721
Hong Kong	0.988867	0.001339
Ireland	0.988751	0.046497
Italy	0.012932	0.846620
Japan	0.991315	-0.025512
Mauritius	0.997222	-0.043755
Mexico	0.992082	0.001550
Norway	0.994642	0.043415
South Korea	0.992557	-0.022102
Sweden	0.033074	0.795605
Switzerland	0.997168	0.037911
UK	0.996579	0.044038
USA	0.996628	0.031270

Source: Author(s)

Table 2: Regression Outcome for the pre-COVID period

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constant	-0.320773	0.050817	-6.312267	0.0000
Factor 1	6.015232	0.050828	118.3446	0.0000
Factor 2	-0.181340	0.052525	-3.452464	0.0006
R-squared	0.980892	Mean dependent var		-0.320773
Adjusted R-squared	0.980752	S.D. dependent var		6.085121
S.E. of regression	0.844242	Akaike info criterion		2.510055
Sum squared resid	194.5792	Schwarz criterion		2.549407
Log likelihood	-343.3875	Hannan-Quinn criterion		2.525846
F-statistic	7006.939	Durbin-Watson stat		1.887304
Prob (F-statistic)	0.000000			

Source: Author(s)

Table 3: Factor Loadings (Rotated) for COVID period

Rotated loadings:				
	Factor 1	**Factor 2**	**Factor 3**	**Factor 4**
Australia	0.396983	0.421205	0.376599	0.035173
Brazil	0.446335	0.112882	0.666437	-0.073819
Canada	0.571741	0.135332	0.748618	0.099057
China	0.117319	0.597843	0.133089	0.066145
Europe	0.934275	0.229981	0.237226	-0.082545
France	0.932096	0.207097	0.236405	-0.159053
Germany	0.910719	0.204784	0.227461	-0.026417
Hongkong	0.337658	0.717426	0.131664	0.006800
Ireland	0.619162	0.076717	0.234836	0.040282

	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4
Italy	0.886282	0.101473	0.280239	-0.017339
Japan	0.314216	0.612096	0.086458	0.007253
Mauritius	-0.007041	0.210177	0.087741	-0.173284
Mexico	0.494060	0.174222	0.452636	-0.070431
Norway	0.772692	0.178419	0.267834	0.138074
South Korea	0.271239	0.772282	0.131909	-0.034187
Sweden	0.884218	0.172232	0.217430	0.148819
Switzerland	0.836005	0.111279	0.219826	0.250616
UK	0.865064	0.203666	0.284162	0.009338
USA	0.573864	0.141670	0.730172	-0.024172

Source: Author(s)

Table 4: Regression Outcome for COVID period

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constant	0.087230	0.051510	1.693457	0.0910
Factor 1	0.700212	0.052402	13.36225	0.0000
Factor 2	0.767407	0.057244	13.40593	0.0000
Factor 3	0.422793	0.054902	7.700821	0.0000
Factor 4	0.001180	0.062192	0.018976	0.9849
R-squared	0.479809	Mean dependent var		0.087230
Adjusted R-squared	0.475509	S.D. dependent var		1.572820
S.E. of regression	1.139063	Akaike info criterion		3.108462
Sum squared resid	627.9732	Schwarz criterion		3.151329
Log likelihood	-755.0190	Hannan-Quinn criterion		3.125299
F-statistic	111.6067	Durbin-Watson stat		2.127051
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source: Author(s)

Table 5: Factor Loadings (Rotated) for post-COVID period

Rotated loadings:			
	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Australia	0.201475	0.692365	0.115947
Brazil	0.141824	0.097975	0.433876
Canada	0.387493	0.083403	0.896798
China	0.072548	0.540254	0.089770
Europe	0.928067	0.174698	0.293486
France	0.958517	0.115839	0.216223
Germany	0.917963	0.077072	0.241357
Hong Kong	0.144248	0.683753	0.069363
Ireland	0.650952	0.155405	0.178415
Italy	0.883678	0.037388	0.269518
Japan	0.133412	0.638264	0.133286
Mauritius	-0.020168	0.145502	-0.017466
Mexico	0.313948	0.127521	0.456121
Norway	0.452884	0.310554	0.334339
South Korea	0.127294	0.771508	0.093617
Sweden	0.785388	0.114077	0.295859
Switzerland	0.780162	0.113797	0.244324
UK	0.787359	0.165497	0.289325
USA	0.440670	0.009947	0.795773

Source: Author(s)

Table 6: Regression outcome for the post-COVID period

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constant	0.035983	0.039396	0.913377	0.3616
Factor 1	0.380136	0.039793	9.552926	0.0000
Factor 2	0.438015	0.043369	10.09984	0.0000
Factor 3	0.070381	0.040451	1.739916	0.0827
R-squared	0.356141	Mean dependent var		0.035983
Adjusted R-squared	0.350864	S.D. dependent var		0.940547
S.E. of regression	0.757789	Akaike info criterion		2.293929
Sum squared resid	210.1734	Schwarz criterion		2.336237
Log likelihood	-420.376	Hannan-Quinn criterion		2.310734
F-statistic	67.48261	Durbin-Watson stat		2.120916
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source: Author(s)

Table 7: Factor Loadings (Rotated) for Consolidated Period

Rotated loadings:			
	Factor 1	**Factor 2**	**Factor 3**
Australia	0.262384	0.538787	0.302436
Brazil	0.319074	0.153430	0.611226
Canada	0.464373	0.182313	0.813284
China	0.077835	0.566470	0.065132
Europe	0.920711	0.260081	0.272104
France	0.931101	0.224144	0.247986
Germany	0.890456	0.208751	0.263532
Hong Kong	0.208341	0.704895	0.067594
Ireland	0.599230	0.146332	0.204172

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Italy	0.860361	0.130036	0.306658
Japan	0.205152	0.645129	0.091144
Mauritius	0.014266	0.166088	0.030293
Mexico	0.397964	0.197310	0.452464
Norway	0.626669	0.281586	0.320187
South Korea	0.185335	0.773434	0.102628
Sweden	0.807165	0.208398	0.284130
Switzerland	0.768056	0.159663	0.288405
UK	0.799865	0.250914	0.325895
USA	0.507645	0.158197	0.753639

Source: Author(s)

Table 8: Regression Outcome for Consolidated period

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constant	0.060094	0.028904	2.079055	0.0378
Factor 1	0.451149	0.029393	15.34879	0.0000
Factor 2	0.595957	0.032300	18.45060	0.0000
Factor 3	0.280451	0.030656	9.148301	0.0000
R-squared	0.385615	Mean dependent var		0.060094
Adjusted R-squared	0.383985	S.D. dependent var		1.240701
S.E. of regression	0.973784	Akaike info criterion		2.788264
Sum squared resid	1072.477	Schwarz criterion		2.806006
Log likelihood	-1578.340	Hannan-Quinn criterion		2.794965
F-statistic	236.6214	Durbin-Watson stat		2.073358
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source: Author(s)

Reference:

1. Adler, M., & Dumas, B. (1983). International Portfolio Choice and Corporation Finance: a synthesis. The Journal of Finance, 38(3), 925–984. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1983.tb02511.x
2. Agmon, T. (1972). THE RELATIONS AMONG EQUITY MARKETS: a STUDY OF SHARE PRICE COMOVEMENTS IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM, GERMANY AND JAPAN. The Journal of Finance, 27(4), 839–855. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1972.tb01315.x
3. Anoruo, E., Ramchander, S., &Thiewes, H. (2003). Return dynamics across the Asian equity markets. Managerial Finance, 29(4), 1–23. https://doi.org/10.1108/03074350310768265
4. Arshanapalli, B., & Doukas, J. (1993). International stock market linkages: Evidence from the pre- and post-October 1987 period. Journal of Banking & Finance, 17(1), 193–208. https://doi.org/10.1016/0378-4266(93)90088-u
5. Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1995). TimeVarying world market integration. The Journal of Finance, 50(2), 403–444. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04790.x
6. Bose, S., & Mukherjee, P. (2006). A study of interlingages between the Indian stock market and some other emerging and developed markets. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.876397
7. Campbell, J. Y., & Hamao, Y. (1992a). Predictable stock returns in the United States and Japan: A Study of LongTerm Capital Market Integration. The Journal of Finance, 47(1), 43–69. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb03978.x
8. Campbell, J. Y., & Hamao, Y. (1992b). Predictable stock returns in the United States and Japan: A Study of LongTerm Capital Market Integration. The Journal of Finance, 47(1), 43–69. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb03978.x

9. Chancharat, S. (2009). Stock market Integration—An Overview. Development Economic Review, 4(1), 23. https://www.tci-thaijo.org/index.php/NER/article/view/23118
10. Cheng, H., & Glascock, J. L. (2005). Dynamic linkages between the Greater China economic area Stock Markets—Mainland China, Hong Kong, and Taiwan. Review of Quantitative Finance and Accounting, 24(4), 343–357. https://doi.org/10.1007/s11156-005-7017-7
11. Chittedi, K. R. (2010). Integration of Intenarional Stock Markets: With Special Refernce to India. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1568587
12. Dhal, S. (2009). Global crisis and the integration of India's stock market. Journal of Economic Integration, 24(4), 778–805. https://doi.org/10.11130/jei.2009.24.4.778
13. Dunis, C. L., & Shannon, G. (2005). Emerging markets of South-East and Central Asia: Do they still offer a diversification benefit? Journal of Asset Management, 6(3), 168–190. https://doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240174
14. Elyasiani, E., Perera, P., & Puri, T. N. (1998). Interdependence and dynamic linkages between stock markets of Sri Lanka and its trading partners. Journal of Multinational Financial Management, 8(1), 89–101. https://doi.org/10.1016/s1042-444x(98)00020-6
15. Eun, C. S., & Resnick, B. G. (1988). Exchange rate uncertainty, forward contracts, and international portfolio selection. The Journal of Finance, 43(1), 197–215. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02597.x
16. Eun, C. S., & Shim, S. (1989). International transmission of stock market movements. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(2), 241. https://doi.org/10.2307/2330774
17. Ewing, B. T., Payne, J. E., & Sowell, C. (1999). NAFTA and North American stock market linkages: an empirical note. The North Ameri-

can Journal of Economics and Finance, 10(2), 443–451. https://doi.org/10.1016/s1062-9408(99)00026-1

18. Fraser, P., &Oyefeso, O. (2005). US, UK and European stock market integration. Journal of Business Finance &Amp Accounting, 32(1–2), 161–181. https://doi.org/10.1111/j.0306-686x.2005.00591.x
19. Grubel, H. (1968). Internationally diversified portfolios: welfare gains and capital flows. The American Economic Review. http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/16285/Grubel-IntDiversifiedPort.pdf
20. Hamao, Y., Masulis, R. W., & Ng, V. (1990). Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets. Review of Financial Studies, 3(2), 281–307. https://doi.org/10.1093/rfs/3.2.281
21. Hassan, M., & Naka, A. (1996). Short-run and long-run dynamic linkages among international stock markets. International Review of Economics & Finance, 5(4), 387–405. https://doi.org/10.1016/s1059-0560(96)90025-8
22. Huang, B., Yang, C., & Hu, J. W. (2000). Causality and cointegration of stock markets among the United States, Japan and the South China Growth Triangle. International Review of Financial Analysis, 9(3), 281–297. https://doi.org/10.1016/s1057-5219(00)00031-4
23. Ibrahim, M. H. (2005). International linkage of stock prices: the case of Indonesia. Management Research News, 28(4), 93–115. https://doi.org/10.1108/01409170510784823
24. Janakiramanan, S., & Lamba, A. S. (1998). An empirical examination of linkages between Pacific-Basin stock markets. Journal of International Financial Markets Institutions and Money, 8(2), 155–173. https://doi.org/10.1016/s1042-4431(98)00029-8
25. Jeon, B. N., & Jang, B. (2004). The linkage between the US and Korean stock markets: the case of NASDAQ, KOSDAQ, and the semiconductor stocks. Research in International Business and Finance, 18(3), 319–340. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2004.04.006

26. Kanas, A. (1998). Linkages between the US and European equity markets: further evidence from cointegration tests. Applied Financial Economics, 8(6), 607–614. https://doi.org/10.1080/096031098332646
27. Kasa, K. (1992). Common stochastic trends in international stock markets. Journal of Monetary Economics, 29(1), 95–124. https://doi.org/10.1016/0304-3932(92)90025-w
28. Kasa, K. (1995). Comovements among national stock markets. Econometric Reviews, 14–20. https://econpapers.repec.org/RePEc:fip:fedfer:y:1995:p:14-20:n:1
29. Kim, S. J., Moshirian, F., & Wu, E. (2005). Dynamic stock market integration driven by the European Monetary Union: An empirical analysis. Journal of Banking & Finance, 29(10), 2475–2502. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.09.002
30. Lamba, A. S., & Otchere, I. (2001). An analysis of the dynamic relationships between the South African equity market and major world equity markets. Multinational Finance Journal, 5(3), 201–224. https://doi.org/10.17578/5-3-3
31. Lau, S. T., &McInish, T. H. (1993). Comovements of international equity returns: A comparison of the pre- and post-October 19, 1987, periods. Global Finance Journal, 4(1), 1–19. https://doi.org/10.1016/1044-0283(93)90010-v
32. Lecun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of the IEEE, 86(11), 2278–2324. https://doi.org/10.1109/5.726791
33. Lee, S. B., & Kim, K. J. (1993). DOES THE OCTOBER 1987 CRASH STRENGTHEN THE COMOVEMENTS AMONG NATIONAL STOCK MARKETS? Review of Financial Economics, 3(1), 89–102. https://doi.org/10.1002/j.1873-5924.1993.tb00574.x
34. Leong, S. C., &Felmingham, B. (2003). The interdependence of share markets in the developed economies of East Asia. Pacific-Basin Fi-

nance Journal, 11(2), 219–237. https://doi.org/10.1016/s0927-538x(03)00002-7

35. Lessard, D. R. (1973). INTERNATIONAL PORTFOLIO DIVERSIFICATION: a MULTIVARIATE ANALYSIS FOR a GROUP OF LATIN AMERICAN COUNTRIES. The Journal of Finance, 28(3), 619–633. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1973.tb01384.x
36. Majid, M. S. A., Meera, A. K. M., Omar, M. A., & Aziz, H. A. (2009). Dynamic linkages among ASEAN5 emerging stock markets. International Journal of Emerging Markets, 4(2), 160–184. https://doi.org/10.1108/17468800910945783
37. Masih, A. M., & Masih, R. (1999). Are Asian stock market fluctuations due mainly to intra-regional contagion effects? Evidence based on Asian emerging stock markets. Pacific-Basin Finance Journal, 7(3–4), 251–282. https://doi.org/10.1016/s0927-538x(99)00013-x
38. Mittoo, U. R. (1992). Additional evidence on integration in the Canadian stock market. The Journal of Finance, 47(5), 2035–2054. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04696.x
39. Mukherjee, P., & Bose, S. (2008). Does the Stock Market in India Move with Asia?: A Multivariate Cointegration-Vector Autoregression Approach. Emerging Markets Finance and Trade, 44(5), 5–22. https://doi.org/10.2753/ree1540-496x440501
40. Narayan, P. K., & Smyth, R. (2005). COINTEGRATION OF STOCK MARKETS BETWEEN NEW ZEALAND, AUSTRALIA AND THE G7 ECONOMIES: SEARCHING FOR CO-MOVEMENT UNDER STRUCTURAL CHANGE. Australian Economic Papers, 44(3), 231–247. https://doi.org/10.1111/j.1467-8454.2005.00262.x
41. Narayan, P., Smyth, R., & Nandha, M. (2004). Interdependence and dynamic linkages between the emerging stock markets of South Asia. Accounting and Finance, 44(3), 419–439. https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2004.00113.x

42. Ng, T. H. (2002). Stock market linkages in South–East Asia. Asian Economic Journal, 16(4), 353–377. https://doi.org/10.1111/1467-8381.00157
43. Nielsson, U. (2007). Interdependence of Nordic and Baltic stock markets. Baltic Journal of Economics, 6(2), 9–27. https://doi.org/10.1080/1406099x.2007.10840434
44. Nielsson, U. (2008). Stock exchange merger and liquidity: The case of Euronext. Journal of Financial Markets, 12(2), 229–267. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2008.07.002
45. Phylaktis, K., &Ravazzolo, F. (2002). Measuring financial and economic integration with equity prices in emerging markets. Journal of International Money and Finance, 21(6), 879–903. https://doi.org/10.1016/s0261-5606(02)00027-x
46. Phylaktis, K., &Ravazzolo, F. (2004). Stock market linkages in emerging markets: implications for international portfolio diversification. Journal of International Financial Markets Institutions and Money, 15(2), 91–106. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2004.03.001
47. Raj, J., & Dhal, S. C. (2009). Is India's Stock Market Integrated with Global and Major Regional Markets?[dagger]. The IUP Journal of Applied Finance, 15(2), 5. https://www.questia.com/library/journal/1P3-1939317441/is-india-s-stock-market-integrated-with-global-and
48. Ratanapakorn, O., & Sharma, S. C. (2002). Interrelationships among regional stock indices. Review of Financial Economics, 11(2), 91–108. https://doi.org/10.1016/s1059-0560(02)00103-x
49. Richards, A. J. (1995). Comovements in national stock market returns: Evidence of predictability, but not cointegration. Journal of Monetary Economics, 36(3), 631–654. https://doi.org/10.1016/0304-3932(95)01225-7
50. Roca, E., Wong, V. S., & Tularam, G. A. (2010). Are socially responsible investment markets worldwide integrated? Accounting Research Journal, 23(3), 281–301. https://doi.org/10.1108/10309611011092600

51. Routh, B. (2023). Risk Premia of Firms of a Globally Integrated market: An Empirical Study from India. Risk, 44(2).
52. Routh, B., & Sarkar, J. (2024). ASSESSING THE PRESENCE OF BUBBLES IN THE INDIAN STOCK MARKET: An empirical analysis. In Finance and Human Resource Management Issues and Imperative (pp. 79–94). Mittal Publication.
53. Siddiqui, S. (2008). Exploring integration between selected European stock market indexes and sensex. Pranjana the Journal of Management Awareness, 11(2). https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:pr&volume=11&issue=2&article=007
54. Solnik, B. H. (1974). Why not diversify internationally rather than domestically? Financial Analysts Journal, 30(4), 48–54. https://doi.org/10.2469/faj.v30.n4.48
55. Subramanian, U. (2009). Cointegration of stock markets in East Asia in the boom and early crisis period. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.1363914
56. Syriopoulos, T. (2004). International portfolio diversification to Central European stock markets. Applied Financial Economics, 14(17), 1253–1268. https://doi.org/10.1080/0960310042000280465
57. Yang, J., Hsiao, C., Li, Q., & Wang, Z. (2006). The emerging market crisis and stock market linkages: further evidence. Journal of Applied Econometrics, 21(6), 727–744. https://doi.org/10.1002/jae.889

A Brief Study of the *Dharma* in The *Mahabharata*, *Silappadikaram* and *Manimekalai*

Padmavati Gangopadhyay *

Abstract: The present study looks at some of the vital dimensions of the term *Dharma* as it has been depicted in the epics *The Mahabharata*, *Silappadikaram* and *Manimekalai*. The concept of *dharma* encompasses varied strands of ethical principles enveloping a man's existence. However, detailed delineations of *dharma* cannot be accommodated within the limited space of our discussion. But we still try to reflect upon some of the significant aspects governing *dharma* in the three epics mentioned above. We also elucidate the patterns of convergence and divergence that emerge in the comparative study of these epics in relation to the term *dharma* with the hope of gaining a better perspective on *dharma* that not only formulates an intrinsic segment of traditional Indian Knowledge System but also forms an indispensible part of our daily existence.

Keywords: Culture, *Dharma*, Epic, Ethics, Kings, Society, Women.

The Indian Knowledge System is a rich source of rejuvenating ideas pertaining to varied disciplines of learning such as engineering, architecture,

* Assistant Professor, Dept. of English, Kotshila Mahavidyalaya, Purulia. e-mail: gangulyria23@yahoo.com

economy, statecraft etc. Kapil Kapoor underlines the vastness and diversity of this system when he says, “INDIAN civilization has always attached great value to knowledge —witness its amazingly large body of intellectual texts, the world’s largest collection of manuscripts, its attested tradition of texts, thinkers and schools in so many domains of knowledge” (11). Indeed, as Indians,we are the proud inheritors of this eclectic and powerful tradition of learning that has nurtured the intellects of the nation since time immemorial. At the heart of this network of knowledge is the concept of *Dharma* that has engaged the minds of Indian thinkers across times. In the intellectual system of India, *dharma* cannot be tied to any one particular area of study nor can it be defined in one idea. J. P. Suda underlines the significance of *dharma* in ancient India in these words, “Etymologically, the Sanskrit word *dharma* is derived from the root *dhr* which means ‘to hold, have or maintain’. The *dharma* of a thing may, therefore, be described as that form or power which makes it what it is and prevents it from becoming something different... . What keeps thewhole universe in order and everything in its proper place is *dharma*” (359).Thus, seen from this point of view, *dharma* is the means of sustenance of the entire creation. S. Radhakrishnan also notes how *dharma* is rooted in every aspect of our culture when he says that *dharma* “is ethics and religion combined. The life of a Hindu is regulated, to a very de-tailed extent, by the laws of dharma. His fasts and feasts,his social and family ties, his personal habits and tastes are all considered by it” (2). In this manner, time and again thinkers have jostled with the encyclopaedic nature of *dharma* in Indian intellectual tradition. In our brief study, we would look at this very concept of *dharma* within the context of the Sanskrit epic *The Mahabharata*, and the ancient Tamil epics *Silappadikaram* and *Manimekalai*. In our culture, the epics are always perceived as invigorating repository of knowledge with respect to the four primary goals of human lives which are *artha*, *kama*, *dharma* and *moksha*. As part of the

Indian Knowledge System, the epics not only act as a mirror to the past ways of existence but also contain deep insights about life that are valuable for the current times. Thus, a study of these texts would not only enable us to look at how *dharma* was perceived in our culture in the past but it would also teach us about the significance of *dharma* in today'sworld.

In the narrative of *The Mahabharata*, the concept of *dharma* holds the central position which is being enumerated here through countless stories (as can be seen in the various accounts about *dharma* given by Bhishma to Yudhisthira) and also the actions in the lives of the central characters of the epic. Thus, the *dharma* does not remain as an abstract concept here for the readers. Rather, through its constant discussion in the text by the means mentioned above, it emerges as a distinct mode of existence with its own characteristics deviation from which destabilizes the worldview of the epic. The essential characteristics of the *dharma* in the text are "truthfulness," "generosity," "endeavour," "lack of jealousy," "forgiveness," along with "fortitude" (Vyasa 239; vol. 4,ch. 696 [33], sec. 51).A person is expected to abide by these general principles in his life in the epic. Again the "worship of the mother, the father and the preceptor" (Vyasa 444; vol.8,ch.1437[109], sec. 84) is also considered one of the innate characteristics of one who adheres to *dharma* in life. It is because the Pandava brothers are epitome of these values in the text, they are applauded here and their victory in the battle of Kurukshetra is not just seen as in terms of their achievements of kingdom and prosperity. Rather it is seen as a victory of a way of life that is centred on *dharma*. The reinstatement of Yudhishthira after the war is the testimony to this fact as he is none other than *Dharma's* son in the epic and is known as the *Dharmaraja* here**.** In fact, the Pandavas are seen as indestructible throughout the text because of the presence of *dharma* in their lives as Bhishma says, "The Pandavas are protected through dharma and through their own valour. It

is my view that they cannot have been destroyed" (Vyasa 60; vol. 4,ch.623[27], sec. 47). A man in possession of the qualities associated with *dharma* is capable of creating harmony, peace and happiness in his surroundings. Such is shown to be the power of *dharma* in a man's life and his surroundings in the text.

In addition to the above-mentioned general principles of the *dharma* that each man is expected to follow in the epic, there are also detailed references to *dharma* belonging to each of the four *ashramas* and *varnas* here. The four *ashramas* are those of the states of a "brahmacharya," the "garhasthya," the state of "vanaprastha" and the ultimate state of renunciation (Vyasa 311; vol. 8,ch. 1389[61], sec. 84). The epic shows how the *dharma* of the *ashramas* brings about harmony in the different phases of a man's life from man's youth to his old age. The primary objective here is to prepare man for the ultimate *dharma* of "renunciation"which is considered the most significant goal of a man's life. Renunciation is defined here as the process which detaches man from his worldly existence and enables him to comprehend the *paramatman* within his own soul as the preceptor of the "Moksha Dharma Parva" says, "The traits of the dharma of renunciation are that this leads to the eternal brahman . . .(Vyasa 32; vol. 9, ch. 1538 [210], sec. 86).Thus, we can see that the *dharma* of the *ashramas* is a gateway to the ultimate spiritually awakened realm of ***moksha*.** Along with the *dharma* of the *ashramas*,a man is also bound by the duties of his particular *varna* such as the primary responsibility of a Shudra's life is related to "servitude" to the upper three classes (Vyasa 316; vol. 8,ch.1391[63], sec. 84). Also it is not necessary for a Kshatriya, a Vaishya and a Shudra to undertake the act of renunciation in their lives. Similarly, the supreme duty of the king who belongs to the Kshatriya class is "the protection of subjects" (Vyasa 344; vol. 8, ch.1400[72], sec. 84). And the Brahmanas are expected to fulfill the *dharma* of all the four *ashramas* of human life (Vyasa 314; vol. 8,ch. 1390[62], sec. 84). It is also the *dharma* of

the Brahmana to diligently undertake "studying," "teaching" and practice the difficult task of "self-control"(Vyasa 307; vol. 8,ch. 1388[60], sec. 84). In this manner, the epic prescribes different kinds of duties for the people of each of the *varnas* with the ultimate aim of maintaining the dominance of the Brahmanas who are time and again eulogized here.

In the context of *dharma*, *The Mahabharata* also puts forward ideas regarding how a man should behave in various situations of life such as there is a particular *dharma* for man when he is in "hardships"(Vyasa 62; vol. 9,ch.1548 [220], sec. 86). Similarly married women are expected here to follow the husband-centric *pativrata dharma* where devotion and service to husbands are of utmost priority to wives as sage Markandeya informs Yudhisthira that "a woman does not need sacrifices. . . . When she serves her husband, she obtains heaven"(Vyasa 341; vol. 3,ch.493[196], sec. 37). Again there is a particular *dharma* based on "the rites of Dharma" as "laid down in the Vedas"(Vyasa 323; vol. 8, ch. 1393[65], sec. 84) for those people who follow the occupation of the bandits. Thus, *dharma* dominates in every condition of life in *The Mahabharata*. Here no aspect of life is beyond the domain of *dharma*. It is also so powerful that deviation from it can even lead to the downfall of the kings of heaven as can be seen in the misfortunes of Indra in the epic. When Indra destroys *dharma* by killing Vritra, he is himself destroyed as the epic says, "Thanks to the fear of having killed a brahmana, Indra of the gods was destroyed"(Vyasa 174; vol. 4, ch.673 [10], sec. 49). Similarly, Nahusa loses the kingship of heaven when he displaces "dharma" with "desire"(Vyasa 175; vol. 4,ch. 674 [11], sec. 49). Also the practice of the same *dharma* enables a hunter to be the teacher of the ascetic Koushika or an ordinary pigeon of the jungle to reach heaven as can be seen in the "Markandeya Samasya Parva" and the "Apad Dharma Parva" of the epic respectively.Thus, *dharma* controls all beings and all situations in existence as is indicated by the epic.

The perspective of *The Mahabharata* in relation to *dharma* becomes

all the more enriching because it also delineates the subtle nature of *dharma*. In other words, the epic shows that it is the context that determines the nature of *dharma* applicable to it and there are times when even bad deeds emerge to be virtuous and praiseworthy. In this regard Chaturvedi Badrinath says, “The most striking feature of the *Mahâbhârata* is its honest observation of the human condition.The value of an act, the *Mahâbhârata* shows, depends not only upon one’s motives wholly, but also upon *desha* and *kâla*, ‘the given place’ and ‘the given time’” (90). Bhishma explains this concept to Yudhisthira through the examples of Balaka and Koushika. Balaka’s seemingly unethical act of killing “a blind being”(Vyasa 445; vol. 8,ch.1438 [110], sec. 84) proves to be ethical on account of the harmful consequences of the beast’s existence and Koushika’s adherence to truth that caused harm to many people turns out to be a sinful act even though he appears to be committed to *dharma* by speaking out the truth (Vyasa 445; vol. 8,ch. 1438 [110], sec. 84). Thus, *The Mahabharata* asserts that *dharma* is not a straight forward concept and even deeds that are apparently morally wrong may prove to be as per *dharma* on account of their beneficial results. The war of Kurukshetra is the biggest testimony to this fact in the epic as Krishna and the Pandavas resort to some unethical acts in this war for attaining the greater good of displacing immorality represented by the Kouravas.

Having looked at some of the vital aspects of *dharma* in *The Mahabharata*, let us now have a brief overview of the place of *dharma* in the Tamil epics *Silappadikaram* and *Manimekalai*. In R. Parthasarathy’s translation of the first epic, it is declared that the poem will elucidate that “even kings, if they break / The law, have their necks wrung by dharma. ..” (Parthasarathy21). Thus, the event of the poem depicts how deviation from *dharma* has drastic consequences. The biggest lapse of *dharma* in *Silappadikaram*takes place when the Pandya king gives order for capital punishment of Kovalan without rightly ascertaining whether Kovalan is

actually guilty or not (*Silappadikaram* 56). Realizing the enormity of his irresponsibility, the king gives up his life himself (*Silappadikaram* 68). Thus, at the centre of the ethical order put forward by *Silappadikaram* is the king whose failure in relation to the *dharma* leads to the fall of the entire kingdom. Also if the king's *dharma* maintains the public realm, it is the wife's virtues that maintain the private realm of the domestic world as can be seen in Kannagi's virtuous life that remains dedicated to her husband's wellbeing irrespective of being cheated by him in marriage. Such a wife is shown to have immense power as can be seen in the destruction of Madurai through the wrath of Kannagi in the epic. Within this overarching pattern of *dharma* that maintains harmonious relationship between the public and the private realms in the epic, there is the *dharma* of the individual lives that is tied to the ideals of Jainism such as non-violence, truth, generosity, avoidance of falsehood, theft etc. However, whether it is the *dharma* of the king, housewife or the general ethical principles to be followed for living on the earth, deeds occupy the central position in the epic in the consideration of *dharma*. As per the values of Jainism, one's future lives are decided by the deeds performed by the one in his or her present life. Therefore, concentration on good deeds is shown to be important in *Silappadikaram*. The epic shows that worldly existence is transitory in nature and therefore emphasis is put upon performing virtuous actions as much as possible. Kovalan's desertion of Kannagi is shown to be related to Kannagi's failure to keep a vow on behalf of her husband in her past life (Parthasarathy91). Similarly Kovalan's cruel death in the epic is seen here to be connected with his karmaof wrongfully killing an innocent man in his past life (Parthasarathy 205). Thus, happiness and misfortunes are depicted to be rooted in the characters' deeds in the epic.

Deeds are also given primary importance in *Manimekalai* where the protagonist's life becomes an illustration of how good deeds can free one from the shackles of Rebirth and death to attain the ideal state of absolute liberation. The good deeds that are stressed in *Manimekalai* are related to

the Buddhist "eight-fold path of right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration"(*Silappadikaram* 175). And the purest action is thought to be "to give food to the destitute"(*Silappadikaram* 119) as is said by goddess Divatilakai in the epic. Manimekalai's magic bowl of food enables her to accomplish this *dharma* of compassion towards others throughout the narrative. Like *Silappadikaram, Manimekalai* also depicts the *dharma* of the king and the *dharma* of the housewife through the noble king Puniyarajan and the ideal housewife Aadirai. In Puniyarajan's land there is happiness and peace on account of the virtuous actions of the king and his chief minister calls him "the first rain after the cruel heat of the summer"(*Silappadikaram* 161).Similarly, the housewife Aadirai's *dharma* is so immense that food in Amudasurabi increases manifold on account of her merits (*Silappadikaram* 132). The connection between the virtues of the king and the women for the well-being of the land that we have witnessed in *Silappadikaram* is also evident here. When Kanchipuram suffers from famine, it's king wonders whether it is on account of his failure to deliver "justice" or whether it is due to the lack in the "penances" of "holy men" or due to the "unchaste lives" of the women of the kingdom (*Silappadikaram* 173). Thus,the tremendous importance of the *dharma* both in the private and public realms of human lives is constantly being stressed through the epic's focus on the responsibilities of the kings and women of the society.

When we place the three texts together that we have studied so far, we find both patterns of similarities and dissimilarities in the delineation of *dharma* in them. Ethical values such as selflessness, generosity, truthfulness are seen as essential moral values that form the backbone of human lives in all these three texts as we have seen above. All the texts also enumerate upon the *dharma* of the kings and virtuous women through various examples in the text. However, in this regard it must be noted that the capacious structure of *The Mahabharata* enables the extensive treat-

ment of the theme of the *dharma* of the king within its narrative. There is an entire *parva* named the "Raja Dharma Parva" in *The Mahabharata* where Bhishma explains to Yudhisthira the various facets of the *dharma* of the king such as the king's management of his treasury, army, spies, forts and servants, king's happiness, king's protection against enemies, the knowledge of four *varnas* and *ashramas* etc. In fact, Bhishma's ideas are a treasure house of knowledge on statecraft, leadership and morality many of which are also applicable in modern times. Such elaborate reflections on kingship cannot be accommodated in the limited space of the Tamil epics, under our present review,which focus more on the impact of the presence and absence of *dharma* on human lives through the illustrations of the events of characters' lives. Also it must be noted that violence is not part of the *dharma* that we find in *Silappadikaram* or *Manimekalai* as these are governed by the ethos of Jainism and Buddhism respectively. Such is not the case in *The Mahabharata* as it is permeated with the idea of the *dharma* of the four *varnas* and fighting and giving up one's life in battle is considered the supreme *dharma* of the Kshatriya here as Bhishma says, "Manu has said that fighting is dharma. It leads to heaven and the worlds" (Vyasa 285; vol. 8,ch. 1383[55], sec. 84). In the Tamil epic *Silappadikaram* while the bravery in battle of King Senguttuvan is eulogized, the central focus here is on doing charitable deeds as Senguttuvanfrees all "prisoners of war" after coming back from war (*Silappadikaram* 89). In addition to the above mentioned differences, it should also be considered that the *dharma* of the *ashramas* and *varnas* that inform *The Mahabharata* cannot be found in the pages of the Tamil epics. The Tamil epics also lack the nuanced understanding of the complexity and flexibility of the concept of *dharma* which underlines that *dharma* cannot be comprehended through one-size-fits-all approach and that a person's dharma needs to be adapted as per the requirements of the situation. We have seen the presence of this critical line of thinking in *The Mahabharata* as noted in our above-mentioned discussion.

It should also be taken into account that deeds and their intrinsic relationship with the tormenting cycle of rebirths and death have been emphasized upon all the three epics as mentioned above. But while *Silappadikaram* under lines the inevitable hold of karma over men by focusing more on the misfortunes men suffer on account of their unethical deeds in their past and present lives, *Manimekalai* concentrates more on the path of release from the miseries of rebirths through the heroine's noble deeds of compassion towards all beings and her detachment from desire. And *The Mahabharata* delineates elaborately both the connection of deeds and rebirths and the path of renunciation for the readers. In fact, detachment and renunciation are so important for the Sanskrit epic that an entire *parva* called the "Moksha Dharma Parva" is dedicated to these ideas where Bhishma imparts a detailed discourse upon renunciationthrough illustration and exhortation to Yudhisthira. However, the nature of the supreme bliss that is perceived through renunciation by the three epics under our present study; is different as per the religious systems that govern these epics.This bliss is the ultimate union of the *atman* with the *brahman* in *The Mahabharata.* In *Silappadikaram*, it is influenced by the ideals of Jainism and in the *Manimekalai* this state of liberation is perceived through the path of "the Buddha, the sangha and the dharma" (*Silappadikaram* 175).

The perusal of the Sanskrit and Tamil epics from the viewpoint of *dharma* reveals to the readers the significance of morality in human existence and inspires them to lead lives rich in ethical values.This turns out to be extremely vital teaching for the present generation of readers where, as the website of Transparency International says, "Billions of people live in countries where corruption destroys lives and undermine human rights" ("Corruption"). In this chaos of modern times, objects are judged as per their material values and morality often takes a back seat in the dealings of worldly affairs. As a result, human lives are often trapped in the ills that emerge from the absence of ethical values in the contemporary world and

the inability of man to connect with his outer reality beyond the materialistic yardsticks of life. Some of these ills are anxiety, fear, restlessness, cruelty, in difference and self-centred perspective towards life. In this context, modern nation sare compelled to give priority to human happiness in present times as can be seen in the 65/309 resolution of UN General Assembly entitled "Happiness towards a holistic approach to development" (United Nations 1). This resolution became the basis of "World Happiness Report" (annually published since 2012) of University of Oxford that clearly shows intrinsic relationship between global "well-being"and such ethical criteria as "generosity" and "perception of corruption" besides other social and economic factors (Wellbeing).Thus, the centrality of ethical principles for holistic development of life becomes evident through this fact. In such a context, the dedicated study of texts like *The Mahabharata* or *Manimekalai* can hardly be denied for today's generation as these texts enable one to strengthen one's moral vision and develop the insight to look at life beyond the periphery of the self. Also individuals make up societies and morally enlightened individuals lay the foundation of healthy societies where positive development becomes possible in every aspect of social order. Thus, the teachings on *dharma* in these epics prove to be a great edifying experience for the general well-being of both individuals and societies.

Works Cited:

Badrinath, Chaturvedi. *The Mahâbhârata: An Inquiry in the Human Condition*. Orient Blackswan, 2007.

"Corruption is blocking progress towards a sustainable world." *Corruption Perceptions Index. Transparency International: the global coalition against corruption*, https://www.transparency.org/en/cpi/2024. Accessed 29 June 2025.

Kapoor, Kapil."Indian Knowledge Systems: Nature, Philosophy and Char-

acter." *Indian Knowledge Systems*, edited by Kapil Kapoor & Avadhesh Kumar Singh, Vol. 1, Indian Institute of Advanced Study & D.K. Printworld, 2005, pp. 11-32.

Parthasarathy, R., translator. *The Cilappatikâram: The Tale of an Anklet.* By IlankoAtikal, Penguin Books, 2004.

Radhakrishnan, S. "The Hindu Dharma." *International Journal of Ethics*, vol. 33, no. 1, 1922, pp. 1–22. *JSTOR*,http://www.jstor.org/stable/2377174. Accessed 24 June 2025.

United Nations General Assembly. "Resolution adopted by the General Assembly on 19 July 2011." *Resolution 65/209*, 25 August 2011. *World Happiness Report*, https://worldhappiness.report/about/. Accessed 23June 2025.

Silappadikaram Manimekalai. Translated by Lakshmi Holmström, illustration by A. V. Ilango, Orient Longman, 1996.

Suda, J. P. "Dharma: Its Nature and Role in Ancient India." *The Indian Journal of Political Science*, vol. 31, no. 4, 1970, pp. 356–66. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/41854399. Accessed 24 June 2025.

Wellbeing Research Centre, University of Oxford, Gallup & UN Sustainable Development Solutions Network. "The World Happiness Report Dashboard."*World Happiness Report*, https://data.worldhappiness.report/country/FIN. Accessed 24 June 2025.

Vyasa, Dvaipayana. *The Mahabharata*. Translated by BibekDebroy, Penguin, 2015. 10 vols.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Role of emulsion type soft nanostructure in drug delivery process

Jayanta Kumar Midya *

Abstract: The progressive research on nano-sized entities has come forward to offer fascinating size-dependent properties that find enormous industrial applications like pharmaceuticals, cosmetics, oil recovery, biotechnology, drug delivery etc. To produce a specific biological response, it is important to find the size (3~100 nm), morphology, synthetic technique, and functionalization of this nanostructure. The present chapter discusses various aspects related to the synthesis and application of biocompatible microemulsions, a soft nanostructureas drug carrier. Both hydrophilic and lipophilic drug molecules encapsulated in their nanodomains are administered in various modes such as oral, intravenous, transdermal, nasal, and subcutaneous to produce the desired therapeutic effect. Herein, bioavailability, toxicity, long-term stability of microemulsions, and target efficiency in-vivo and in-vitro have been addressed concerning their use.

Keywords: Nanostructures, microemulsions, hydrophobic, drug delivery, toxicity.

* Assistant Professor, Dept. of Chemistry, Jagannath Kishore College, Purulia. e-mail: jayanta.midya@gmail.com

Introduction

The microemulsion system, as described by Danielsson et al., is essentially a single, thermodynamically stable, and optically isotropic system of water, oil, and an amphipathic (surfactant) [1]. Sometimes, cosurfactant, or butyl lactate, or short alkyl chain alcohols, is required as the fourth component for stabilizing microemulsion. Systems of microemulsions are not micro, but nano-sized entities and not emulsions. The microstructures in microemulsion having size from 3 to 100 nm are found to be changed progressively with changing the composition of the formulation. Favourable characteristics of microemulsions include their ease of formation, optical isotropy, small droplet size, thermodynamic stability, filtration sterilization capability, and high surface area (high solubilization capacity).

Types of microemulsions and its properties

Typically, two types of microemulsion are possible based on their formation: water-in-oil (w/o), and oil-in-water (o/w). Water droplets surrounded by a continuous oil phase make up a w/o-based microemulsions system. w/o microemulsions, also known as "reverse micelles" (RMs), are formulations in which the nonpolar tails of the surfactants arrangeoutwardly into the oil phase and their polar head groups face inward into the water droplets (Fig. 1). The o/w microemulsions medium consists of oil droplets that are dispersed into the continuous water phase and are surrounded by a film of surfactant (and perhaps cosurfactant) that forms the internal phase. Because the o/w dispersed systems solubilize lipophilic drugs in the interior oil droplets, they make them more dispersible in an aqueous-based system, which makes them more striking[2].

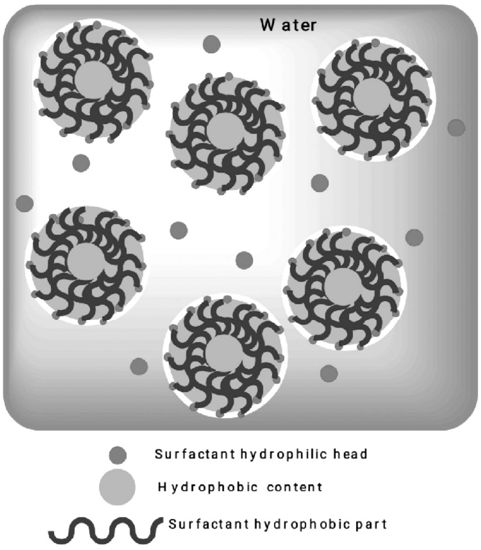

(a)

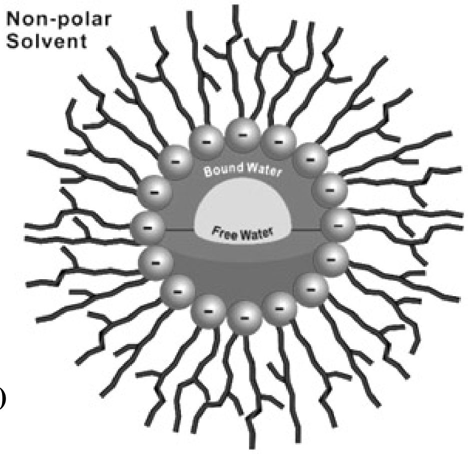

(b)

Figure 1. A Schematic diagram of (a) microemulsion droplet (3 – 100 nm) and (b) representative AOT-based Reverse Micelle system in non polar solvent

Microemulsions as drug delivery vehicle

Several microemulsion forms, including w/o and o/w enable the preferred drug release[3,4] (Fig. 2). Furthermore, the coexistence of hydrophobic and hydrophilic components can dissolve drugs with varying the solubility rates. Towards hydrophilic drugs, the o/w microemulsion system would be more helpful because drug release would occur more quickly. After all, the drug would be present in the continuum region of the system. Oncontrary, the w/o analog would limit drug release because the drug would be confined in the water droplets i.e., hydrophobic drugs prevail in reverse situations. Additionally, since in-vivo drug administration causes the internal body fluids to infinitely dilute the carrier system, altering the drug release rate, understanding the diffusion-controlled process for drug release from microemulsion and micellar systems at infinite dilution is crucial[5].

An anhydrous system of microemulsions known as a self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS) has also been referred to as microemulsion pre-concentrate by some studies. It is composed of surfactant, cosurfactant, and oil. When mixed with water and gently stirred, it can develop an o/w microemulsion. The stomach and intestine's digestive motility produce the agitation required for self-emulsification[6-8].

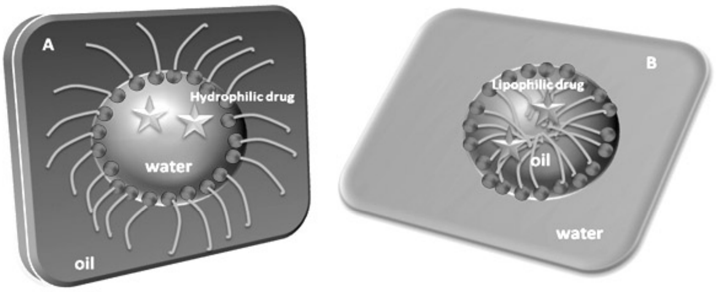

Fig. 2. Water-in-oil (A) and oil-in-water (B) microemulsions as drug delivery vehicles.

In-vitro drug delivery systems

Xianyi et al. reported both self-micro emulsifying and microemulsion systems for improved oral bioavailability of probucol withpreparation and evaluation [9]. Changez et al. conducted in vitro transdermal permeation experiments were conducted by on tetracaine hydrochloride encapsulated in w/o and o/w microemulsion media. Anti-TB drugs presence, e.g,, rifampicin (hydrophobic), isoniazid (hydrophilic), and pyrazinamide have been reported in Tween 80-based microemulsion with different degrees of solubilities by an optical study [10]. Testosterone propionate (2% w/w) has been determined to be highly solubilized in o/w microemulsion of large molecular volume oil in contrast to small molecular volume oil blended systems [11,12]. The water-impermeable anestheticdrugs, Prilocaine and Lidocaine (Lignocaine), have been dissolved in an oil phase of a self-micro emulsifying drug delivery system consisting of a blend of various components[13]. Thecharacteristics of the formulation of drugs and the structure of the microemulsion vehicle have a noteworthy influence on the in vitro release of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as Diclofenac diethylamine (DAA)[14, 15]. In-vitro studies have confirmed that the Prilocaine and Lidocaine transdermal flux is much more efficient in labrasol/isostearyl stearate/isostearique/water microemulsion systems in comparison to the emulsion and/or hydrogel. The presence of oleic acid in its optimum microemulsion system, such as (0.5%) drug in oleic acid (10%)/ labrasol/ ethanol (1:5) (60%) and water, increases solubility and skin permeation of drug piroxicam [16]. Subramanian and coworkers have reported 5- and 11-times increased permeation for Celecoxib in IPM + medium chain mono-/diglyceride/Tween-80/water microemulsion formulation than cream and gel through rat skin, an in-vitro study [17]. Encapsulation of a drug such as Estradiol is used to treat hormonal insufficiencies, and it has been reported for improving 200 to 700-fold in transdermal flux over the control in various microemulsions because of

enhanced solubilization [18]. Cyclosporin A (Cys A) encapsulated in the o/w microemulsion system of IPM/Tween-20/water and showed 10 times higher transdermal activity than 20% ethanol containing normal saline suspension [19].

Drug delivery systems for *In-vivo*

Reports reveal that o/w microemulsion has successfully been utilized for ocular delivery of a second-generation antifungal drug, voriconazole, at the optimized composition [20]. Further, Dexamethasone, an ophthalmic medication, has successfully been administered *via* microemulsion-based mediums with retinol and its esters as an oil component [21]. Oil /Water microemulsion such as IPM/(Tween-20/80 + Span-20/80 + n-butanol)/water increases Chloramphenicol stability, a drug commonly used for the treatment of keratitis and trachoma, after encapsulation, and the drug is circumscribed in the water core, as validated with the NMR studies [22]. BDC (Biphenyl dimethyl carboxylate), a drug utilized to treat liver disease, is administered via oral route in a pre-microemulsion concentrate containing oil, co-surfactant, and surfactant. The pre-microemulsion concentrate of BDC greatly impacted its bioavailability when administrated through the oral route [23]. The bioavailability of Docetaxel (Dx), a hydrophobic drug, increases in the Cremophor EL/Capryol 90/Transcutol microemulsion systems, and studies on ultrafiltration and dialysis have shown that Dx can be released from the microemulsion medium at a rate of 80% in 12 hours. A recently introduced novel microemulsion formulation that is comprised of Cremophor RH40 (surfactant), Capryol 90 (oil), and Transcutol P aqueous solution (co-surfactant) enhanced the solubility of anti-inflammatory, curcumin, antivirus, antitumor, antioxidation, and drug with low toxicity. Curcumin's oral bioavailability in microemulsions is increased 22.6-fold than that in suspension [24]. Amphotericin B (Amp B), a multifunctional medicine known to have strong antifungal and antibiotic activi-

ties, which is preferred in chemotherapy of cancer and organ transplants, has low bioavailability and solubility when administered through oral route. Administration of Amp B through the intravenous route that is encapsulated in IPM/ (SbPC + Tween-80)/water microemulsion has been seen to have increased solubilizing capacity and low toxicity compared to parenteral administration as solubilizate in sodium deoxycholate (FungizoneR; Bristol Mayer Squibb) in male Albino mice. O/W system of microemulsion with surfactant: a mixture of co-surfactants such as; ethyl alcohol (5:1) and 12-hydroxystearate (Solutol HS-15) with the optimized composition of the drug, Propofol (itself as the oil phase, 1% (w/w) solubilized with 8% (w/w) of Solutol Hs-15 + ethyl alcohol (5:1) and water), has been utilized for its parenteral delivery [25].Water in oil microemulsion of 45% ethanol (2:1)/ethyl oleate (48%) and soy lecithin/water (7%) has been utilized[26]for encasing norcantheridine, a hepatogenic drug (NCTD).

The drug uptake was threefold higher in nasal doses than intravenous injection [27]. The bioavailability of the microemulsion-based formulation of Diazepam has been observed to be increased by 50% in 0-2 hours via nasal spray route, as well as it achieved peak plasma concentration of the drug within 2-3 min contrast to intravenous injection. The higher rate of solubility of the drug has also been established (41mg/mL) in the microemulsion system [28]. Clonazepam, utilized for the treatment of epilepsy, has also been prepared in a microemulsion system that was found to be rapidly and effectively transported to the brain [29]. Encapsulating drugs such as Sumatriptan and Sumatriptan succinate in a system of mucoadhesive microemulsion has enhanced their efficiency as anti-migraine drugs if delivered both intranasal and intravenous [30]. Curcumin has been successfully administered *via* microemulsions based on terpenes composed of terpenes (limonene, α-terpineol, and 1,8-cineole), cosurfactant, polysorbate 80, and water for transdermal delivery. Limonene blended microemulsions have been reported for higher skin retention and

efficacy for transdermal delivery, as revealed from the studies on neonate pig skin in contrast to other terpenes[31].

Future Outlook

Potential applications of bio-inspired microemulsions have achieved great heights in several areas of pharmaceutical sciences. Typically, delivery of drugs and pharmacology deal with the designing, synthesizing, and using biocompatible substances, as nanocarriers, Often, drugs can be delivered via multiple routes, viz. oral, intravenous, nasal, transdermal, suppository, arterial, sublingual, subcutaneous, etc., to produce a desired therapeutic effect. To date, microemulsion-based drug delivery systems are extensively studied as topically administered vehicles. Recent advancement in this area unfolds various avenues in nano-research utilizing nanostructures/nano-environments, which possess enormous potential to influence future biomedical applications. Therefore, an increasing number of novel materials and newer techniques must be accessed cost-effectively for their broader applicability in medical sciences.

Reference

1. Danielsson, I., Lindman, B., *Colloids Surfaces* **1981**, *3*, 391-392.
2. Lawrence, M. J., Rees, G. D., *Adv Drug Deliv Rev*. **2000**, *45*, 89-121.
3. Nazar, M. F., Khan, A. M., Shah, S. S., *AAPS PharmSciTech*. **2009**, *10*, 1286-1294.
4. Mehta, S. K., Kaur, G., Bhasin, K. K., *Pharm Res*. **2008**, *25*, 227–235.
5. Guo, R., Qian, S., Zhu, J., Qian, J., *Colloid Polym Sci.* **2006**, *284*, 468-474.
6. Holm, R., Porter, C. J. H., Edward, G. A., Mullertz, A., Kristensen, H. G., Charman, W.N., *Eur J Pharm Sci.***2003**, *20*, 91-97.
7. Pouton, C. W., *Eur J Pharm Sci*. **2000**, *11*, S93-S98.
8. Park, H., Ha, S., Kim, M. S.,*Pharm.* **2020**, *12*, 365.

9. Xianyi S, Juan W, Yanzuo C, Xiaoling F .Int J Nanomed **2012,** *7*, 705-712.
10. Sheikh, A., Bhat, A., Alshehri, B., Mir, A., Mir, R., Parry, A., Mir, A., *J. Biomed. Nanotechnol.* **2021**, *17*, 2298-2318.
11. Hathout, R. M., Woodman, T.J.,Mansour, S., Nahed, D. M., Geneidi, A. S., Gu, R. H.,*Eur. J. Pharm. Sci.***2010**, *40*, 188-196.
12. Shukla, A., Krause, A., Neubert, R. H. H., *J Pharm Pharmacol*. **2003**, *55*, 741-748.
13. Djordjevic, L., Primorac, M., Krajisnik, D.,*Int J Pharm*. **2004**, *271*, 11-19.
14. Djordjevic, L., Primorac, M., Stuper, M.,*Int J Pharm*. **2005**, 296, 73-79.
15. Park, E. S., Cui, Y., Yun, B. J., Ko, I. J., Chi, S. C., *Arch Pharm Res* **2005**, *28*, 243-248.
16. Subramanian, N., Ghosal, S. K., Moulik, S. P.,*Drug Dev Ind Pharm.* **2005**, *31*, 657-666.
17. Peltola, S., Saarinen-Savolailen, P., Kiesvaara, J., Suhonen, T. M., Urtti, A.,*Int J Pharm*. **2003**, *254*, 99-107.
18. Liu, H., Li, S., Wang, Y., Han, F., Dong, Y., *Drug Dev Ind Pharm.* **2006***,* *32*, 549-557.
19. Kumar, R., Sinha, V.R., *Colloids Surf B Biointerfaces*. **2014***, 117*, 82-88.
20. Rodomska, A., Dobrucki, R., *Int J Pharm*. **2000**, *196*, 131-134.
21. Lv, F. F., Zheng, L. Q., Tung, C. H., *Int J Pharm*. **2005**, *301*, 237-246.
22. Naaz, T., Nazir, S., Rashid, A. M.,Akhtar, M. N., Usman, M., Abbas, M., Abbas G.,*Pharm. Chem. J.* **2020**, *53*, 1047-1052.
23. Hu, L., Jia, Y., Niu, F., Jia, Z., Yang, X., Jiao, K., *J Agric Food Chem*. **2012**, *60*, 7137-7141.
24. Ryoo, H. K., Park, C. W., Chi, S. C., Park, E. S., *Arch Pharm Res*. **2005**, *28*, 1000-1404.
25. Zhang, L., Sun, X., Zhang, Z. R., *Drug Deliv*. **2005***,12*, 289-295.
26. Zhang, Q., Jiang, J., Jiang, W., Lu, W., Su, L., Shi, Z., *Int J Pharm*.

2004, *275*, 85-96.

27. Lianly, I. L., Nandi, I., Kim, K. H., *Int J Pharm*. **2002,** *237*, 77-85.
28. Vyas, T. K., Babbar, A. K., Sharma, R. K., Singh, S., Misra, A.,*J Pharm Sci*. **2006***, 95*, 570-580.
29. Abdel-Bar, H M., Abdel-Reheem, A. U., , Awad, G. A. S., , Mortada, N.D., *J Pharm Pharm Sci.***2013**, *16*, 456 – 469.
30. Liu, C-H, Chang, F-Y, Hung, D-K., *Colloids Surf. B* **2011***, 82*, 63-70.
31. Kaspute, G. , Ivaskiene, T., Ramanavicius,A., Ramanavicius,S., Prentice, U.,*Pharm.***2025**, 17, 793-816.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Protection and Deprotection of Alcohols in Organic Synthesis

Kalyan Senapati *

Abstract: The protection and deprotection of alcohols are essential strategies in synthetic organic chemistry, particularly in the multi-step construction of complex molecules such as natural products, pharmaceuticals, and polymers. Alcohols are highly reactive functional groups that can interfere with selective transformations; therefore, their temporary modification through protecting groups is crucial for achieving high yields and selectivity. A wide range of protecting groups has been reported in the literature, each offering specific advantages depending on the required stability under various reaction conditions. This review summarizes the most widely used alcohol-protecting groups, their methods of installation and removal, and their compatibility with different functional groups and synthetic pathways.

Introduction: In multistep organic synthesis, achieving selective transformations of intermediates can be challenging in the presence of reactive functional groups such as amines, alcohols, and carbonyl compounds.[1] These functional groups often interfere with desired reactions, leading to side products or reduced yields. To overcome this issue, it is sometimes

* Department of Chemistry, Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia.
e-mail: kalyanbubun@yahoo.com

necessary to temporarily mask the reactive sites using protecting groups. This strategy allows chemists to carry out specific reactions without interference from other functional groups.

This review focuses primarily on the protection and deprotection of alcohols. Alcohols are particularly prone to oxidation and can be readily converted into aldehydes, ketones, carboxylic acids, or other functional groups under certain conditions.[2] To prevent such unwanted transformations, alcohols are often protected during synthetic steps. The use of appropriate protecting groups enhances the selectivity, efficiency, and overall success of synthetic pathways. Over the years, a wide variety of alcohol-protecting groups has been developed, each offering unique properties and stabilities suited to different reaction conditions. This review highlights the most commonly used alcohol-protecting groups, their methods of installation and removal, and their compatibility with other functional groups in complex synthetic sequences.

A. Alcohol protection via formation of ethers

1. Methyl ether: One of the simplest and most commonly employed methods for protecting alcohols involves the formation of methyl ethers. This transformation typically begins with the treatment of the alcohol with a strong base such as sodium hydride (NaH), which generates the corresponding alkoxide ion. The alkoxide then undergoes an S_N2 reaction with a methyl halide most commonly methyl iodide or methyl bromide to yield the methyl ether, Scheme 1.[3]

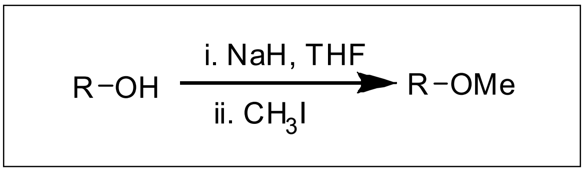

Scheme 1. Protection of Alcohol using NaH and MeI

This approach is widely known as the Williamson Ether Synthesis. Alternatively, methyl ethers can be prepared via the reaction of alcohol with dimethyl sulfate, which serves as an efficient methylating agent, Scheme 2.[4]

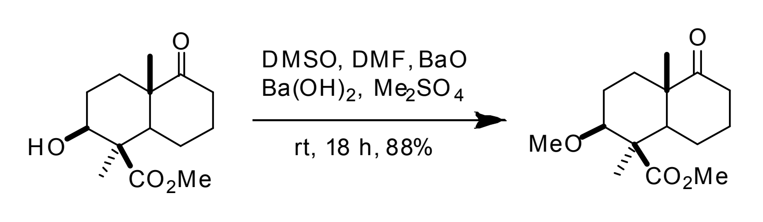

Scheme 2. Protection of Alcohol using Me_2SO_4

Methyl ethers are remarkably stable across a broad pH range (pH 1–14) and exhibit resistance to a variety of chemical conditions, including exposure to strong bases, nucleophiles, oxidizing agents, and hydride reagents. Deprotection of methyl ethers can be accomplished through treatment with concentrated hydroiodic acid (HI), which cleaves the C–O bond, regenerating the free alcohol. Other effective reagents for demethylation include boron tribromide (BBr),[5] Scheme 3, and trimethylsilyl iodide (MeSiI)[6].

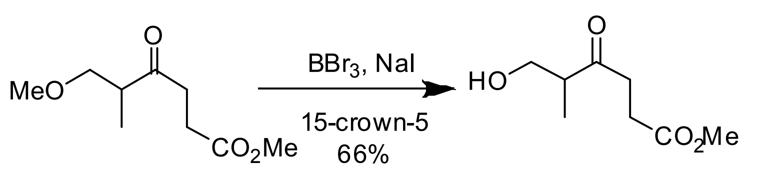

Scheme 3. Cleavage of Metyl ether bond using BBr_3

2. Benzyl ethers: Benzyl ethers represent another widely utilized class of alcohol protecting groups. The protection strategy parallels that of methyl ethers; however, in this case, benzyl halides (e.g., benzyl bromide or benzyl iodide) are used instead of methyl halides, Scheme 4.[7]

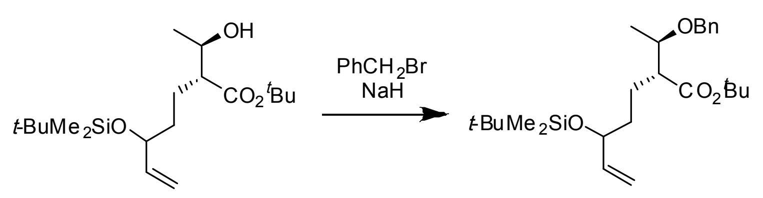

Scheme 4. Protection of Alcohols using Benzyl Bromide and NaH

Benzyl ethers exhibit slightly more stability to methyl ethers under both acidic and basic conditions. A key advantage of benzyl ethers lies in their mild and selective deprotection methodologies. They can be cleaved by hydrogenolysis, typically using molecular hydrogen (H_2) in the presence of a catalytic amount of palladium on carbon (Pd/C), Scheme 5.[8] Alternatively, dissolving metal reduction, such as treatment with sodium in liquid ammonia, offers an effective means of deprotection under strongly reducing conditions.[9]

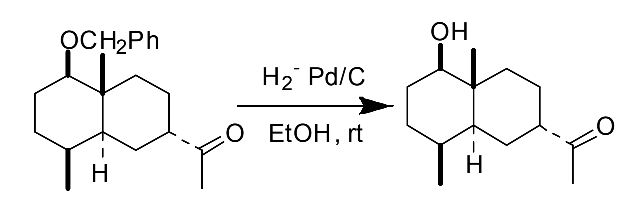

Scheme 5. Cleavage of Benzyl ether bond using H_2-Pd/C

3. (Benzyloxy)methyl (BOM) ethers: Deprotection of benzyl ethers derived from secondary and tertiary alcohols is often inefficient due to their resistance to cleavage under standard hydrogenolysis conditions. As a more labile alternative, (benzyloxy)methyl (BOM) ethers can be employed, which undergo rapid and efficient deprotection in the presence of hydrogen and palladium on carbon (H_2–Pd/C), Scheme 6. Protection of alcohols as BOM ethers can be achieved by reacting (benzyloxy)methyl chloride with the corresponding alcohol in the presence of isopropylamine as a

base, typically in dichloromethane (DCM) as the solvent, Scheme 6.[10]

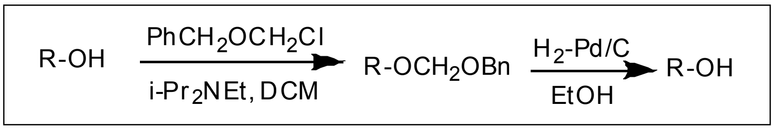

Scheme 6. Formation and deprotection of BOM ethers

4. *tert*-Butyl ethers: Alcohols can also be protected by converting them into *tert*-butyl ethers. This transformation is typically achieved by reacting the alcohol with isobutylene in the presence of an acid catalyst such as H_2SO_4 or BF_3, (Scheme 7).[11] The reaction proceeds via an S_N1-type mechanism, involving the formation of a tertiary carbocation intermediate. *tert*-Butyl ethers are highly stable protecting groups, resistant to a wide range of reaction conditions.

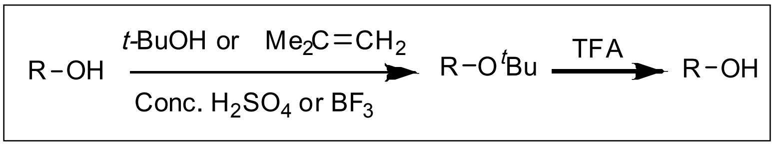

Scheme 7. Formation and cleavage of *tert*-Butyl ethers bond

They are stable across the entire pH range (1–14) and tolerate nucleophiles, organometallic reagents, hydrides, catalytic hydrogenation, oxidizing agents, and metal-based reductions. Deprotection of the *tert*-butyl ether group can be accomplished using anhydroustrifluoroacetic acid (TFA), Scheme 7,[12] or trimethylsilyl iodide (TMSI),[6] which cleave the ether to regenerate the free alcohol.

B. Alcohol protection via formation of silyl ethers

One of the most important protecting groups for alcohols is the silyl ether. The stability of a silyl protecting group varies depending on the substitution on the silicon atom. Generally, silyl ether bonds can be cleaved by treatment with fluoride ions or by aqueous base or acid.

1.Trimethylsilyl (TMS) ether: Trimethylsilyl (TMS) ether is the commonly used silyl protecting group of alcohols. Chlorotrimethylsilane reacts with alcohols in the presence of an amine base such as pyridine or triethylamine to form the TMS ether, Scheme 8.[13]

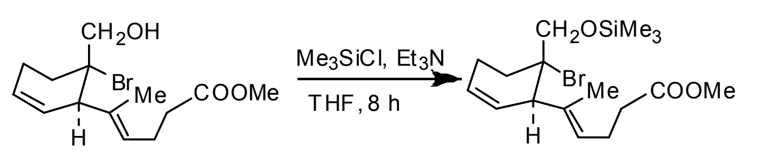

Scheme 8. Protection of Alcohol using TMSCl

Silyl ethers are highly sensitive to aqueous conditions and are less stable in the presence of Grignard reagents, nucleophiles, hydrogenation conditions, and hydride reagents. Due to these stability issues, TMS ethers are typically used for short-term protection of alcohols. Trimethylsilyl (TMS) ethers can be efficiently and rapidly deprotected using tetrabutylammonium fluoride (TBAF) in tetrahydrofuran (THF) at low temperatures.[14]

2.Triethylsilyl (TES) ether: A more stable silyl ether protecting group is the triethylsilyl (TES) group. The protection of alcohols to form triethylsilyl ethers is similar to the formation of TMS ethers, where triethylsilyl chloride is used instader of trimethylsilyl chloride, Scheme 9.[15]

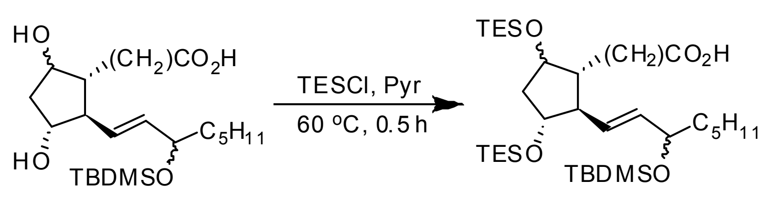

Scheme 9. Protection of alcohol using TESCl

The stability of the OTES (triethylsilyl ether) group is greater than

that of the OTMS (trimethylsilyl ether) group. OTES is stable under Grignard addition, oxidation, and Wittig reaction conditions. It is also less sensitive to water compared to OTMS. However, alcoholic *p*-toluenesulfonic acid and aqueous acetic acid are sufficiently reactive to cleave the Si–O bond in OTES ethers. In addition to TBAF in THF, other commonly used reagents for the cleavage of the OTES ether bond include 2% hydrofluoric acid (HF) in acetonitrile[16] or a mixture of HF–pyridine in THF.[17]

3.Triisopropylsilyl (TIPS) ether: Triisopropylsilyl (TIPS) ether [O–Si($CHMe_2$)$_3$] is another silyl ether protecting group of alcohol that can tolerate nucleophiles, oxidizing agents, organometallic reagents, and hydrogenation conditions. The greater bulkiness of the TIPS make the protecting group more stable to acid hydrolysis. Triisopropylsilyl chloride (TIPSCl) can selectively protect primary alcohols in the presence of secondary alcohols forming TIPS ethers. Alcohol react with Triisopropylsilylchloride in presence of base like imidazole in DMF to give Triisopropylsilyl ether, Scheme 10.[18]

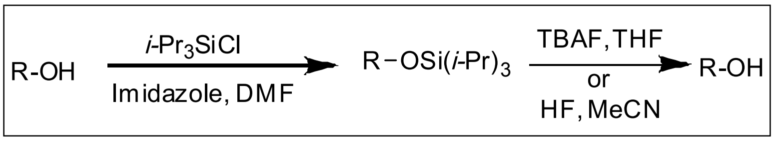

Scheme 10. Formation and cleavage of Triisopropylsilylether bond

This protecting group is stable over a wide pH range, typically from 2 to 14. Deprotection of the TIPS group is usually carried out using tetrabutylammonium fluoride (TBAF)[19] or alcoholic hydrofluoric acid (HF).[20]

4.*tert*-Butyldimethylsilyl (TBDMS or TBS) ether: Another widely used bulky silyl ether protecting group is *tert*-butyldimethylsilyl (TBDMS or TBS). *tert*-Butyldimethylsilyl chloride reacts with alcohols in the presence of a base such as 4-dimethylaminopyridine (DMAP) or imidazole to give

the corresponding TBDMS ether, Scheme 11.[21]

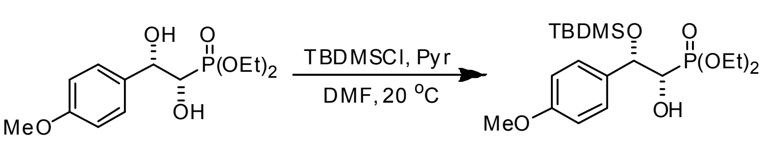

Scheme 11. Protection of alcohol using TBDMSCl

This protecting group is stable within a pH range of approximately 4–12 and is inert toward nucleophiles, organometallic reagents, hydrogenation conditions, hydrides, and oxidizing agents. The stability of TBDMS ether is approximately ten thousand time more than TMS ether to base hydrolysis. Due to bulky side of *tert*-Butyldimethylsilylgroup the selective protection of primary alcohol in presence of secondary alchohol is observed. Deprotection of the TBDMS ether can be achieved using aqueous acid.[19] Other common methods involve the use of fluoride ions, such as TBAF,[22] Tetrabutylammonium chloride and potassium fluoride (KF),[23] aqueous HF.[24]

5.*tert*-Butyldiphenylsilyl (TBDPS) ether: The *tert*-butyldiphenylsilyl (TBDPS) ether group [O–$SiPh_2C(Me)_3$, OTBDPS], developed by Hanessian and Lavallée, is one of the most widely used silicon-based protecting groups for alcohols. TBDPS ether is around hundred times more stable than TBDMS ether towards acid hydrolysis but less stable under basic condition. A general method for synthesizing TBDPS ethers involves the reaction of alcohols with *tert*-butyldiphenylsilyl chloride in the presence of a base such as pyridine or imidazole, Scheme 12.[25]

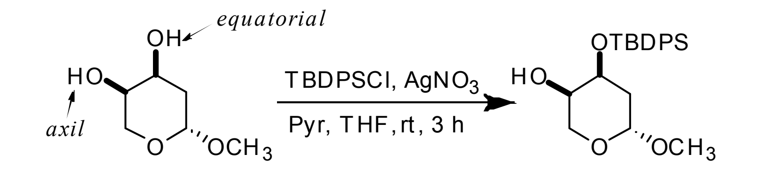

Scheme 12. Protection of alcohol using TBDPSCl

Alcohol protection using *tert*-butyldiphenylsilyl (TBDPS) groups typically occurs at less sterically hindered sites, with more acidic alcohols undergoing protection more efficiently.*tert*-Butyldiphenylsilyl (TBDPS) ethers can be deprotected using tetrabutylammonium fluoride (TBAF),[26] base-catalyzed hydrolysis (Scheme 13),[27] or a mixture of HF and pyridine.[28]

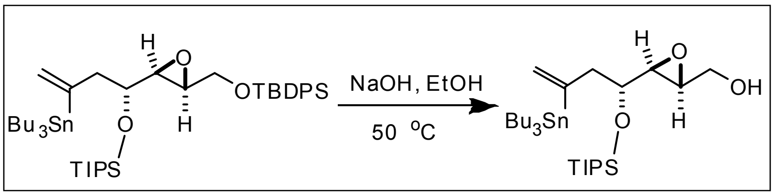

Scheme 13. Cleavage of TBDPS-ether bond using NaOH

C. Alcohol protection via acetal formation

1.THP Protection: The THP (tetrahydropyranyl) protecting group has been widely used in organic chemistry for many years due to its low cost and ready availability. In the presence of acid catalysts such as TsOH, $BF_3{\cdot}OEt_2$, $POCl_3$, or PPTS, alcohols react with dihydropyran (DHP) to form THP-protected ethers via an oxygen-stabilized carbocation intermediate, Scheme 14.[29]

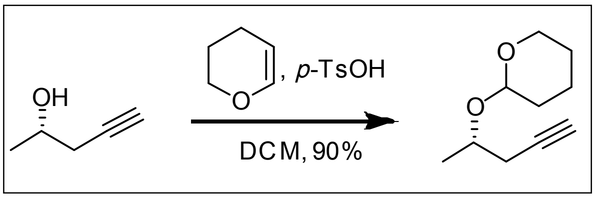

Scheme 14. Protection of Alcohol using Dihydropyran

THP ethers are stable under basic conditions within a pH range of 6 to 12, but they are highly unstable under acidic conditions (low pH). They also exhibit good stability toward nucleophiles, organometallic reagents,

hydrogenation, hydride sources, and oxidizing agents. Since RO-THP is an acetal, it can be readily deprotected under aqueous acidic conditions (Scheme 15) using reagents such as AcOH–THF, TsOH, or HCl in ethanol.[30]

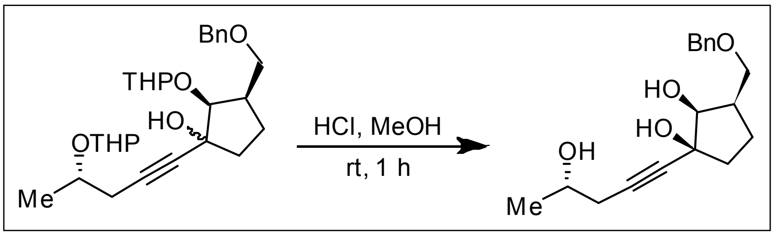

Scheme 15. Deprotection of THF ether bond using HCl

However, the formation of a new chiral centre during THP protection often leads to a mixture of diastereomers when chiral alcohols are used, complicating spectral analysis. To overcome this issue, 5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran may be used as an alternative to THP, as it typically forms only a single isomer with chiral alcohols, Scheme 16.[31]

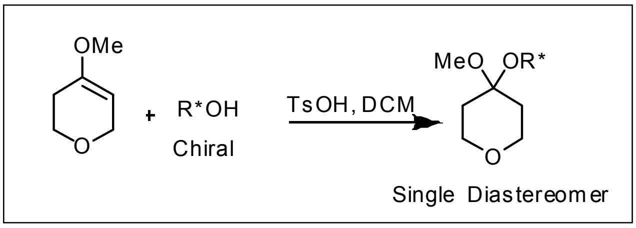

Scheme 16. Protection of Alcohol using 5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran

Another drawback of THP-ethers are their potential explosiveness; explosions have been reported when tetrahydropyranyl ethers are treated with diborane in the presence of basic hydrogen peroxide[32] or with 40% peroxyacetic acid.[33]

2. Methoxymethyl Ethers: Alcohols can be protected using α -halo ethers, such as chloromethyl methyl ether (MOM-Cl). This reaction typically requires the presence of a base, such as an alkoxide, alkylamine, or hydride to form the corresponding formaldehyde acetal, Scheme 17.[34] In the case of tertiary alcohols, additional modifications are often necessary to achieve good yields. Successful alkylation can be accomplished by directly using MOM iodide (MOM-I) or by generating MOM-I in situ from MOM-Cl using sodium iodide (NaI).[35]

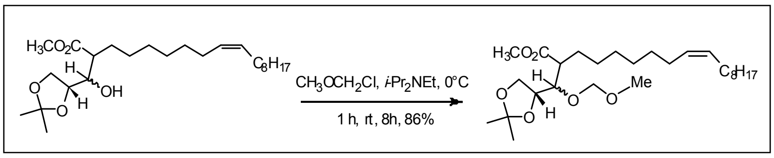

Scheme 17. Protection of Alcohol using Chloromethyl methyl ether

The MOM protecting group is sensitive to acid but remains stable within a pH range of 4–12. Unlike the *o*-benzyl (BnO) group, which resists cleavage even below pH = 1. Normally MOM group readily cleaves under acidic conditions, such as treatment with 50% aqueous acetic acid in the presence of catalytic amount of sulfuric acid [36] or hydrochloric acid in methanol.[37] It is stable in the presence of hydrides, nucleophiles, organometallic reagents, catalytic hydrogenation, and oxidizing agents. However, it is highly sensitive to acidic media below pH 4, leading to deprotection and regeneration of the alcohol. Trimethylsilyl bromide (TMSBr) is effective for selectively cleaving the MOM group in the presence of a benzyl-protected (OBn) group, Scheme 18.[38] The major drawback of this method is the use of chloromethyl methyl ether, which is a known *carcinogen*.

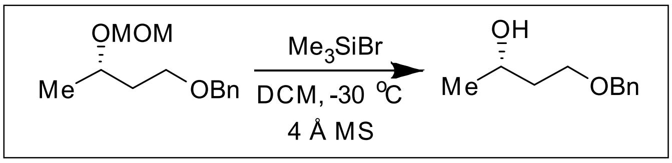

Scheme 18. Deprotection of Methoxymethyl ether using Me_3SiBr

3. MethylthiomethylEther: The methylthio-methyl ether (O-CH_2SMe, OMTM) is a variation of the MOM protecting group in which the oxygen atom is replaced by sulfur. Chloromethyl methyl sulfide reacts with alcohols in the presence of a base, such as an alkoxide or sodium hydride, to form the OMTM ether, Scheme 19.[39]

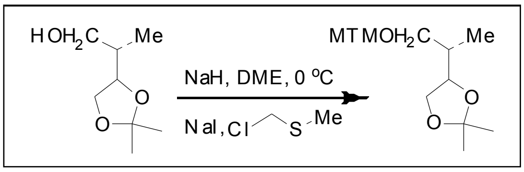

Scheme 19. Protection of Alcohol using chloromethyl methyl sulflde

An alternative method for installing this protecting group involves the use of dimethyl sulfoxide (DMSO) in acetic anhydride.[40] Thisthioether protecting group is stable across a pH range of 1–12 and is resistant to nucleophiles, organometallic reagents and hydrides. However, since sulfur is part of the protecting group, many oxidizing agents are not suitable, as they can oxidize the sulfur to a sulfoxide.

Deprotection of the MTM group can be achieved by simple treatment with a Lewis acid, especially mercury salts.[39] Alternatively, a mixture of potassium carbonate and methyl iodide in acetone can also be used for MTM deprotection, Scheme 20.[41]

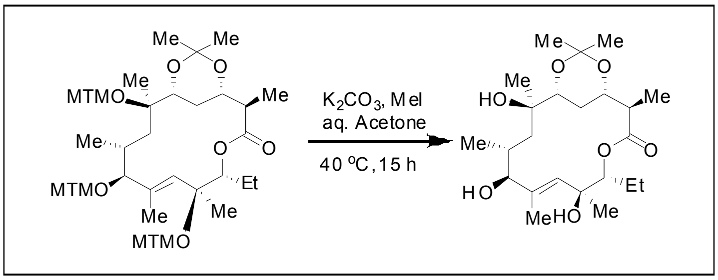

Scheme 20. Deprotection of MTM using K_2CO_3 and MeI

4. 2-Methoxyethoxymethyl ether: 2-Methoxyethoxymethyl ether (–O–CHOCHCHOMe, OMEM) is another acetal-protecting group for alcohols, similar to the MOM group. Alcohols react with 2-methoxyethoxymethyl chloride in the presence of sodium hydride (NaH) to give OMEM-protected alcohols, Scheme 21.[42]

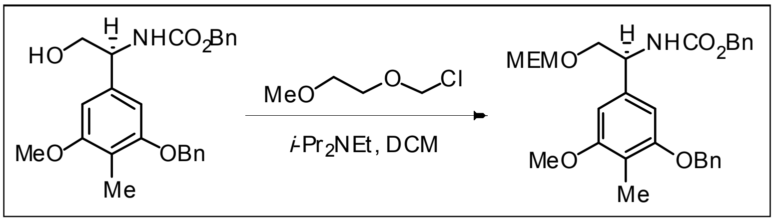

Scheme 21. Protection of alcohol using methoxyethoxymethyl chloride

OMEM ethers are stable over a pH range of 1–12 but are unstable under strongly acidic conditions and are highly sensitive to Lewis acids. However, they are inert in the presence of hydrides, oxidizing agents, and nucleophiles.Deprotection of OMEM ethers can be carried out using zinc bromide ($ZnBr_2$) or titanium tetrachloride ($TiCl_4$) in dichloromethane (DCM) Scheme 22.[43]

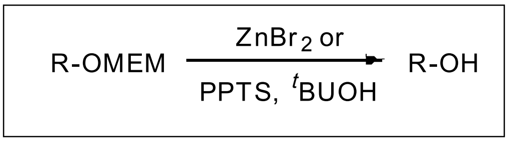

Scheme 22. Deprotection of MEM using $ZnBr_2$

D. Alcohol protection via ester formation

Alcohols can be protected by forming O-esters, where the R group can vary. However, ester-based protection has limitations, as esters are susceptible to nucleophilic attack, hydrolysis, and reduction. Numerous esters have been reported in the literature as protecting groups for alcohols.

1. Acetyl ester: Acetylation is one such method, where alcohol react with acetyl chloride or acetic anhydride in the presence of a base such as pyridine or triethylamine to form esters, Scheme 23.[44]

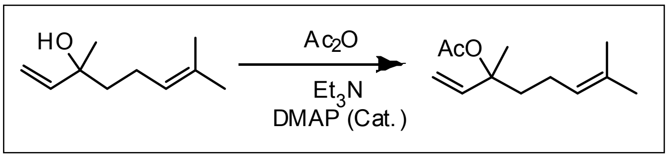

Scheme 23. Protection of Alcohol using Ac_2O and Et_3N

The catalytic use of DMAP (4-dimethylaminopyridine) significantly enhances the rate of acylation of alcohols with acetic anhydride (Ac_2O), increasing the reaction rate by approximately 10,000 times. Acetals are generally stable in the pH range of 1–8 and are resistant to many reagents, including Lewis acids, catalytic hydrogenation, bohydrides, ylids and oxidizing agents. Deprotection of acetyl esters is most commonly carried out under basic conditions,[45] although acidic conditions[46] can also be used, depending on the sensitivity of the substrate. In some cases, enzymatic hydrolysis has been employed for selective deprotection, Scheme 24.[47]

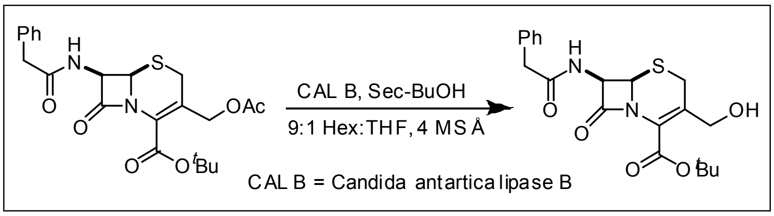

Scheme 24. Deprotection of acetyl ester by Candida antartica Lipase B

2. Benzoate ester: Alcohols may be protected by converting them into benzoate esters, typically through benzoylation reactions. This can be achieved by reacting alcohols with benzoyl chloride or benzoic anhydride in the presence of a base such as pyridine or trimethylamine, Scheme 25.[48]

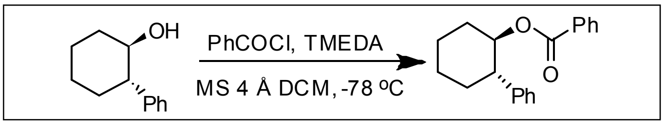

Scheme 25. Protection of Alcohol using benzoyl chloride and DMAP

Benzoate esters are more stable than acetates and exhibit good stability across a wide pH range (approximately pH 1 to 11). They are resistant to hydrogenation, borohydride reduction, and oxidation reactions, making them robust protecting groups for alcohols under a variety of reaction conditions. Deprotection of benzoate esters normally carried out through base hydrolysis that is saponification, Scheme 26[49] or by using MeOH/KCN, depending on the specific context and desired reaction conditions.[50]

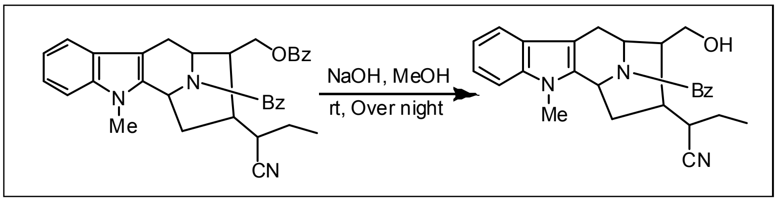

Scheme 26. Deprotection of benzoate ester by NaOH

3.Pivaloyl ester: Another commonly used alcohol protecting group is the pivaloyl ester. Pivaloyl ester protection can be achieved by reacting an alcohol with pivaloyl chloride in the presence of a base such as pyridine, Scheme 27.[51] Although the reaction may sometimes require longer reaction times, it offers high selectivity, particularly favoring the protection of less sterically hindered alcohols due to its t-butyl group. Typically, primary alcohols are protected more readily than secondary alcohols in this reaction.

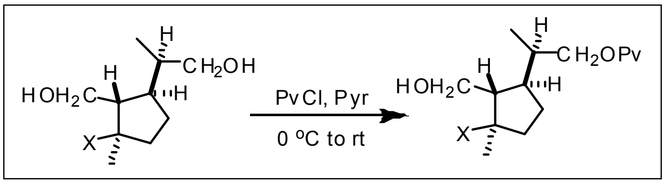

Scheme 27. Protection of alcohol using pivaloyl chloride

Deprotection of pivaloyl esters can be carried out using tetrabutylammonium hydroxide (Bu_4NOH)[52] or sodium methoxide (NaOMe) in methanol.[53] Among the three ester-based alcohol protecting groups discussed above, the order of reactivity toward nucleophilic attack or hydrolysis is: R–OAc> R–OBz> R–O–Pv. A summary of the discussed alcohol protecting groups is tabulated in Table 1.

Conclusion: The effective use of protecting groups is a cornerstone of modern synthetic organic chemistry, particularly in complex multistep synthesis. Alcohols, among the most reactive functional groups, often require selective protection due to their nucleophilicity and susceptibility to oxidation and substitution. Temporarily masking alcohols prevents unwanted side reactions and enhances the selectivity and efficiency of targeted transformations. A wide array of alcohol-protecting groups—ethers, silyl ethers, acetals, and esters—are available, each offering unique stability, reactivity, and deprotection characteristics. Silyl ethers such as TMS, TES, TIPS, TBDMS, and TBDPS are especially valued for their tunable stability and ease of removal using fluoride reagents. Ether-based protecting groups like methyl, benzyl, BOM, MOM, OMEM, and THP provide robust protection, with deprotection typically achieved via acid catalysis or hydrogenolysis. Ester protecting groups, including acetates, benzoates, and pivalates, introduce chemoselectivity, especially under hydrolytic conditions. Acetal-based groups offer additional functional group compatibility but may present stereochemical or safety concerns. Choosing the appropriate protecting group depends on the alcohol's nature, required stability during synthesis, and mild, selective deprotection conditions. Mastery of these strategies enables chemists to construct complex molecules efficiently and selectively. This review aims to support beginners in organic synthetic chemistry by providing an overview of the versatility and strategic applications of alcohol-protecting groups.

Table 1: Common Alcohol Protecting Groups: Protection Conditions, Deprotection Conditions, and Functional Group Tolerance

Sl	Protecting group	Protection Reagent(s)	Deprotection Reagent(s)	Tolerance
1	Methyl ether	1.NaH,MeI,THF 2.Me_2SO_4, DMSO	1. BBr_3 2. Concentrated HI 3. Me_3SiI/ THF	1. pH range 1-14 2. Strong base 3. Nucleophiles 4. Oxidizing agents 5. Hydrides 6. Organometallics 7. Ylids
2	Benzyl ether	1. NaH, BnBr, THF	1. H_2-Pd(C)/ EtOH 2. Na/NH_3(l)/THF	1. pH range 1-14 2. Strong base 3. Nucleophiles 4. Few oxidizing agents 5. Hydrides 6. Organometallics
3	(Benzyloxy) methyl (BOM) ethers	1. BOM-Cl, *i*Pr_2Net, DCM	1. H_2-Pd(C)/ EtOH	1.pH range 4-10 2.Basic condition 3.Nucleophiles 4.Some oxidizing agents

Sl	Protecting group	Protection Reagent(s)	Deprotection Reagent(s)	Tolerance
4	*tert*-Butyl ethers	1. isobutylene, H_2SO_4 2. *t*-BuOH, H_2SO_4 (BF_3 may be used instead of H_2SO_4)	1.TFA2. Me_3SiI/ THF	1. pH range (1–14) 2. Nucleophiles 3. Organometallic reagents, 4. Hydrides, 5. Catalytic hydrogenation 6. Oxidizing agents 7. Metal-based reductions
5	Trimethylsilyl (TMS) ether	1.TMSCl, Et_3N,THF	1. TBAF/THF Acid 2. Dilute	1. Mild base 2. Some oxident (unstable to Acid, Water and Fluoride ion)
6	Triethylsilyl (TES) ether	1. TESCl, Pyr, THF	1. TBAF/THF 2. HF, MeCN 3. HF-Pyridine,THF 4. PTSA, MeOH 5.AcOH, H_2O	1. Mild base 2. Some oxident(Stability of TES ether is slightly higher than TMS ether)

Sl	Protecting group	Protection Reagent(s)	Deprotection Reagent(s)	Tolerance
7	Triisopropylsilyl (TIPS) ether	1. *i*Pr_2SiCl, Imidazole, DMF	1. TBAF/THF 2. HF, MeCN	1. pH range (2–14) 2. Nucleophiles, 3. Organometallics 4. Hydrogenation (nonacidic condition) 5. Hydride 6. Oxidizing agents
8	*tert*-Butyldimethylsilyl (TBDMS or TBS) ether	1.TBDMSCl, Pyridine, DMF	1. TBAF/THF 2. Aqueous HF 3. TBACl, KF, THF	1. pH range (4–12) 2. Nucleophiles 3.Organometallics 4. Hydrogenation (nonacidic condition) 5. Hydride 6. Oxidizing agents
9	*tert*-Butyldiphenylsilyl (TBDPS) ether	1. TBDPSCl, $AgNO_3$ Pyridine, THF	1.HF-Pyridine,THF 2.TBAF/THF 3.NaOH, MeOH	Similar to TBS (w.r.t TBS more stable to Lewis acid but sensitive to hydrogenation.)

Sl	Protecting group	Protection Reagent(s)	Deprotection Reagent(s)	Tolerance
10	THP Protection	1.DHP, p-TsOH, DCM	1. HCl, MeOH 2. AcOH, THF 3. TsOH, EtOH	1. pH range (6–12) 2. Hydrogenation 3. Hydrides 4. Oxidizing agents 5. Moderately stable to nucleophiles and organometallics
11	Methoxymethyl Ethers	1. MOMI, *i*Pr_2NEt, 2. MOMCl, *i*Pr_2NEt, NaI	1. Me_3SiBr, DCM	1. pH range (4–12) 2. Nucleophiles 3. Organometallic reagents 4. Hydrides, 5. Catalytic hydrogenation (nonacidic media) 6. Oxidation

Sl	Protecting group	Protection Reagent(s)	Deprotection Reagent(s)	Tolerance
12	Methylthiomethyl Ether	1. Me_3SCH_2Cl, NaH, NaI, DME	1. K_2CO_3, MeI 2. $HgCl_2$, MeCN/ H_2O	1. pH range (1–12) 2. Nucleophiles 3. Organometallics 4. Hydrides
13	2-Methoxyethoxymethyl ether	1. MEMCl, *i*Pr_2NEt, DCM	1. $ZnBr_2$, DCM 2. $TiCl_4$, DCM	1. pH range of 1–12 2. Hydrides 3.Oxidizing agents
14	Acetyl ester	1. Ac_2O or MeCOCl, Et_3N, DMAP	1. K_2CO_3, MeOH, H_2O 2. BF_3 Et_2O, CH_3CN- H_2O 3. CAL B, Sec-BuOH	4. Nucleophiles 5. organometallics 6. Hydrogenation 1. pH range of 1–8 2. Lewis acids, 3. Catalytic hydrogenation 4. Borohydrides 5. Ylids 6. Oxidizing agents

Sl	Protecting group	Protection Reagent(s)	Deprotection Reagent(s)	Tolerance
15	Benzoate ester	1. PhCOCl, TMEDA	1. 1% NaOH, MeOH 2. MeOH/ KCN	1. pH range (1 to 10) 2. Hydrogenation 3. Borohydride reduction 4. Oxidation reactions 5. Nucleophiles
16	Pivaloyl ester	1. PvCl, Pyridine	1. Bu_4NOH 2.NaOMe, MeOH	1. pH range (1 to 10) 2. Nucleophilic attack 3. Organometallics, catalytic 4. Hydrogenation 5. Boranes 6. Borohydrides 7. Lewis acids 8. Oxidation

Reference:

1. Greene, T. W.; Wuts, P. G. M. *Protective Groups in Organic Synthesis*, 4th ed.; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, 2007.
2. Yoshimura, A.; Zhdankin, V. V. Advances in Synthetic Applications of Hypervalent Iodine Compounds *Chem. Rev.***2016**, *116*, 3328.
3. Williamson, A. W. XXII.—On etherification. *J. Chem. Soc.***1852**, *4*, 229.
4. Reuvers, J. T. A.; de Groot, A. Total synthesis of (.mu.)-3.beta.-hydroxynagilactone F. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 4594.
5. Kuehne, M. E.; Pitner, J. B. Studies in biomimetic alkaloid syntheses. 17. Syntheses of iboxyphylline and related alkaloids. *J. Org. Chem.* **1989**, *54*, 4553.
6. Jung, M. E.; Lyster, M. A. Quantitative dealkylation of alkyl ethers via treatment with trimethylsilyl iodide. A new method for ether hydrolysis. *J. Org. Chem.* **1977**, *42*, 3761.
7. White, R. D.; Keaney, G. F.; Slown, C. D.; Wood, J. L. Total Synthesis of (±)-Kalihinol C. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 1123.
8. Heathcock, C. H.; Ratcliffe, R. Stereoselective total synthesis of the guaiazulenicsesquiterpenoids .alpha.-bulnesene and bulnesol. *J. Am. Chem. Soc.* **1971**, *93*, 1746.
9. McClosky, C. M. Benzyl Ethers of Sugars. *Adv. Carbohydr. Chem.* **1957**, *12*, 137.
10. Tanner, D.; Somfai, P. Enantioselective total synthesis of ingramycin. *Tetrahedron* **1987**, *43*, 4395.
11. Beyerman, H. C.; Heiszwolf, G. J. Reaction of Steroidal Alcohols with Isobutene : Usefulness of *t*-Butyl as Hydroxyl-protecting Group in a Synthesis of Testosterone. *J. Chem. Soc.***1963**, 755.
12. Beyerman, H. C.; Bontekoe, J. S. The t-Butoxy-group, A Novel Hydroxyl-protecting Group for Use in Peptide Synthesis with Hydroxy-amino-acids. *Proc. Chem. Soc.***1961**, 249.

13. Corey, E. J.; Snider, B. B. Total synthesis of (+-)-fumagillin. *J. Am. Chem. Soc.* **1972**, *94*, 2549.
14. Helmboldt, H.; Kohler, D.; Hiersemann, M. Synthesis of the NorjatrophaneDiterpene (“)-15-Acetyl-3-propionyl- 17-norcharaciol. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 1573.
15. Hart, T. W.; Metcalfe, D. A.; Scheinmann, F. Total synthesis of (±)-prostagladin D1: use of triethylsilyl protecting groups. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1979**, 156.
16. Boschelli, D.; Takemasa, T.; Nishitani, Y.; Masamune, S. Synthesis of amphotericin B. 2. fragment C-D of the aglycone. *Tetrahedron Lett.* **1985**, *26*, 5239.
17. Thoret, S.; Guéritte, F.; Guénard, D.; Dubois, J. Semisynthesis and Biological Evaluation of a Novel D-Seco Docetaxel Analogue. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 2301.
18. Cunico, R. F.; Bedell, L. The triisopropylsilyl group as a hydroxyl-protecting function. *J. Org. Chem.* **1980**, *45*, 4797.
19. Cheng, J. C.-Y.; Hacksell, U.; Daves, G. D., Jr. Facile Synthesis of 2’-Deoxy-3’-keto- and 2’-Deoxypseudouridine Derivatives and Analogues. Palladium(I1)-Mediated Coupling Reactions of FuranoidGlycals *J. Org. Chem.***1985**, *51*, 3093.
20. Mascareñas, J. L.; Mouriño, A.; Castedo, L. Studies on the Synthesis of Side-Chain Hydroxylated Metabolites of Vitamin D. 3. Synthesis of 25-Ketovitamin D3 and 25-Hydroxyvitamin D3 *J. Org. Chem.***1986**, *51*, 1269.
21. Yokomatsu, T.; Suemune, K.; Yamagishi, T.; Shibuya, S. Highly RegioselectiveSilylation of α,β-Dihydroxyphosphonates: An Application to Stereoselective Synthesis of α-Amino-β-hydroxyphosphonic Acid Derivatives. *Synlett* **1995**, 847.
22. Codelli, J. A.; Puchlopek, A. L. A.; Reisman, S. Enantioselective Total Synthesis of (“)-Acetylaranotin, a Dihydrooxepine Epidithiodiketopiperazine. *J. Am. Chem. Soc.***2012**, *134*, 1930.

23. Carpino, L. A.;Sau, A. C. Convenient source of 'naked' fluoride: tetra-n-butylammonium chloride and potassium fluoride dehydrate. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1979**, 514.
24. Newton, R. F.; Reynolds, D. P.; Finch, M. A. W.; Kelly, D. R.; Roberts, S. M. An excellent reagent for the removal of the t-butyldimethylsilyl protecting group. *Tetrahedron Lett.* **1979**, *20*, 3981.
25. Bhatt, R. K.; Chauhan, K.; Wheelan, P.; Murphy, R. C.; Falck, J. R. 3-Hydroxyleukotriene B4 (3-OH-LTB4): Total Synthesis and Stereochemical Assignment. *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, *116*, 5050.
26. Hanessian, S.; Lavallee, P. The Preparation and Synthetic Utility of tert-Butyldiphenylsilyl Ethers. *Can. J. Chem.* **1975**, *53*, 2975.
27. Williams, D. R.; Meyer, K. G. Total Synthesis of (+)-Amphidinolide K. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 765.
28. Matsuo, I.; Wada, M.; Ito, Y. Desilylation under high pressure. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 3273.
29. White, J. D.; Somers, T. C. G.; Reddy, N. Degradation and absolute configurational assignment to C34-botryococcene. *J. Org. Chem.* **1992**, *57*, 4991.
30. Bender, T.; Schuhmann, T.; Magull, J.; Grond, S.; von Zezschwitz, P. Comprehensive Study of Okaspirodiol: Characterization, Total Synthesis, and Biosynthesis of a New Metabolite from Streptomyces. *J. Org. Chem.* **2006**, *71*, 7125.
31. van Boom, J. H.; Herschied, J. D. M. p-Toluenesulfonic Acid as a Catalyst for the Rapid Tetrahydropyranylation and Methoxytetrahydropyranylation of Steroidal Alcohols. *Synthesis* **1973**, *1973*, 169.
32. Meyers, A. I.; Schwartzman, S.; Olson, G. L.; Cheung, H.-C. Detonation associated with oxidations of tetrahydropyranyl ether derivatives. A serious note of caution. *Tetrahedron Lett.* **1976**, *17*, 2417.
33. Corey, E. J.; Niwa, H.; Knolle, J. Total synthesis of (S)-12-hydroxy-

5,8,14-cis,-10-trans-eicosatetraenoic acid (Samuelsson's HETE). *J. Am. Chem. Soc.* **1978**, *100*, 1942.

34. Stork, G.; Takahashi, T. Chiral synthesis of prostaglandins (PGE1) from D-glyceraldehyde. *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, *99*, 1275.
35. Narasaka, K.; Sakakura, T.; Uchimaru, T.; Guedin-Vuong, D. Total synthesis of a macrocyclic pyrrolizidine alkaloid, (.+-.)-integerrimine, utilizing an activable protecting group. *J. Am. Chem. Soc.* **1984**, *106*, 2954.
36. Laforge, F. B. Rotenone. XXVI. Synthesis of the Parent Substances of Some Characteristic Rotenone Derivatives. *J. Am. Chem. Soc.* **1933**, *55*, 3040.
37. Auerbach, J.; Weinreb, S. M. Synthesis of terrein, a metabolite of Aspergillus terreus. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1974**, 298.
38. Hanessian, S.; Delorme, D.; Dufresne, Y. Mild cleavage of methoxymethyl (MOM) ethers with trimethylsilyl bromide. *Tetrahedron Lett.* **1984**, *25*, 2515.
39. Corey, E. J.; Bock, M. G. Protection of primary hydroxyl groups as methylthiomethyl ethers. *Tetrahedron Lett.* **1975**, *16*, 3269.
40. Pojer, P. M.; Angyal, S. J. Methylthiomethyl ethers: Their use in the protection and methylation of hydroxyl groups. *Aust. J. Chem.* **1978**, *31*, 1031.
41. Corey, E. J.; Hopkins, P. B.; Kim, S.; Yoo, Y.; Nambiar, K. P.; Falck, J. R. Total synthesis of erythromycins. 5. Total synthesis of erythronolide A. *J. Am. Chem. Soc.* **1979**, *101*, 7131.
42. Crowley, B. M.; Mori, Y.; McComas, C. C.; Tang, D.; Boger, D. L. Total Synthesis of the RistocetinAglycon. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 4310.
43. Corey, E. J.; Gras, J.-L.; Ulrich, P. A new general method for protection of the hydroxyl function *Tetrahedron Lett.* **1976**, 809.
44. Höfle, G.; Steglich, W.; Vorbrüggen, H. 4-Dialkylaminopyridines as Highly Active Acylation Catalysts. [New synthetic method (25)].

Angew. Chem., Int. Ed. Engl. **1978**, *17*, 569.

45. Plattner, J. J.; Gless, R. D.; Rapoport, H. Synthesis of some DE and CDE ring analogs of camptothecin. *J. Am. Chem. Soc.* **1972**, *94*, 8613.
46. Pozsgay, V. A Convergent Synthesis of a Hexadecasaccharide Fragment of the O-Polysaccharide of Shigelladysenteriae Type 1. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, *117*, 6673.
47. Patterson, L. D.; Miller, M. J.Enzymatic Deprotection of the Cephalosporin 32-Acetoxy Group Using Candida antarctica Lipase B. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 1289.
48. Sano, T.; Ohashi, K.;Oriyama, T. Remarkably Fast Acylation of Alcohols with Benzoyl Chloride Promoted by TMEDA. *Synthesis* **1999**, *1999*, 1141.
49. Mashimo, K.; Sato, Y. Synthesis of isoajmaline. *Tetrahedron* **1970**, *26*, 803.
50. Herzig, J.; Nudelman, A.; Gottlieb, H. E.; Fischer, B. Studies in sugar chemistry. 2. A simple method for O-deacylation of polyacylated sugars. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 727.
51. Kato, B. N.; Kataoka, H.; Ohbuchi, S.; Tanaka, S.; Takeshita, H. Total synthesis of albolic acid and ceroplastol II, 5–8–5-membered tricyclic insect sesterterpenoids, via a lactol-regulated silyloxy–Cope rearrangement. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.***1988**, 354.
52. vanBoeckel, C. A. A.; van Boom, J. H. Synthesis of glucosylphosphatidylglycerol via a phosphotriester intermediate. *Tetrahedron Lett.* **1979**, *20*, 3561.
53. Nicolaou, K. C.; Caulfield, T. J.; Kataoka, H.; Stylianides, N. A. Total synthesis of the tumor-associated Lex family of glycosphingolipids. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, *112*, 3693.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Colony Growth and Social Drivers of Roost-Site Selection in *Pteropus medius* (Temminck, 1825) in West Bengal

Susanta Mallick *

Abstract: The Indian Flying Fox *Pteropus medius* is known for its social behaviour and tendency to roost in large colonies in tall trees. This study investigates how the increasing colony size affects the roosting behaviour and social dynamics of *Pteropus medius* at Joteghanashyam (22°312 10.03N 87°50219.23E), Paschim Medinipur, West Bengal, over the 15 years. The results reveal that as colony populations grow, spatial constraints compel some individuals to occupy smaller, secondary roosting trees. Meanwhile, dominant or leader-bats play a critical role in preserving social cohesion by managing intra-colony interactions and facilitating coordinated foraging, which is essential for colony survival and for minimizing resource competition This study highlights the adaptability of *P. medius* in response to environmental and social pressures.

Keywords: *Pteropus medius*, Indian Flying Fox, roosting behaviour, colony size, social dynamics, leader-bats, secondary roosts, coordinated foraging, resource competition, roost-site adaptation.

---

* Assistant Professor, Department of Zoology, Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia.
e-mail: sus.zooh@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-4771-7394

Introduction

Historically known as *Pteropus giganteus* (Brünnich, 1782), the Indian flying fox was reclassified after taxonomic revisions revealed that *P. giganteus* is a junior synonym of *P. vampyrus*. Consequently, *Pteropus medius* (Temminck, 1825) is now recognized as the valid and correct name for the Indian specie sunder the International Code of Zoological Nomenclature (ICZN). It is one of the largest fruit bat species native to South Asia and is renowned for its complex social structure and communal roosting behaviour (Mallick *et al*., 2020). These highly gregarious megabats typically form large colonies that depend on tall, mature trees for daytime shelter. In tree-roosting *Pteropus medius*, trees play a vital role in thermoregulation, particularly during the South Asian monsoon. Dense foliage provides shade and reduces direct solar radiation, helping bats avoid overheating during hot, humid conditions. Elevated canopies facilitate airflow, aiding evaporative cooling. During heavy rainfall, tree structure and leaf cover offer partial protection, minimizing exposure to cold stress. The choice of roost trees with appropriate microclimatic features is crucial for maintaining thermal balance and colony stability (Elangovan et al., 2023).

However, as colony sizes increase, the availability of optimal roosting sites often becomes a limiting factor. The resulting spatial pressure can lead to intra-colony dispersion, forcing some individuals to occupy smaller or suboptimal trees (Mallick and Raut, 2010). Such shifts in roosting patterns may reflect behavioural plasticity in response to environmental and social constraints.

This long-term study investigates the roosting site selection behaviour of *Pteropus medius* at Joteghanashyam, West Bengal, India, where a single colony has been continuously monitored since 2 August 2008. Over 15 years, the colony has demonstrated marked growth, necessitating the use of secondary and less preferred roosts. In addition to spatial dynamics, this study places particular emphasis on the role of "leader-bats"—influ-

ential individuals whose daily patrols among roost trees and leadership during foraging bouts appear essential for maintaining colony cohesion and social order. By examining these adaptive strategies, we aim to provide deeper insight into how *P. medius* manages colony expansion in the face of ecological and spatial limitations (Altringham, 2011).

Methods

Leader bats of *Pteropus medius* were consistently observed patrolling all roost trees as part of their daily activity (Mallick *et al.*, 2021b). Their movements between primary and secondary roosts, particularly during the post-sunset period, were closely monitored to evaluate their role in maintaining colony cohesion and guiding dispersal.

- **Direct Observation:**

We monitored and studied the roosting behaviour of *Pteropus medius* using binoculars during systematic field observations, allowing for non-invasive assessment of their spatial positioning, colony dynamics, and daily activity patterns. Two trained observers collected data simultaneously to ensure accuracy and minimize observer bias. Observations were conducted twice per fortnight over the study period, with particular attention to the time individuals spent on various roost trees. This approach enabled detailed insights into tree preference and group-level behavioural patterns.

- **Roost Site Characteristics:**

The primary roost site was located in Joteghanashyam (22°31210.03N, 87°50219.23E), a small agrarian village in the Daspur II Block of Paschim Medinipur, West Bengal **(Fig. 5)**. The bats predominantly selected a large silk flower tree (Albizia lebbeck, Fabaceae) as their primary roost. The tree stood 16.15 meters tall with a diameter of 1.73 meters and a canopy spread of 1,637.96 m². Its proximity toa large permanent water body, combined with its structural features and dense canopy, likely made it a highly suitable and strategic roosting site.

Fig. 5: The satellite view of Joteghanashyam roost-site (22°31210.03N, 87°50219.23E) of *Pteropus medius*.

❒ Leader-Bat Activity:

Leader-bats were identified and their activity monitored across all key roost trees. Observations were conducted using binoculars and time-logging tools during the evening hours. The timing of their emergence was recorded in relation to local sunset times, and their movement patterns were tracked to determine their role in colony behaviour.

Data Analysis

All statistical analyses were performed using GraphPad Prism version 8 (GraphPad Software, 2023). A one-way ANOVA was conducted to assess the influence of environmental factors on *Pteropus medius* roost-site selection, with roost preference scores as the dependent variable. Independent variables included tree species, proximity to water bodies, and canopy cover. Tukey's HSD post-hoc test was applied to identify significant group

differences ($p < 0.001$). The normality and homogeneity of variance were tested using the Shapiro-Wilk and Levene's tests, respectively, to validate the ANOVA model.

Results

Leader-bat activity typically commenced shortly after sunset, with a mean emergence time of 18.31 ± 0.67 minutes post-sunset ($P = 0.009228$). Their observed movements between roosts and during evening departures indicated a central role in coordinating foraging activities and regulating intra-colony dynamics within the colony

ANOVA Results

A one-way ANOVA was conducted to compare bat population sizes between primary (*Albizia lebbeck*) and secondary roost trees over the 15-year observation period (2008–2022). The results showed a statistically significant difference in bat counts between roost types:

$F(1, 28) = 1878.87$,

$p < 0.001$

This indicates that the number of bats using the primary roost was significantly higher than those using secondary roosts **(Fig. 1)**.

Post-hoc Analysis (Tukey's HSD)

Tukey's HSD post-hoc test further confirmed that the difference in bat counts between the primary and secondary roosts was highly significant ($p < 0.001$), supporting the ANOVA findings (**Figs. 1 & 2**).

Roost Site Selection and Adaptation

The colony at Joteghanashyam has shown clear evidence of adapting to the increasing population size by using a variety of secondary roosting trees. Initially, all bats roosted in the large *Albizia lebbeck* tree, but over the years, some individuals began to roost in nearby trees, particularly the *Terminalia arjuna* and *Mangifera indica*.

- **Primary Roost Tree (Fig. 3)**: The *Albizia lebbeck* remained the main roosting site for the majority of the bats, hosting about 800 individuals.
- **Secondary Roosts (Table 2)**: Bats were seen to roost in *Terminalia arjuna*, *Bombax ceiba*, and *Borassus flabellifer*, with the latter trees supporting fewer bats due to their smaller size.

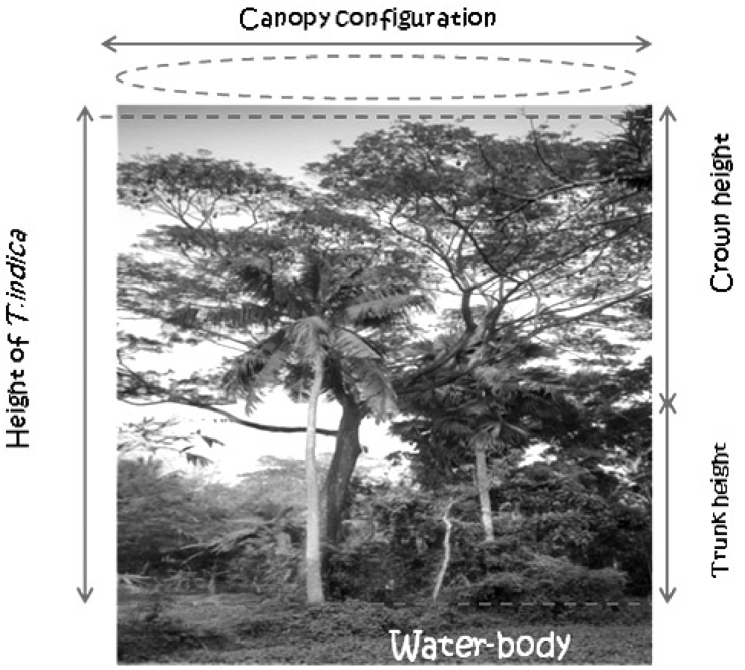

Fig.3:*Albizialebbeck* Roost-Treebeside the Daspur II Roadat Joteghanashyam.

Leader-Bat Movement (Table 1):

Leader-bats of *Pteropus medius* were observed performing structured aerial movements between the primary and secondary roosting trees, play-

ing a vital role in maintaining **social cohesion** across the dispersed colony. These movements ensured that individuals roosting in secondary sites remained integrated into the colony's collective behavior, particularly during foraging departures. Such coordination was especially critical during periods of food scarcity, when organized group activity improved foraging success.

A total of 111 observations (N = 111) were categorized based on the pattern and extent of leader-bat patrols:

- F (Full Rounding): This behavior occurred over duration of 11 seconds, during which leader-bats completed full circular flights over the canopy of individual roost trees. The number of leader bats involved ranged from 4 to 12.
- H (Half Rounding): This behavior was observed to occur over duration of 6 seconds, during which leader-bats performed partial or half-circle patrols over the canopy of a single roost tree. The number of leader bats involved ranged from 2 to 8.
- T (Total Rounding):The most frequently observed behavior, recorded across 111 instances, involved comprehensive patrols over the entire colony—covering both the primary and all secondary roost trees. This behavior, classified as Total Rounding (T), was completed in an average duration of 67 seconds. These patrols typically involved 1 to 5 leader bats.

These coordinated movement patterns highlight the organizational role of leader-bats in maintaining colony unity and facilitating synchronized group foraging. The variation in the number of leader bats participating in different types of rounding suggests a flexible, context-dependent leadership dynamic that enhances the adaptability of the colony as it expands across multiple roost sites.

A.lebbeck			
Rounding Type	**Time (S)**	**N**	**Range**
F	**11**	**111**	**4-12 (7.162±0.173)**
H	**6**	**111**	**2-8 (4.810±0.146)**
T	**67**	**111**	**1-5 (1.774±0.085)**

Table 1. Classification of Leader-Bat Rounding Behaviours Observed over Roost Trees in *Pteropus medius* Colony at Joteghanashyam

Social Cohesion and Foraging Coordination

Despite the increased number of roosting trees, the colony maintained a high degree of social interaction, with bats in different trees frequently engaging in interactions (Kunz and Lumsden, 2003). The leader-bats were seen regularly moving between roosts, especially during the dusk foraging period, to ensure that all members participated in the collective foraging activities (Mallick and Raut, 2022).

Impact of Colony Size on Roosting Behaviour (Table 2 and Fig. 1)

As the colony expanded, a majority of individuals continued to occupy the primary roost (*Albizia lebbeck*), while others gradually dispersed to nearby secondary roosts, indicating a flexible roosting strategy influenced by space availability and tree characteristics.

Roost Type	**Tree Species (Scientific Name)**	**Common Name**	**Colony Size of *Pteropus medius***
Primary Roost	*Albizia lebbeck*	Siris Tree	800
Secondary Roost	*Terminalia arjuna*	Arjun Tree	150
Secondary Roost	*Mangifera indica*	Mango Tree	100
Secondary Roost	*Bombax ceiba*	Silk Cotton Tree	70
Secondary Roost	*Borassus flabellifer*	Palmyra Palm	50

Table 2. Colony distribution of *Pteropus medius* across different tree species, reflecting adaptation to secondary roosting sites in response to increasing colony size.

Annual monitoring of *Pteropus medius* from 2008 to 2022 revealed a consistently higher number of individuals occupying the primary roost tree, *Albizia lebbeck*, compared to nearby secondary roost trees. However, a gradual increase in the number of bats utilizing secondary roosts was observed over the years. This trend indicates a spatial expansion of the colony, likely driven by increasing population density and roosting pressure at the primary site. The data suggest adaptive roost-site diversification in response to ecological constraints (**Figs. 1& 2**).

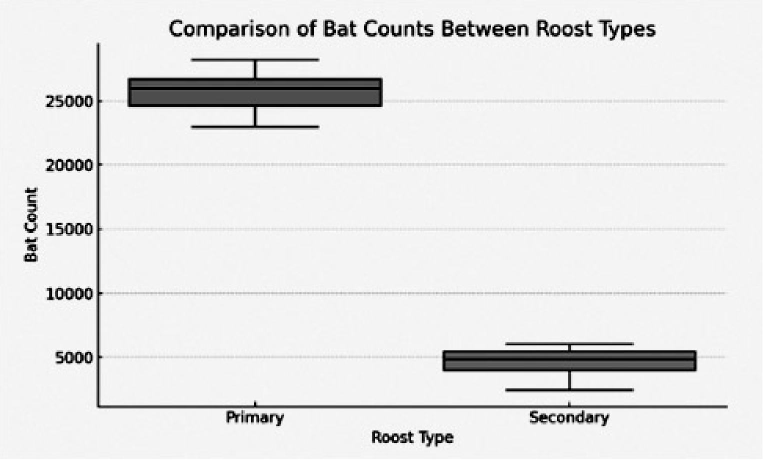

Fig. 1: Comparison of *Pteropus mediuscounts between primary and secondary roost type* [F (1, 28) = 1878.87, p < 0.001] *at Joteghanashyam roost-site.*

Graph: Bat Counts by Roost Type

The boxplot below illustrates the distribution of bat counts across the two roost types:

- The primary roost consistently supported larger colony sizes.
- The secondary roosts showed lower but gradually increasing bat numbers.

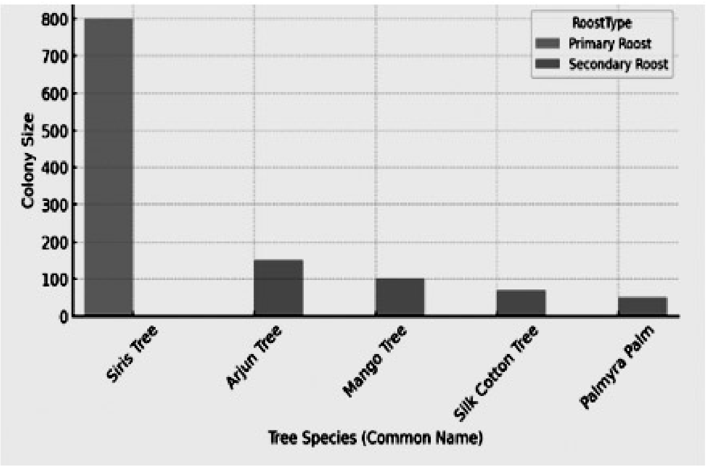

Fig. 2: Colony size by *Pteropus medius* across tree species [F (1, 3) = 211.69, p = 0.0007].

As the population increased, the bats exhibited increased mobility between roosts. Bats using secondary trees were often seen flying back to the main roosting tree for social interactions or foraging activities (Sewall and Wilkinson, 1998).

Discussion

The present study provides significant insights into the behavioral adaptability of *Pteropus medius* in response to increasing colony size and environmental constraints (**Fig 4**). The shift from exclusive use of a single primary roost tree (*Albizia lebbeck*) to the incorporation of multiple secondary trees (e.g., *Terminalia arjuna*, *Mangifera indica*, *Bombax ceiba*, and *Borassus flabellifer*) demonstrates a high degree of ecological plasticity. Such adaptive roost-site selection reflects the species' capacity to

a) Arjun tree b)Palmya Palm tree

Fig. 4: *Pteropus medius* individuals roosting in secondary roost trees, illustrating colony expansion beyond the primary roost. The image captures bats occupying species such as *Terminalia arjuna* (a) and *Borassus flabellifer* (b), reflecting adaptive spatial use in response to increased colony size and environmental constraints.

respond effectively to space limitations and environmental pressures (Hughes *et al*., 2012), a trait critical for the persistence of large colonies in dynamic landscapes (Dietz *et al*., 2009).

A key finding of this study is the pivotal role played by leader-bats in maintaining colony cohesion. These individuals were observed to patrol between primary and secondary roost sites, ensuring group synchronization during dusk foraging activities. This behavior not only facilitates the inclusion of bats from dispersed roosts but also reduces intra-colony competition by coordinating foraging departures and minimizing resource overlap (Mallick *et al*., 2021a). The average rounding times and number of leader-bats involved in these patrols suggest a deliberate and structured social mechanism aimed at preserving collective efficiency and harmony within the colony (Mickleburgh *et al*., 2002; Lamb *et al*., 2008).

Furthermore, such coordinated movements likely serve conflict-miti-

gating functions, as synchronized activity reduces the chance of aggressive encounters and promotes equitable access to foraging grounds (Thabah*et al*., 2006). This aligns with previous research highlighting the role of social leadership and communication in large-bodied bat species for efficient resource utilization (Mallick *et al*., 2021a).

Overall, the findings underscore the importance of social organization and behavioral flexibility in the ecological success of*P. medius* (Mallick and Raut, 2023). In the face of growing colony size and spatial limitations, the ability to maintain social structure—primarily through the actions of leader-bats-proves essential for group survival. By fostering inclusive foraging and organized roosting dynamics, these bats demonstrate how social behavior can buffer environmental stress, ensuring the stability and long-term viability of the colony (Rahman *et al*., 2013;Wang and Cowled, 2015).

Conservation Implications

These findings hold critical implications for the conservation of*P. medius*, especially in increasingly fragmented and urbanizing environments. The ability to use secondary and even suboptimal roost sites suggests that conservation strategies must go beyond protecting traditional large roost trees. Instead, a landscape-level approach that preserves a mosaic of potential roost trees, canopy connectivity, and minimal disturbance zones is essential for maintaining colony cohesion and function.

The role of leader-bats in coordinating movement also underscores the importance of protecting social structure, not just individual animals. Disruption of these key individuals through habitat destruction or disturbance may have disproportionate effects on colony integrity and foraging success.

Comparative Perspective

Similar behavioral flexibility has been observed in Southeast Asian spe-

cies like *Pteropus vampyrus*, which also shift among roost sites in response to environmental pressures and human disturbance (Robinson *et al*., 2021). In African contexts, *Eidolon helvum* shows parallel patterns of seasonal migration and urban roosting, often facilitated by social coordination and adaptability to anthropogenic habitats (Ossa *et al*., 2012). These comparisons highlight the evolutionary advantage of social plasticity among large fruit bats and reinforce the need for region-specific yet behaviorally informed conservation frameworks.

Conclusion

This long-term study of *Pteropus medius* at Joteghanashyam offers compelling evidence of the species' behavioral adaptability and the critical role of social organization in supporting colony resilience (Epstein *et al*., 2009). As the colony expanded over a 15-year period, the bats displayed remarkable flexibility in roost-site selection, transitioning from a single large roosting tree to a network of secondary sites without compromising social cohesion. This shift highlights their ability to navigate ecological pressures such as habitat limitation while maintaining group structure and function.

The observed activities of leader-bats-particularly their structured rounding behaviors across primary and secondary roosts- underscore their importance in coordinating colony movement, synchronizing foraging behavior, and minimizing intra-colony conflict. These leader-driven interactions were instrumental in maintaining a unified colony dynamic, despite spatial dispersion.

Ultimately, the findings demonstrate that *P. medius* relies not only on ecological resources but also on complex social mechanisms to thrive (Jones *et al*., 2009). The interplay between environmental adaptation and social leadership enables the species to effectively manage space, reduce competition, and ensure equitable access to shared resources. This study contributes valuable insight into the roosting ecology and collective be-

havior of megabats and underscores the importance of conserving both the physical habitat and the social structure of bat colonies in increasingly fragmented landscapes (Fleming and Eby, 2003 and Goswami *et al.*, 2015).

References

[1] Altringham, J. D. (2011). Bats: From Evolution to Conservation. Oxford University Press.

[2] Dietz, C., von Helversen, O., & Nill, D. (2009). Bats of Britain, Europe and Northwest Africa. A&C Black.

[3] Epstein, J. H., Field, H. E., Luby, S., Pulliam, J. R., &Daszak, P. (2009). Nipah virus: impact, origins, and causes of emergence. Current Infectious Disease Reports, 11(3), 255-260. https://doi.org/10.1007/s11908-009-0053-9

[4] Fleming, T. H., & Eby, P. (2003). Ecology of bat migration. In T. H. Kunz & M. B. Fenton (Eds.), Bat Ecology (pp. 156–208). University of Chicago Press.

[5] Goswami, V. R., Vasudev, D., & Sreekar, R. (2015). Roost-site selection and social behavior of *Pteropus giganteus* in fragmented landscapes. Mammalian Biology, 80(2), 119-125. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2015.01.002

[6] GraphPad Software. (2023). *GraphPad Prism* (Version 10.0.3) [Computer software]. GraphPad Software, LLC. https://www.graphpad.com

[7] Hughes, A. C., Roche, S., Tran, C., & Johnson, A. (2012). Roost selection and social behavior of *Pteropus* bats in Southeast Asia. Journal of Mammalogy, 93(4), 1045-1056. https://doi.org/10.1644/11-MAMM-A-385.1

[8] Jones, G, Jacobs, D. S., Kunz, T. H., Willig, M. R., & Racey, P. A. (2009). Carpe noctem: the importance of bats as bioindicators. Endangered Species Research, 8(1-2), 93-115. https://doi.org/10.3354/esr00182

[9] Kunz, T. H., & Lumsden, L. F. (2003). Ecology of cavity and foliage roosting bats. In T. H. Kunz & M. B. Fenton (Eds.), Bat Ecology (pp. 3-89). University of Chicago Press.

[10] Lamb, J., Windsor, D., & Wilkinson, G. S. (2008). Social organization and foraging in a large colony of *Pteropus giganteus*. Behavioural Ecology and Sociobiology, 62(7), 1201-1209. https://doi.org/10.1007/s00265-008-0551-3

[11] Mallick, S., & Raut, S. (2010, May). Effect of Aila storm on flying fox *Pteropus giganteus giganteus* (Brünnich). *Journal of the Bombay Natural History Society*, *107*(2), 167.

[12] Mallick, S., Hossain, A., & Raut, S. (2020). On certain devices of the flying fox, *Pteropus giganteus*, to overcome summer heat at Purulia, India. *Proceedings of the Zoological Society of India*, *19*(1), 1–7. http://anveshika.org/proceedings-of-the-zoological-society-of-india/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/1-JUNE-2020

[13] Mallick, S., Hossain, A., & Raut, S. (2021a). Predators of the bat *Pteropus giganteus* occurring in West Bengal, India. *International Journal of Recent Scientific Research*, *12*(6), 42138–42140. https://doi.org/10.24327/ijrsr.2021.1206.6035

[14] Mallick, S., Hossain, A., & Raut, S. (2021b). Roost-tier preference in roost-trees: A case study in the bats *Pteropus giganteus*. In *Chiroptera* (pp. 1–15). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.99450

[15] Mallick, S., Hossain, A., & Raut, S. (2022). On the significance of the bat's hanging posture. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, *9*(3), 34–39. http://www.ijrar.org/viewfull.php?&p_id=IJRAR22C2247

[16] Mallick, S., Hossain, A., & Raut, S. (2023). Roost-colony protection strategy from raiding by enemies in the Indian flying fox *Pteropus medius* (Temminck, 1825). *Discovery*, *59*, e118d1358.

[17] Mickleburgh, S. P., Hutson, A. M., & Racey, P. A. (2002). A review of the global conservation status of bats. Oryx, 36(1), 18-34. https://

doi.org/10.1017/S0030605302000026

[18] Rahman, S. A., Olival, K. J., &Daszak, P. (2013). *Pteropus medius* roosting ecology and Nipah virus risk in Bangladesh. EcoHealth, 10(1), 52-60. https://doi.org/10.1007/s10393-012-0797-0

[19] Sewall, B. J., & Wilkinson, G. S. (1998). Social calls coordinate foraging in the large-bodied fruit bat *Pteropus giganteus*. Animal Behaviour, 56(1), 1-10. https://doi.org/10.1006/anbe.1998.0730

[20] Thabah, A., Rossiter, S. J., Kingston, T., Zhang, S., Parsons, S., Mya, K. M., & Jones, G. (2006). Genetic divergence and phylogeography of *Pteropus vampyrus* in Southeast Asia. Molecular Ecology, 15(9), 2721-2733. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2006.02977.x

[21] Wang, L. F., & Cowled, C. (2015). Bats and viruses: a new frontier of emerging infectious diseases. Wiley-Blackwell.

[22] Mlíkovský, J. (2012). Correct name for the Indian flying fox (Pteropodidae). *Vespertilio*, 16: 203–204.

[23] Elangovan, V., Marimuthu, G., & Kunz, T. H. (2023). Roost selection and thermoregulatory behaviour of the Indian flying fox *Pteropus medius*. Journal of Bat Ecology, 15(1), 45–54.

[24] Robinson, M. F., Racey, P. A., & Hutson, A. M. (2021). Roosting ecology and conservation of Old World fruit bats in Southeast Asia. Acta Chiropterologica, 23(2), 387–403. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2021.23.2.011

[25] Ossa, G., Kramer-Schadt, S., & Schaub, M. (2012). Home range size and resource use of the Indian flying fox (*Pteropus giganteus*) in urban and rural areas in India. Mammalian Biology, 77(5), 384–390. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2012.04.001

A Brief Review of Photochromic Spiropyrans and Spirooxazines and Fulgides and Their Applications

Susovan Mandal*

Abstract: When two species undergo reversible colour changes caused by light, this is referred to as photochromism. Controlling the characteristics of molecules that respond to external stimuli like as H^+, voltage, light, etc. by making minor structural adjustments is an interesting aspect. The properties of photochromic materials are generally strongly affected by the steric and electronic effects. In particular, research into the development, production, and testing of organic photochromic materials—which find usage in self-developing cameras, eye-protective laser goggles, high-tech display systems, and other applications—is still ongoing. This brief study here reveals synthesis and the photochromic properties of spiropyrans and spirooxazines and fulgides and their applications.

Key words: Photochromism, Spiropyrans, Spirooxazines, Fulgides.

Introduction

Nature has given plants and animals the amazing ability to see colour, which is governed by the essential responsibility of having a keen sense of light.[1] One Human and animal vision mechanisms, as well as photo-

* Department of Chemistry, Jhargram Raj College, Jhargram.
e-mail: susovanm6@gmail.com

reversible processes in plants, further regulate how these colours are perceived. A stunning class of "chameleon molecules" has been created by nature with its amazing skill; these molecules change colour in response to a variety of external stimuli. Modern study and development of photochromic materials is a flurry of activity, especially because of the photo-triggered colour change of several organic compounds. In terms of material chemistry, organic photochromic substances are distinguished by their unique luminosity. Photochromic compounds are characterized by reversible photoinduced interconversion of a chemical species between two or more of its isomeric forms, which must exhibit distinct optical properties. The phenomenon of photochromism[2] may manifest in distinct chemical as well as physical characteristics, e.g., refractive index, dipole moment, absorption property, etc. Indeed, the photochromic compounds exhibit fantastic applications in real life.[2,3]

Photochromism of Spiropyrans and Spirooxazines

The photochromic reactions of spiropyrans were first discovered by Fischer and Hirshberg. The photochromism of spiropyrans and spirooxazines occurs via photoinduced C-O bond cleavage,[4,5] cf. Scheme 1. In general, the closed spiro-forms (**SP**) are colorless and the open merocyanine-forms (**ME**) exhibit color.[6]

The generally employed protocol for the synthesis of spiropyran and spirooxazine is shown in Scheme 2.

Spiropyrans and spirooxazines are marked by high values of quantum efficiencies for forward and backward reactions, ease of coloration and very high two-photon absorption cross-sections. These factors confer them with extraordinary usage in ophthalmic lenses.[2c,3a]

Spiropyrans are suitable candidates for design elements in molecular switches for application in signal communication. Raymo et al. demon-

Scheme 1

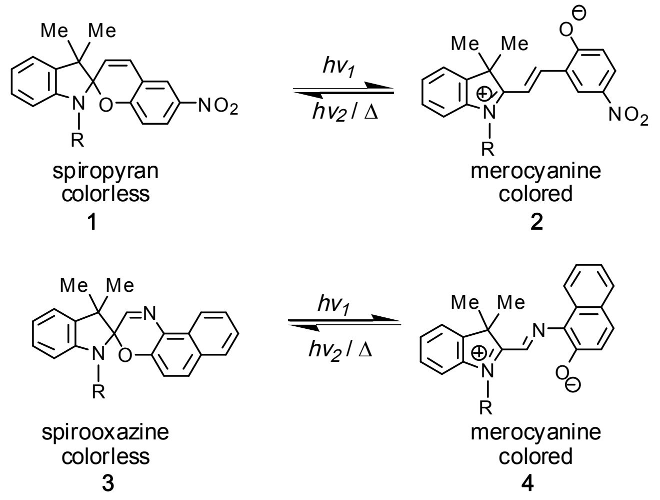

Scheme 2

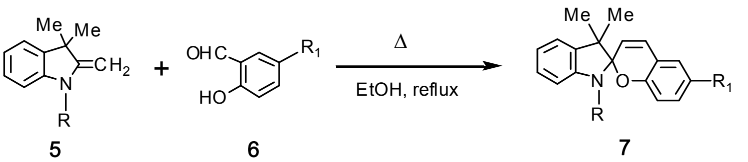

strated an exciting three-state molecular switch based on spiropyran.[7a] The system can communicate in an intermolecular fashion with another fluorescent probe, e.g., pyrene, cf. Figure 1. The closed spiro-form (**SP**) does not absorb beyond 400 nm, whereas the colored merocyanines (**ME** and **MEH**) absorb in the visible region, where the pyrene emits such that there is a drop in the pyrene fluorescence. When the solution is irradiated with visible light, **ME** and **MEH** forms revert to **SP** and the fluorescence intensity restores to its original value.

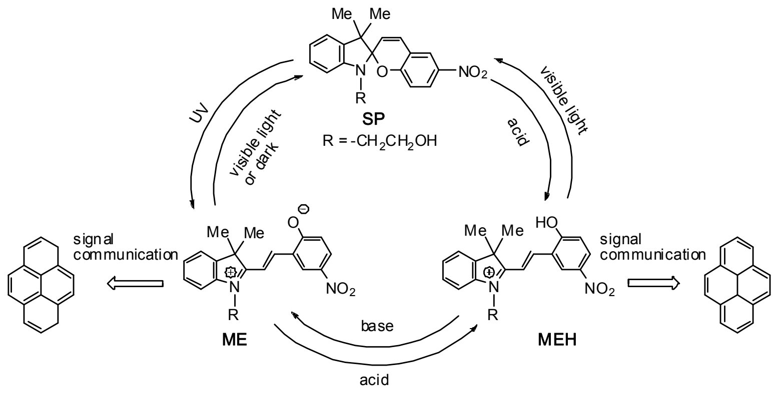

Figure 1. Signal communication between the photochromic spiropyran unit and pyrene.

Spiropyrans have played a pivotal role in the emergence of the field of photochromism following their discovery in the early 20th century, with almost ubiquitous use in materials applications especially since their photochromism was discovered in 1952.[7b]

Spiropyrans and spirooxazines have also been exploited to a large extent in various application-based materials such as photo-controlled magnetization, photodynamic sensors of metal ions, photo-responsive polymer sand liquid crystalline materials.[4,5]

Inspite of a number of efficient approaches to the improvement of the thermal durability of ring-opened merocyanine forms, spiropyrans and spirooxazines are associated with a major disadvantage of low energy barrier for thermal reversion of the merocyanines. This drawback continues to curtail their application toward long term storage of light-written information. Recently Zhongtao, et. al. reported solid-state photochromic spiropyrans very much dependent on the incorporation of bulky rigid

groups for creating the needed free space. Here a new strategy were developed for designing solid-state spiropyrans showing extremely competent reversible photochromism at room temperature *via* increasing the molecular flexibility, by attaching a flanking alkyl chain to the indole nitrogen. Moreover, this kind of spiropyran could be practically "evolved" into a new solid state showing advanced photochromic and thermochromic properties with three different colors.[7c] Minkovska et al. explored that the stable and efficient photochromic and photoswitchable molecular systems designed from spirooxazines are of increasing scientific and practical interest because of their potent applications in technologies.[7d] The chelating spironaphthoxazines have gained extensive attention due to their efficient optical response after complexation with some metal ions having biomedical application and environmental significance, as well as their good recycling properties and high reliability, especially by metal ion sensing.

Photochromism of Fulgides

Fulgides–the famous thermally irreversible photochromic molecules–were first synthesized and characterized by Stobbe in the early twentieth century. Anhydrides of the derivatives of 1,3-butadiene-2,3-dicarboxylic acids, e.g., **8**, are generally called fulgides.[8a] In Scheme 3 are shown the traditionally employed protocols for the synthesis of fulgides.

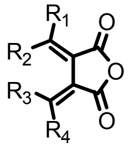

8

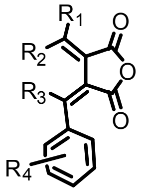

9

Scheme 3

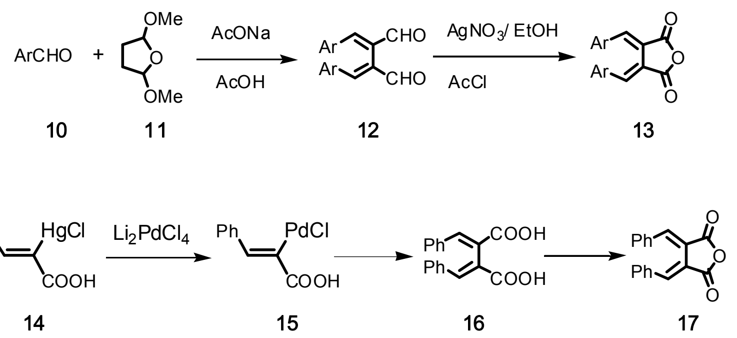

For photochromism to be observed, the fulgide must contain at least one aromatic unit on the exo-methylene carbon atom to make up a 1,3,5-hexatriene system, which may undergo a 6p-electrocyclic ring closure reversibly, cf. Scheme 4.

Scheme 4

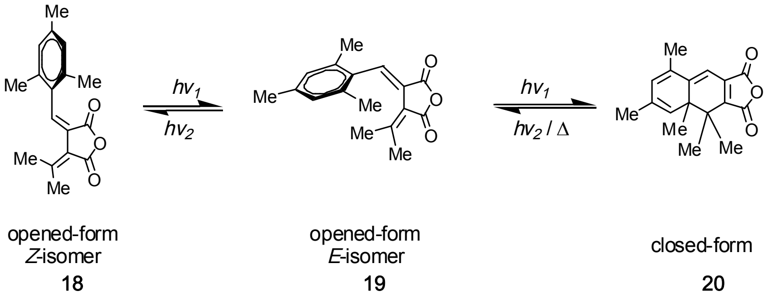

Yokoyama et al. showed that quantum yield for the ring closure upon UV irradiation becomes larger and that for the E to Z isomerization becomes smaller in the presence of large alkyl groups.[9]

Photochromism of fulgides generally occurs between colorless open-forms and yellow-to-green closed-isomers. The absorption due to the colored species is attributed to p- p* transition. That is the reason why an electron-donating group attached to the aryl ring of fulgides induces bathochromic shift in the absorption maximum for the closed-form.

Fulgides have been exploited to a great extent for generating nondestructive readout of fluorescence. Yokoyama et al.[8a] found that the fluorescence property can be switched during the photochromism of fulgide **21**, cf. Scheme 5.

A number of fulgides show photochromism when embedded in the polymeric matrix (PMMA film) or in the solid crystalline state. This property has been widely exploited for the development of ophthalmic lenses.

Scheme 5

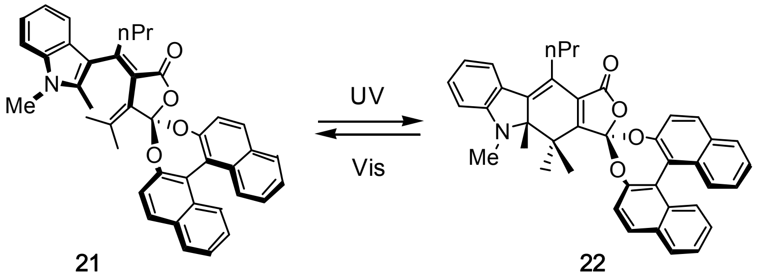

21
non-fluorescent

22
fluorescent

Sarma et al. investigated the electronic structure theory calculations using the density functional theory and wave function methods, as well as surface hopping simulation to examine the photochemical behavior of an experimentally synthesized fulgide molecule, (E)-*p*-methylacetophenylisopropylidenesuccinic anhydride.[8b]

Applications of Photochromic Materials

Ever since their discovery, organic photochromic compounds have been exploited to a great extent for the development of functional materials. Today, photochromic phenomenon is exploited in a myriad of applications. The general applications of photochromic compounds can largely be divided into two categories based on the changes in the properties that accompany the phenomenon of photochromism:

i) change in the absorption or emission properties

ii) change in physical or chemical properties such as refractive index, dielectric constant, electric conductivity, phase transitions, solubility, viscosity, and surface wettability, etc.

Some applications of the photochromic materials are as follows.

i) Eyewear Technology

One of the principal uses of photochromic materials is in the development of eyewear technology. Preparation of commercially acceptable UV-protecting goggles necessitates high photocoloration, reasonable bleaching rate, thermal stability and good lifetimes. Spironaphthoxazines and related photochromic compounds are known for their application in ophthalmic lenses for a long time. Efficient strategies for modulating the spectrokinetic behavior have always been a hot pursuit in the contemporary research in ophthalmic lenses.[3a] Recent developments in the field focus on partial neutralization of activated color, enhanced photochromic activity, fatigue resistance and photostability. The spirocyclic compounds have been exploited as eminent candidates to achieve color neutrality after photochromic activation.[10]

ii) Photoresponsive Materials

Light-induced reversible changes of physical and chemical properties can be achieved simply by attaching a photochromic moiety to a chemical system.[11] For example, Das et al. reported a variety of butadiene-based

photoresponsive soft materials, cf. Scheme 3. The photoisomerization of the donor-acceptor-substituted butadiene derivatives was utilized for the development of photoresponsive materials based on liquid crystals.[11c]

Scheme 3

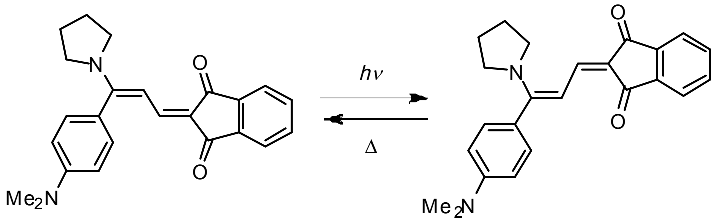

iii) Chiroptical Materials

Photochromism of photochromic units (chromenes, azobenzenes, spiropyrans, etc.) in poly (α-amino acid)s may trigger a random coil to α-helix transition. This primary photochemical event occurring in the side chains may be amplified and transduced by structural variations in the macromolecular main chain. The latter are accompanied by large and reversible variations of optical activity. Because of their reversibility, these systems are excellent choices for applications in chiroptical materials.[12]

iv) Three-Dimensional Optical Memory Storage Devices

A vast number of photochromic systems such as spiropyrans, spirooxazines, fulgimides, etc. have been explored for the development in 3-dimensional optical data storage. In a typical case, nondestructive read-out of memory is achieved by writing, reading and erasing of the optical information.[13]

v) Optical Power-Limiting Substances

Photochromic compounds are of paramount importance for usage in optical substances that are mainly used to protect the human eyes or optical sensors from the damaging effects of intense flashes of light. These types

of materials are called as optical power-limiting substances.[14] Some of the important photochromic molecules employed in optical power limiting substances are shown below.

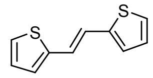

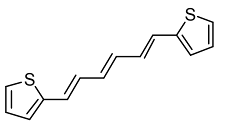

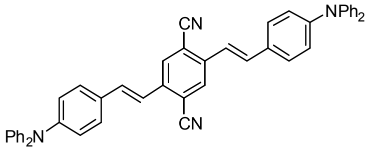

vi) Smart Optics

There is a great opportunity for utilizing photochromism as a guiding factor in developing key tools in optical instruments and devices.[15] The reversible light-induced switching of absorption and refractive index can be exploited to a great extent for the advancement of re-writable optical elements. The latter find applications in focal plane masks, computer generated holograms, optical nanopatterning, etc. Some of the photochromic molecules are shown below.

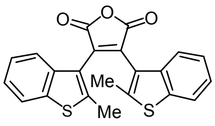

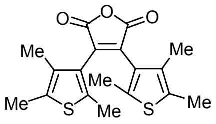

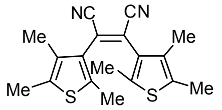

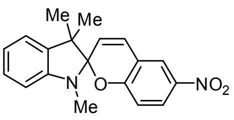

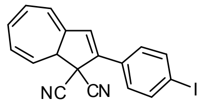

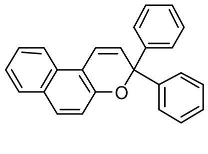

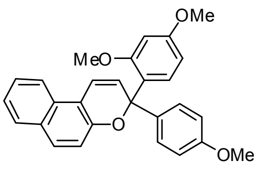

Scope of Present Investigations

It is amply evident from the brief literature survey presented in the foregoing sections that photochromic systems are appealing from the point of view of applications in a variety of domains. Insofar as chromenes as photochromic materials are concerned, their utility so far has been limited to application in ophthalmic lenses. The photogenerated colored *o*-quinonoid intermediates revert rapidly. The focus of investigations described in this Thesis centers on exploring how *stereoelectronic effects* influence the photochromic behavior of ingeniously designed molecular systems. It emerges from comprehensive investigations that electronic and steric effects can be diligently exploited in rationally-designed molecular systems to demonstrate modulation of photochromism for application in ophthalmic lenses as well as in data storage. Whereas the unusual electronic effects (toroidal conjugation, through-space polar/ð interaction and phane effects) are shown to increase/decrease the lifetimes of the colored *o*-quinonoid intermediates, sterics inherent to helicity are exploited to stabilize the intermediates to the extent that they can be isolated and their structures determined by X-ray crystallography. This terrific control of the phenomenon of photochromism demonstrated via stereoelectronic effects, we believe, may pave way for the development of new and novel materials with heretofore unprecedented properties and applications.

References

1. http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/category/evolution/eye-evolution/
2. (a) Bertelson, R. C. In *Photochromism*; Brown, G. H., Ed.; Wiley: New York, **1971**; Chapter 10 and references therein. (b) *Photochromism: Molecules and Systems*; Durr, H., Bouas-Laurent, H., Eds.; Elsevier: Amsterdam, **1990**. (c) *Organic Photochromic and Thermochromic Compounds*; Crano, J. C., Guglielmetti, R. J., Eds.; PlenumPress: New

York, **1999**; Vols. 1 and 2.

3. (a) Crano, J. C.; Flood, T.; Knowles, D.; Kumar, A.; Gemert, B. V. *Pure Appl. Chem.* **1996**, *68*, 1395. (b) Bertarelli, C.; Bianco, A.; Castagna, R.; Pariani, G. *J. Photochem. Photobiol. C.* **2011**, *12*, 106. (c) Bruder, F. K.; Hagen, R.; Rolle, T.; Weiser, M. S.; Facke, T. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, *50*, 4552.
4. (a) Bertelson, R. C. In *Photochromism*; Brown, G. H., Ed.; Wiley: New York, 1971; Chapter 3. (b) Guglielmetti, R. In *Photochromism: Molecules and Systems*; Durr, H., Bouas-Laurent, H., Eds.; Elsevier: Amsterdam, 1990; Chapter 8. (c) Berkovic, G.; Krongauz, V.; Weiss, V. *Chem. Rev.* **2000**, *100,* 1741.
5. (a) Chu, N. Y. C. In *Photochromism: Molecules and Systems*; Durr, H., Bouas-Laurent, H., Eds.; Elsevier: Amsterdam, 1990; Chapter 10. (b) Kang, T. J.; Chang, S. H.; Kim, D. J. *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **1996**, *278*, 181.
6. (a) Salvador, M. A.; Coelho, P. J.; Burrows, H.D.; Oliveira, M. M.; Carvalho, L. M. *Helv. Chim. Acta* **2004**, *87,* 1400. (b) Coelho, P. J.; Salvador, M. A.; Oliveira, M. M.; Carvalho, L. M. *Tetrahedron* **2004,** *60,* 2593.
7. (a) Raymo, F. M.; Giordani, S. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 1833. (b) Kortekaas, L.; Browne, W. R. *Chem. Soc. Rev.*, **2019**, ***48***, 3406. (c) Zhang, L.; Deng, Y; Tang, Y; Xie, C; Wu, Z. *Mater. Chem. Front.*, **2021**, *5*, 3119. (d) Minkovska, S.; Hadjichristov, G. B.; Neacsu, A.; Chihaia, V.; Fedorov, Y. V. *ACS Omega*, **2024**, *9*, 4144.
8. (a) Yokoyama, Y. *Chem. Rev.* **2000**, *100,* 1717. (b) Medhi, B.; Nath, U.; Sarma, M. *J. Chem. Phys.* **2024**, *160*, 154308.
9. Yokoyama, Y.; Goto, T.; Inoue, T.; Yokoyama, M.; Kurita, Y. *Chem. Lett.* **1988**, 1049.
10. Song, L.; Yang, Y.; Zhang, Q.; Tian, H.; Zhu, W. *J. Phys. Chem. B.* **2011**, *115*, 14648.

11. (a) Fissi, A.; Pieroni, O.; Ruggeri, G.; Ciardelli, F. *Macromol.* **199**5, *28*, 302 and references therein. (b) Irie. M. In *Adv. Polym. Sci.*; Fujita, H., Ed.; Springer: Berlin, **1990**; pp. 27. (c) Das, S.; Varghese, S.; Kumar, N. S. S. *Langmuir* **2010**, *26*, 1598.
12. Feringa, B. L.; van Delden, R. A.; Koumura, N.; Geertsema, E. M. *Chem. Rev*. **2000**, *100*, 1789.
13. Dvornikov, A. S.; Walker, E. P.; Rentzepis, P. M.*J. Phys. Chem. A* **2009***, 113*, 13633.
14. (a) *Non Linear Optics of Organic Molecules and Polymers*, Nalwa, H. S.; Miyata, S. (Eds.), CRC Press, Boca Raton, FL (1997). (b) Spangler, C. W. *J. Mater. Chem. 1999*, *9*, 2013.
15. Lecomte, S.; Gubler, U.; Jager, M.; Bosshard, C.; Montemezzani, G., Gunter, P.; Gobbi, L.; Diederich, F. *Appl. Phys. Lett.***2000**, *77*, 921.

A Review on SIR Modelling of Infectious Diseases

Soumendra Nath Ruz*

Abstract: Modelling of infectious disease is an importantissue. Recent progress in data science has given opportunity to the researchers to prepare a model of any infectious disease which can mimic the actual situation. To achieve this, one needs sound mathematical knowledge as well as computational skill to analyze myriads of data to correctly comprehend, predict, and manage the spread of the diseases. Researchers build a model based on primary characteristics of the disease. This modelsimulates how diseases spread through populations, allowing researchers and public health officials to evaluate various types of possible interventions and assess the potential impact of outbreaks. This helps them to take suitable decision to handle the actual situation. Here I shall review modelling infectious disease using "Susceptible-Infectious-Recovered (SIR)" model, which is the simplest and most used model in analyzing an epidemic situation primarily.

Introduction

Modelling of an infectious disease is really a challenging work. Many

* Department of Physics, Ramananda Centenary college, Lalpur, Purulia.
e-mail: ruzfromju@gmail.com

factors affect spreading of such disease. It is very difficult to incorporate all such factors in corresponding mathematical model of that disease in a suitable way. Again, spreading nature of an infectious disease also depends upon behavioral nature of mankind, social atmosphere of the region of epidemic outbreak, atmosphere and many such aspects which are hard to describe by a mathematical formulation. However, like many other cases of behavioral science, it can be handled using statistics.

In most of the cases of socio-economic issues and behavioral studies, although it is very difficult to find a particular rule for outcome of an individual entity on a certain situation, there exists some patters in the outcomes if number of people/casesare very large. Following the same, in case of an infectious disease, a particular pattern may be found in its spreading nature if we consider a large number of cases. This implies that, to build an effective model of an infectious disease, one has to considervarious parameters which depicts interrelations among the variables of the model. The value of these parameters estimated from the data related with the spreading of that disease. So, the estimation is more perfect if one can analyze lots of data in an efficient manner.

Infectious diseases have caused fatal consequences to human civilization from the beginning. People tried to explain its spreading nature from the advent of modern science. Ronald Ross, who got noble prize in medicine for work on transmission of Malaria in 1902, first tried to make a scientific model on spreading of an infectious disease[1]. Later, W.O. Kermack and A.G. McKendrick developed his thoughts to make a model of epidemic [2,3, 4, 5]. The main problem of modelling epidemic,at that time, was of availability of appropriate data and handling them. As computers were not available, one has to handle data manually. Modelling of epidemics gained acceleration only availability of sufficient data and advent of modern techniques in statistical computing, i.e., data science. More and more people involved in this field with time. As a result,various realistic

epidemic models were invented [6, 7, 8, 9, 10, 11]. As time passed, each country began to disclose the data related with various infectious diseases [12,13,14,15,16,17]. At present, myriads of data of infectious diseases of most of the countries are available online. In the meantime, computational techniques to handle large data with the help of computers had improved a lot. This branch of science is known as data science.

Thus, with plenty of available raw data and rich knowledge of data science, researchers involved to upgrade the existing models of epidemic, as well as inventing new models, and finding various other aspects of epidemics. Someone tried to observe how spreading depends on season and other demographical factors [18, 19, 20], some studied spreading effect of a disease on people with varying age and size [21,22,23], others concentrated on effect of nature in immune boosting and success of vaccination in long run[24,25]. People also tried to observe how spreading nature of an infectious disease is affected by vaccination [26, 27,28], some also tried to model sexually transmitted disease [29].

There exist many types of theoretical models in the literature to describe spreading nature of an infectious disease. Susceptible-Infective-Recovered or SIR is the simplest mathematical model among them. In this case, the population of a particular region, where the disease has been spread, is categorized into susceptible (S), infective (I) and immune or recovered (R) individuals. For this reason, its name is SIR model. People has used this model to understand the spreading pattern and future trends of a disease in many parts of the world for many years [30,31,32,33,34]. However, with time and with the development of data science to fit this model more realistic people has incorporated many modifications to the simplest theory [35, 36]. Now let us discuss mathematics of SIR model in the following section.

Mathematics of SIR Modelling

I have already discussed that name of SIR model comes from its three main

variables, i.e., susceptible, infectious and recovered. According to SIR model, all the people of certain a region, where an epidemic has spread, are divided into the following three groups,

1. $S(t)$, the number of susceptible individuals. Initially, $S\ (t = 0)\ = N$ (total population in the region).
2. $I(t)$, the number of the active carriers that can infect susceptible.
3. $R(t)$, the number of recovered or vaccinated or deceased individuals.

The second set of dependent variables represents the fraction of the total population(N) in each of the three categories, i.e., $s(t) = \frac{S(t)}{N}$, $i(t) = \frac{I(t)}{N}$ and $r(t) = \frac{R(t)}{N}$.

For simplestcase,one assumes total population is constant, ignoring births, death due to some other causes or normal reason and immigration from other places (as these are very negligible with respect to total population).

Thus,at any time,

$$S(t) + I(t) + R(t) = N \quad or \quad s(t) + i(t) + r(t) = 1$$
…………….(1)

Here, the only way an individual leaves the susceptible group is by becoming infected. In case of SIR model, it is assumed that $\frac{dS}{dt}$ i.e. rate of change in number of susceptible people, depends on:

a. The number already susceptible people, ,
b. The number of individuals already infected, ,
c. Amount of contact between susceptible and infected.

Let us concentrate the last one. Suppose that each infected individual has a fixed number) of contacts per day. In reality, it may be that not all these contacts are with susceptible individuals only. If we assume a

homogeneous mixing of the population, the fraction of these contacts that are with susceptible is . Thus, on average, each infected individual generates new infected individuals per day.One may also assume that a fixed fraction of the infected group will recover or die during any given day. For example, if the average duration of infection is threedays, then, on average, one-third of the currently infected population recover seach day. Strictly speaking, what we mean by "infected" is really "infectious," that is, capable of spreading the disease to a susceptible person. Thus, the three primary variables and of this model are interrelated among them by and . The value of these two parameters and will depend on the nature of the infectious disease and calculated by analysing available data of the disease.

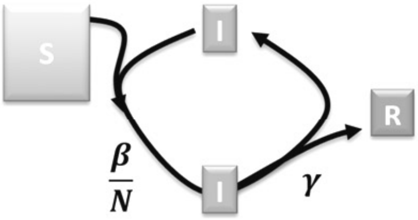

Fig 1: Schematic diagram of SIR model

Varying variables with time, following equation (1), one can get the following relation,

$$\frac{dS}{dt}+\frac{dI}{dt}+\frac{dR}{dt}=0=\frac{ds}{dt}+\frac{di}{dt}+\frac{dr}{dt} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$

From the above discussion, the basic equations which describe SIR model may be expressed as,

$$\frac{dS}{dt}=-\beta I(t)\times\frac{S(t)}{N} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

$$\frac{dI}{dt}=\beta I(t)\times\frac{S(t)}{N}-\gamma I(t) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ (4)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t) \; \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \; (5)$$

The above equations are used to numerically fit the disease spreading data.

Spreading of infection

In case of any infectious disease, it is very important to estimate the future trend of the disease. This is achieved from the knowledge of a parameter, named "Reproduction Number". It is defined as,

$$R_t = \frac{\beta(t)}{\gamma(t)} = Rate\ of\ Infection \times Average\ duration\ of\ Infection$$

……………….(6)

It is a dimensionless number.The basic reproduction number, is defined as the average number of secondary cases that would be generated by one primary infectious individual if one such individual is introduced into an all-susceptible population with initial parameter β_0 and γ_0 ,i.e., $R_0 = \frac{\beta_0}{\gamma_0}$ It provides an overall measure of transmission of an infectious disease within a given population. Reproduction number is function of the transmission coefficientof the disease (β) as well as the average duration of infectiousness. $\left(\frac{1}{\gamma}\right)$

For,, if $R_0 \geq 1$, number of infected people will increase with time and if $R_0 \geq 1$, number of infected people will decrease with time and the disease will die down. In case of an equilibrium situation, $R_t = R_0$. In this case no action is taken by the authorities. So, if $R_0 \geq 1$, some actions, such as, social distancing, detection, protection, quarantine, treatment etc. are taken by appropriate authorities. These actions affect the spreading nature of an infectious disease. So, and altered and in the process, also changes with time. For a diseaseto be in an endemic steady state or endemic equilibrium, it holds the following relation,

$R_0 \times S(t) = S_0$..........................(7)

In this way, the infection neither dies out nor does the number of infected peopleincrease exponentially, but the infection is said to be in an endemic steady state.

By dividing equation (3) by equation (5), separating the variables and integrating, one can arrive at the following expression,

$$S_t = S_0 e^{-\frac{R_t}{N}(R_t - R_0)} \quad \text{..................(8)}$$

The above expression depicts how number of susceptible changes with time. To get the same for number of infected people, one can rewrite equation (4) with the help of equation (6) as,

$$\frac{dI}{dt} = \left(R_t \frac{S(t)}{N} - 1\right)\gamma I = (R_e - 1)\,\gamma I, \text{ where } R_e = R_t \frac{S(t)}{N} \quad \text{..............(9)}$$

R_e is called "Effective reproduction number". Equation (9) clearly revels that if,

$R_e \geq 1$, grows exponentially,

$R_e \leq 1$, decays exponentially,

$R_e = 1$, Temporal plot of reaches a steady state.

Considering constant for aparticular period of time, integrating equation (9), we get

$$I_t = e^{\gamma t(R_e - 1)} \quad \text{................(10)}$$

With the help of equations (1), (8) and (10) one can estimate R_t. To simplifythe analysis, at the early stage of an epidemic outbreak,

$R_e \approx R_t\left(=\frac{\beta_t}{\gamma_t}\right)$ and. After that, we can assume $S(t) = (1 - p_R - p_V)N(t)$ where p_R is the fraction of the population that has been recovered/dead

(assumingpeople gain immunity after recovery) and is the fraction of non-infected people who are vaccinated. Therefore,

$$R_e(t) = (1 - p_R - p_V)R_t \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(11)$$

So, as time passes even β and γ remains the same, $R_e(t)$ reduces to ≤ 1 and the infection curve equation, (10) exponentially decay and flattens.

Data analysis following SIR model

Let us consider a particular epidemic has spread in a certain region at a certain time. One can estimate future trend of infected people using SIR model from equation (10). However, to do this, we have to know β and γ. I have already informed that these two parameters depend on nature of the infectious disease. They are estimated from analyzing the data available on that disease. Let us observe how this is done.

For first time people estimate the value of β and γ by guessing. Some simple guesses are, if the average period of recovery is of n_1 days, one would suggest $\gamma = \frac{1}{n_1}$. Again, if we guess that each infected would make a possibly infecting contact every n_2 days, then would be $\frac{1}{n_2}$. We emphasize that this is just a guess.

After this one has to plot temporal variation of number of infected people using equation (10). All necessary values necessary for the plot, such as total number of people, etc., are taken from the local data. At the same time temporal variation of number of infectious people are drawn from daily data available from the local governing authority/website. At this point, the plot obtained from equation (10) of SIR model is matched with 2- ndplot obtained from daily number of infectious people obtained from local authority. Is they differing a lot, value of β and γ are adjusted so that these two plot matches exactly with one another.

At this point one can demand that his model of infectious disease based on SIR theory can exactly mimic the actual disease. In the process,

the future trend of this disease can also be estimated from the model.

Conclusion

Mathematical modelling of infectious diseases is an important tool for understanding disease dynamics, predicting future trends, and evaluating control measures. These models help us easily analyse how an infectious disease spread. They also estimate the impact of various interventions. This makes the job of policy makers easywhile taking any public health decision. Not only that, it enables transparency and accuracy regarding the epidemiological assumptions. Infectious models are based on the current understanding of the natural history of infection and immunity. Thus, an important role of modelling enterprises is that they can alert us to the deficiencies in our current understanding of the epidemiology of various infectious diseases, and suggest crucial questions for investigation and data that need to be collected. Therefore, when models fail to predict, this failure can provide us with important clues for further research.

References

1. R Ross and Hudson,An application of the theory of probabilities to the study of a priori pathometry (Part II), Roy. Soc. Proc, vol. 92 and 93 (1915-17).
2. WO Kermack and AG McKendrick. A contribution to the mathematical theory of epidemics, Proc. Roy. Soc. A 115, 700(1927).
3. RM Anderson, Discussion: The Kermack-McKendrick epidemic thresholdtheorem, Bulletin of mathematical biology, 53(1):1–32, (1991).
4. K Dietz, Transmission and control of arbovirus diseases, in Epidemiology, K. L. Cooke, ed., SIAM, Philadelphia, pp. 104–121 (1975).
5. K Dietz, Epidemiologic interference of virus populations, J. Math. Biol., 8, pp. 291300(1979).

6. RMAnderson and R.M. May. "Infectious diseases of humans: dynamics andcontrol" (Oxford University Press, Oxford, 1991).
7. HWHethcote, Three basic epidemiological models. Applied Mathematical Ecology, 18:119–144, (1989).
8. H W Hethcote. The mathematics of infectious diseases. SIAMreview, 42(4):599–653, (2000).
9. C I Siettos&L Russo, Mathematical modeling of infectious disease dynamics. Virulence, 4(4), 295-306(2013).
10. A Mummert et.al., A perspective on multiple waves of influenza pandemics, PLOS ONE, 8(4), (2013).
11. A Stegeman et.al., Quantification of the transmission of classical swine fever virus between herds during the 1997–1998 epidemic in the netherlands. Preventive veterinary medicine, 42(3):219–234, (1999).
12. Centers for Disease Control andPrevention, Rubella outbreak—Westchester County, NewYork, 1997–1998, MMWR, 48, pp. 560–563(1999).
13. Centers for Disease Control and Prevention, Epidemiology of measles—United States, 1998, MMWR,48, pp. 749–753(1999).
14. Centers for Disease Control and Prevention, Global measles control and regional elimination, 1998–99, MMWR, 48, pp. 1124–1130(1999).
15. Centers for Disease Control and Prevention, Update: Raccoon rabies epizootic—United States and Canada, 1999, MMWR, 49, pp. 31–35(2000).
16. Centers for Disease Control and Prevention, Update: Influenza activity—United States, 1999-2000 season, MMWR, 49, pp. 53–57(2000).
17. Centers for Disease Control and Prevention, Measles outbreak—Netherlands, April 1999-January 2000, MMWR, 49, pp. 299–303(2000).
18. SAltizer et. al., Seasonality and the dynamics of infectious diseases, Ecology Letters 9, 467 (2006).
19. KDietz, The incidence of infectious diseases under the influence of

seasonal fluctuations, in Mathematical Models in Medicine, J. Berger, W. Buhler, R. Repges, and P. Tautu, eds., Lecture Notes in Biomath. 11, Springer-Verlag, Berlin, pp. 1–15 (1976).

20. S N Busenberg and KP Hadeler, Demography and epidemics, Math. Biosci., 101, pp. 41–62(1990).
21. S.N.Busenberg,M.Iannelli,andH.R.Thieme,Globalbehaviorofanage-structuredepidemic model, SIAM J. Math. Anal., 22, pp. 1065–1080(1991).
22. S N Busenberg and P van den Driessche, Analysis of a disease transmission model in a population with varying size, J. Math. Biol., 28, pp. 257–270(1990).
23. CCastillo-Chavezet.al., Epidemiological modelswithagestructure, proportionate mixing, andcross-immunity, J. Math.Biol., 27, pp. 233–258(1989).
24. JS Lavine et.al.,Natural immune boosting in pertussis dynamics and the potential for long-term vaccine failure, Proceedings of the NationalAcademy of Sciences 108, 7259 (2011).
25. Centers for Disease Control and Prevention, Recommended childhood immunization schedule— United States, MMWR, 49, pp. 35–47(2000).
26. P Pesco et.al.,Modelling the effect of changes in vaccine effectiveness and transmission contact rates on pertussis epidemiology, Epidemics 7, 13 (2014).
27. M Van Boven et.al.,Waning immunity and sub-clinical infection in an epidemic model: Implications for pertussis in The Netherlands, Math.Biosciences 164, 161 (2000).
28. G Fabricius et. al., Modelling pertussis transmission to evaluate the effectiveness of an adolescent booster in Argentina, Epidemiologyand Infection 141, 718 (2013).
29. CCastillo-Chavez et.al., Competitive exclusion in gonorrhea models

and other sexually-transmitted diseases, SIAM J. Appl. Math., 56 (1996), pp. 494–508.

30. H HWeiss, The SIR model and the foundations of public health. Materials matematics, 0001-17.(2013).
31. M Dottori and G Fabricius, SIR model on a dynamical network and the endemic state of an infectious disease. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 434, 25-35 (2015).
32. A V Nikitina et.al., Study of the spread of viral diseases based on modifications of the SIR model. Computational mathematics and information technologies, (1), 19-30(2020).
33. N Boccara &K Cheong, Automata network SIR models for the spread of infectious diseases in populations of moving individuals. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, *25*(9), 2447(1992).
34. M Ehrhardt et.al., SIR-based mathematical modeling of infectious diseases with vaccination and waning immunity. Journal of Computational Science, 37, 101027(2019).
35. M Y Li &J S Muldowney, Global stability for the SEIR model in epidemiology. Mathematical biosciences, 125(2), 155-164(1995).
36. V Ram and L PSchaposnik, A modified age-structured SIR model for COVID-19 type viruses. Sci Rep 11, 15194 (2021).

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Theoretical Chemistry: Is It A Greener Way of Doing Research in Chemistry?

Anirban Panda *

Abstract: Theoretical Chemistry is a branch of chemistry that falls under the broad category of mainstream Physical Chemistry. It deals with various physical and chemical properties of molecules and their applications in different fields. It also explores the different reactions that occur between molecules and their outcomes.

Unlike experimental chemistry, theoretical research relies solely on computers and requires no actual bench work. This reduces both research costs and environmental impact. However, there is no free lunch—theoretical research also demands high-level computational power and a constant supply of electricity. As a result, it contributes to e-waste and is indirectly linked to the physical hazards associated with power generation.

The present work will briefly introduce the field of theoretical chemistry and the typical work carried out by theoreticians. It will also highlight recent developments in the field, particularly the growing demand for computers, servers, and related accessories. We have attempted to estimate the environmental cost of this increased demand, as well as the challenges associated with the disposal and management of obsolete equip-

* Department of Chemistry, Jagannath Kishore College, Purulia.
e-mail: anirban@jkcprl.ac.in

ment. Additionally, we have assessed the extent of environmental sustainability inherently associated with this line of research.

Introduction

At the beginning of the last century, physicists believed that Newton's laws and Maxwell's theory—i.e., classical physics—could explain any physical phenomenon, and that no further research was necessary. However, experimental results soon emerged that could not be explained by the physics of that time. This marked the dawn of a new era in physics: quantum mechanics.[1]

The quantum hypothesis proposed by Prof. Max Planck attracted immediate attention from many researchers, including Einstein. Within a few years, quantum mechanics was established as a new branch of physics. Chemists were not far behind—they began applying this new concept in their work, and a new field emerged in chemistry: theoretical chemistry.

It was soon realized that the world of atoms and molecules is entirely different from the macroscopic world we see around us. Since atoms and molecules cannot be visualized using any instrument to date, the laws of physics and mathematics remain the only tools available to explore the atomic world. Consequently, researchers began incorporating advanced physical and mathematical concepts into chemistry, giving the field of theoretical chemistry new dimensions.

Broadly, the research area of theoretical chemistry can be divided into three parts: (1) Quantum chemistry; (2) Statistical mechanics; (3) Mathematical chemistry. Research in this area typically involves the in-depth analysis of the properties of atoms and molecules, guided by the laws of physics and mathematics. Researchers also study the various reactions that occur between molecules and their possible outcomes. Furthermore, since molecules interact with electromagnetic radiation, theoreticians study the interaction of radiation with matter.[2]

On a larger scale, theoretical studies may involve the interaction of drug molecules with protein targets, self-interactions of proteins, and protein dynamics. The outcomes of such studies are typically twofold: (1) they provide physical insights into the chemical phenomena that occur during reactions, and (2) they may be predictive in nature. Scientists can design molecules theoretically,[3] examine their properties using computational methods, and, if the results are promising, proceed with real synthesis. This enables estimation of yields, prediction of by-products, and selection of the most economically viable and environmentally friendly synthesis route.

A key advantage of this field is that, although the research is chemical in nature, it does not require any real chemicals or laboratory instruments. Scientists working in theoretical chemistry primarily need pen and paper, and access to high-level computational facilities. While this might suggest that the field is inherently green, in reality, it carries the risk of generating substantial amounts of electronic waste (e-waste).

A discussion on e-waste is therefore warranted. Electronic and electrical products—such as computers, laptops, mobile phones, air conditioners, refrigerators, printers, and televisions—have become indispensable in modern life.[4] Over time, these devices become obsolete and are often discarded. These electronic scraps contain heavy metals, polychlorinated biphenyls (PCBs), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), valuable and rare metals like gold, palladium, copper, germanium, and indium, as well as large quantities of plastic.

One study has shown that e-waste contains higher concentrations of rare and noble metals than typical metal mines.[5] With global economic growth, ownership of electronic devices is rapidly increasing. Even individuals who cannot afford new products often purchase second-hand electronics, especially in developing countries. At the same time, techno-

logical advancements have shortened the useful life of these devices. Studies show that in 2000, the average lifespan of a new computer was 4.5 years; by 2005, it had decreased to just 2 years.[6] Our personal experiences align with this trend. The increasing number of users, coupled with decreasing device lifespans, has led to a sharp rise in global e-waste.

In 2012, global e-waste generation was estimated at 40 million tons per year.[7] The current figure is likely even higher. This raises an important question: what should be done with all this e-waste? There are only two options—destruction or recycling. Recycling is the more environmentally sound choice. However, recycling e-waste also presents serious environmental hazards.

The dismantling of e-waste involves more than simply unscrewing components. It includes shredding, tearing, and burning, all of which produce smoke and dust particles containing carcinogens and hazardous chemicals. Long-term exposure can lead to serious health issues including lung and skin problems, tumors, and cancer.[8]Currently, e-waste is disposed of using three main methods: (1) Landfilling; (2) Acid baths; (3) Incineration.

Landfilling, as the name suggests, involves burying e-waste in the ground. This can be likened to a chemical time bomb, as the buried materials may eventually release toxic metals such as mercury, nickel, and cadmium. Acid from old batteries may leach into the soil and contaminate freshwater sources used for drinking by humans and animals.[8]

Acid baths are used to extract metals like copper, gold, and silver from circuit boards. However, the residual acid, now containing dissolved toxic chemicals, is often released into the environment.

Incineration—sometimes involving pyrolysis—burns the waste in limited oxygen. This process releases even more toxic substances than ordinary combustion. For example, heating PVC circuit boards produces fumes containing known carcinogens such as polycyclic aromatic hydro-

carbons (PAHs), PCDDs, and PCDFs. Additionally, gases like carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO), nitrogen oxides (NOx), and trace amounts of heavy metal oxides (antimony, lead, thallium, arsenic, copper, manganese, mercury, and nickel) are emitted. These substances pose serious health risks and are linked to chronic respiratory diseases (like COPD), heart conditions, and various cancers.

The situation becomes even more dangerous when untrained, unprotected workers handle e-waste recycling. This is a common practice in countries like China and India, which are the primary global destinations for e-waste dumping.[4]

The present work aims to estimate the environmental cost associated with the increasing demand for electronic equipment in educational institutions, with a specific focus on theoretical chemistry research groups. It will also address the management of e-waste generated from the disposal of outdated equipment. Through this, the work seeks to assess the extent of inherent greenness in this type of theoretical research.

Research Methodology

In this work we have taken data from the NAAC Self Study Report (SSR) of some educational institutions of West Bengal to figure out the gradual increase in e-resources in the educational institutions of this part of the country. However, more data is required from institutions of national importance (IITs/IISERS/ Central Universities) for unbiased analysis of the present scenario.

Result and Discussion

We have collected the general computer procurement data from (1) Jagannath Kishore College Purulia AQAR & SSR, 2019,[9] (2) Bankura Christian College AQAR &SSR, 2018;[10](3) University of Burdwan, AQARs;[11] (4) Jadavpur University Kolkata, AQAR, 2016-2017.[12] (5) Sidho Kanho Birsha University, Purulia SSR, 2017;[13] Table 1 shows the number of computers

purchased by the first four institutions from 2013-14 to 2017-18.

Table 1. Institution wise report of computer procurement from 2013 to 2018.

Name of the Institution	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
Bankura Christian College	145	161	215	216	137
J. K. College, Purulia	71	100	123	124	125
University of Burdwan	621	1200	1500	1548	1820
Jadavpur University, Kolkata		5350	6124	6474	

The data clearly indicates a steady increase in the number of computers purchased by educational institutions over time. However, it's important to note that this figure includes computers used for non-academic purposes as well, which calls for a more refined analysis. For instance, Sidho-Kanho-Birsha University in Purulia—a relatively new state university established in 2010—reported in its latest SSR that it owns 189 computers dedicated solely to academic activities.

In contrast, Jadavpur University in Kolkata, an older institution of national significance, has access to a significantly larger collection of e-resources. This number is expected to grow, especially following the acceleration of digital infrastructure during and after the COVID-19 pandemic. Despite limitations in the dataset, it still provides a general idea of the growing presence of electronic equipment in higher education, particularly within universities.

Interestingly, the two colleges discussed earlier lack dedicated theoretical chemistry laboratories. Meanwhile, universities like the University of Burdwan and Jadavpur University have established theoretical chemistry groups, though the exact number of computers allocated for their use

is currently unknown to the author. This highlights a need for further investigation.

When it comes to e-waste management in the education sector, comprehensive data is lacking. There's insufficient information on how these institutions handle obsolete electronics, their disposal methods, or existing policies. In fact, most institutions in this region lack standardized protocols and proper record-keeping for e-waste. On a global scale, Kahhat et al. conducted a study at Arizona State University (USA) showing that reselling nearly end-of-life electronics to the public could extend their usability.[14] Similarly, Babbitt et al. highlighted that estimating the lifespan of such equipment is complex and must account for usage patterns and dynamics.[15]

In the realm of chemistry research, synthesizing 33 mL of an air-stable diradical—pegylatedbis(aminoxyl), which serves as a starting material for organic synthetic magnets—can cost approximately $150 on a laboratory scale.[16] In contrast, estimating its synthetic route using theoretical (computational) methods requires only a few hours of CPU time. This not only drastically reduces human labor and time but also minimizes the release of toxic chemicals into the environment, ultimately promoting a more sustainable and eco-friendly research practice.

Another critical issue is the reproducibility of experimental results. In real-world chemical synthesis, any unreacted reagent post-reaction is often unrecoverable without specific and sometimes complex extraction techniques. However, in computational studies, repeating an experiment merely involves a few additional hours of CPU usage, making reproducibility much simpler—though it does require accounting for the additional power consumed.

Today, chemists are increasingly embracing the principles of *green chemistry*, with a strong focus on atom economy.[17] Environmentally be-

nign reagents such as water, air, and enzymes are preferred for synthesizing compounds, aiming for 100% yield and zero waste generation. Within this context, theoretical chemistry stands out as one of the greenest approaches—even when electricity consumption is considered—offering an efficient and sustainable alternative to traditional lab-based methods.

Since the advent of AI technology, chemists have increasingly adopted various AI and machine learning techniques. The use of high-end technologies has undoubtedly reduced computational time and improved the reliability of data-driven processes. However, it has also contributed to the growing burden of e-waste on the environment. It is well known that Generative Artificial Intelligence (GAI) requires a substantial amount of data for both training and inference.[18] Consequently, GAI demands extensive computational hardware and significant energy consumption, making it a potential contributor to e-waste. In the near future, the projected increase in AI usage suggests a rapid expansion of inexpensive hardware installations, which may lead to a substantial rise in e-waste. Scientists have already proposed some solutions to this problem.[19] Nevertheless, the severity of the issue warrants further discussion, which will be addressed in future communications.

Conclusion

The current study requires further research and additional data to draw definitive conclusions regarding the initial questions posed. However, preliminary findings suggest that theoretical chemistry offers a comparatively safer and more sustainable approach to conducting chemical research.

That said, academic institutions must begin to address the issue of e-waste management with greater seriousness. The increasing use of electronic equipment in research contributes significantly to e-waste accumulation, which, if left unmanaged, can pose serious environmental challenges. Institutions should prioritize the adoption and enforcement of

national and international e-waste management guidelines, such as those outlined in the Basel Convention.

Taking proactive steps in this direction will not only mitigate future environmental risks but also contribute meaningfully to building a more sustainable and peaceful world.

Acknowledgement

The author sincerely acknowledges J.K. College, Purulia, for providing the e-library facility essential for this work. Grateful thanks are due to Dr. Seemita Basak, Scientist, BARC, Mumbai, for valuable discussions. The author also thanks the anonymous reviewer for highlighting several important issues relevant to the present study.

References

1. McQuarrie, D.A.; Simon, J. D. *Physical Chemistry A molecular Approach* , Viva Books Private Limited, New Delhi, 1999.
2. Simons, J. *An Introduction to Theoretical Chemistry*, Cambridge University Press, UK, 2005.
3. Datta, S. N.; Trindle, C. O.; Illas, F. *Theoretical and Computational Aspects of Magnetic Organic Molecules*, Imperial College Press: London, 2014.
4. Zhang, K.; Schnoor, J. L.; Zeng, Y. E.E-Waste Recycling: Where Does It Go from Here?.*Environ. Sci. Technol.* **2012**, *46*, 10861.
5. Hageluken, C.; Meskers, C. "Mining our computers— Opportunities and challenges to recover scarce and valuable metals", *in: Proceedings of Electronics Goes Green Conference* **2008**, H. Reichl, N. Nissen, J. Müller, O. Deubzer (eds.), Fraunhhofer IRB, Stuttgart,585–590.
6. Widmer, R.; Oswald-Krapf, H.; Sinha-Khetriwal, D.; Schnellmann, M.; Boni, H. Global perspectives on e-waste, *Environ. Impact. Assess. Rev*. **2005**, *25 (5),* 436.
7. Huisman, J.; Magalini, F.; Kuehr, R.; Maurer, C.; Ogilvie, S.; Poll, J.;

Delgado, C.; Artim, E.; Szlezak, J.; Stevels, A. *2008 Review of Directive 2002/96 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Final Report;* United Nations University, 2008.

8. Sivaramanan, S. E-Waste Management, Disposal and Its Impacts on the Environment.*Univ. J, Environ. Res. Technol.* **2013**, *3*(5), 531.
9. https://www.jkcprl.ac.in/self-study-report.php(Accessed on 23/06/2025)
10. http://www.bankurachristiancollege.in/BCC_IQAC_MEMBER.aspx (Accessed on 23/06/2025).
11. https://www.buruniv.ac.in/bunew/Template.php?page=IQAC&subpage=AQAR(Accessed on 23/06/2025).
12. http://www.jaduniv.edu.in/upload_files/iqac_file/1538375070-1.pdf (Accessed on 23/06/2025).
13. https://skbu.ac.in/index/pageid/kbk9j9jb8fgb4f2a5a4aaa4fjeaa4f2a2fle (Accessed on 23/06/2025).
14. Babbitt, C. W.; Williams, E.;Kahhat, R. Institutional disposition and management of end-of-life electronics, *Environ. Sci. Technol.* **2011**, *45*, 5366.
15. Babbitt, C. W.; Kahhat, R.; Williams, E.; Babbitt, A. B. Evolution of Product Lifespan and Implications for Environmental Assessment and Management: A Case Study of Personal Computers in Higher Education.*Environ. Sci. Technol.* **2009**, *43*, 5106.
16. Spagnol, G.; Shiraishi, K.; Rajca, S.; Rajca, A. Triplet ground state (S = 1) pegylatedbis(aminoxyl) diradical: synthesis and the effect of water on magnetic properties*Chem. Commun.* **2005**, 5047.
17. Anastas, P.T.; Warner, J. K. Green Chemistry-Theory and Practical, Oxford University Press, UK.1998.
18. Jia, Z. et al.The importance of resource awareness in artificial intelligence for healthcare, *Nat. Mach. Intell.* **2023**,*5*, 687–698.
19. Wang, P.; Zhang, L-Y,;Tzachor, A.; Chen, W-Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence, *Nat. Comp. Sci.,* **2024,** *4*, 818-823.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

Radical Ions as Reactive Intermediates in Organic Synthesis

Sayantan Mondal *

Abstract: Radical ions—both radical cations and radical anions—have emerged as powerful and versatile intermediates in modern organic synthesis. Their unique single-electron transfer (SET) reactivity enables access to transformations that are often inaccessible via classical two-electron pathways. This review outlines the mechanistic evolution and synthetic utility of radical ion processes, focusing on ring-opening reactions, ring-closure strategies, and carbon–carbon and carbon–heteroatom bond-forming reactions. Special emphasis is placed on $S_{RN}1$ reactions and SOMO organocatalysis, which exploit radical anion and cation intermediates for substitution and enantioselective synthesis. Advances in photochemistry and electrochemical methodologies have further enabled precise generation and control of these reactive species. Collectively, the exploration of radical ions provides a mechanistically distinct and synthetically valuable framework for developing innovative and sustainable synthetic strategies.

Keywords: Radical ions, $S_{RN}1$ mechanism, SOMO organocatalysis, radical cation, radical anion, ring-opening, electron transfer.

---

* Assistant Professor and Head, Department of Chemistry, Bankura Zilla Saradamani Mahila Mahavidyapith, Bankura.
e-mail: sayantan.saradamani@gmail.com

Introduction

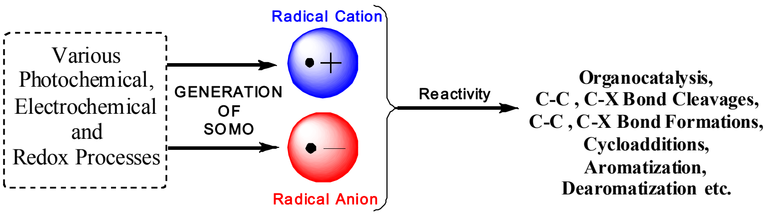

Figure1: Generation and reactivity of Radical Cations and Anions

Since the early 1970s, small organic compounds have been employed to catalyze asymmetric transformations, as exemplified by the Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert Reaction. However, the mechanism of this reaction as a general carbonyl activation pathway has been largely overlooked. In 2000, enamine and iminium ion catalysis were introduced as general activation methods for secondary amines. SOMO organocatalysis, which involves the activation of transiently generated, electron-rich enamines through single-electron oxidation, represents a novel approach. This method enables reactions with weakly nucleophilic substrates that were previously inaccessible to earlier techniques. The successful application of SOMO (Figure1)organocatalysis necessitates the presence of an equilibrium population.

Radical ion reactions and developments

"Recent decades have seen a rise in the significance of reactive species, such as radical ions. The chemistry of these compounds, as well as their potential as intermediates in many chemical and bio-organic processes, has piqued interest in their possible use in the creation of new synthetic methods. Radical anions derived from substituted phenyl cyclopropyl ketones were first reported in 1990 by Tanko and colleagues (Scheme 1) [1]. The reversible and slow ring opening of $\mathbf{1}^{\bullet-}$ is preferred by the ring-closed radical anion ($k_o < 10 s^{-1}$ and $K_{eq} = k_o/k_{-o} = 10^{-8}$ for R = H in equilib-

rium) when R = alkyl or hydrogen. A more favorable ring opening ($k_o \sim 10^6$-10^7 s-1 for R = $CH{=}CH_2$ or Ph) can be achieved by adding radical-stabilizing substituents (R = phenyl or vinyl) to the cyclopropyl group, which can partially compensate for resonance energy loss."

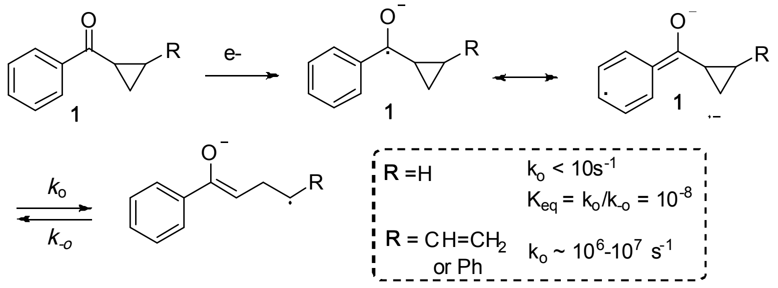

Scheme 1. Open phenyl cyclopropyl ketones radical anion ring

The aliphatic ketones can also produce radical anions. Radical anions from 2a and 2b open cyclopropane rings, favoring the 3° distonic radical anion (Scheme 2). Electron transfer was the rate limiting step whether the reduction was done directly (CV) or indirectly (homogeneous redox catalysis), implying a ring opening rate constant > 10^7 s^{-1}. Ring opening rate constant could not be established because **2a** and **2b** reduction kinetics entail rate-limiting electron transport.

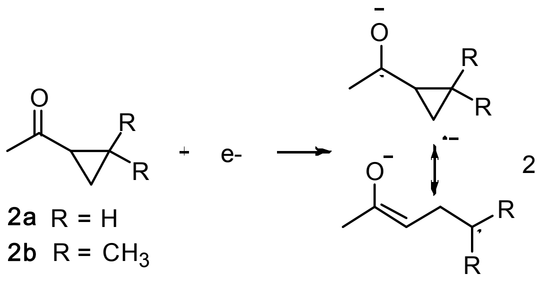

Scheme 2. Ketyl radical anions ring opening

The aliphatic ketones can also produce radical anions. Radical anions from **2a** and **2b** open cyclopropane rings, favoring the 3° distonic radical anion (Scheme 2). Electron transfer was the rate limiting step whether the reduction was done directly (CV) or indirectly (homogeneous redox catalysis), implying a ring opening rate constant > 10^7 s^{-1}. Ring opening rate constant could not be established because **2a** and **2b** reduction kinetics entail rate-limiting electron transport.

Unimolecular radical nucleophilic substitution ($S_{RN}1$) involves the use of radical anion intermediates. This $S_{RN}1$ approach was initially developed to substitute alkyl halides that have electron-withdrawing groups (EWGs) at the á position and an appropriate leaving group [2]. In 1970, Bunnett applied this method to unactivated aromatic halides [3]. Subsequently, it was demonstrated that vinyl, perfluoroalkyl, alkylmercury, cycloalkyl, bridgehead, and neopentyl halides could also undergo this reaction. The method is quite versatile. It is effective with alkyl groups, OR, OAr, SAr, CF_3, CO_2R, NH_2, NHCOR, NHBoc, SO_2R, CN, COAr, NR_2, and F. Beyond halides, other leaving groups such as $(EtO)_2P(O)O^-$, RS^-, $ArOS^-$, $PhSe^-$, Ph_2S, RSN_2 (R = t-Bu, Ph), BF_4N_2, R_3N, N_2, N_3^-, NO_2^-, and HgX^- are also recognized. ArOH and $ArNH_2$ can leave through phosphate esters and ammonium salts. In aromatic systems, the $S_{RN}1$ mechanism plays a vital role in ring-closure processes. This technique is used to synthesize indoles, carbazoles, isoquinolones, heterocycles, and various natural compounds. Numerous studies have explored the SRN1 mechanism for sp^3 and sp^2 carbon substitution [4]. Its synthetic applications are evident in aromatic photo-initiated substitutions [5] and electrochemical catalysis reactions [6, 7] [8]. The $S_{RN}1$ process begins with the formation of the radical anion of substrate $RX^{\cdot}$, through electron transfer (ET) from the nucleophile or an electron source. ET to unsubstituted alkyl halides is a dissociative reaction [9]. When $RX^{\cdot}$ decomposes, it yields the radical $R^{\cdot}$ and the leaving group anion. The radical then reacts with the nucleophile

to form the radical anion of the substitution product $RNu^{\bullet-}$ which generates intermediates necessary for cycle propagation via ET to the substrate. Scheme 3 illustrates how the substrate, nucleophile, and experimental conditions influence termination stages [10].

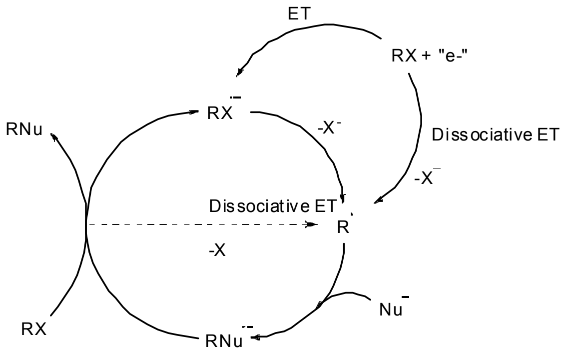

Scheme 3. The mechanism of the $S_{RN}1$ process

In $S_{RN}{}^1$ reactions, nucleophiles such as nitrogen anions are involved. These reactions typically start with ArX interacting with NH_2^- [11]. Consequently, $ArNH_2$ compounds can be synthesized by reacting with 1-chloro-2,4,5-trimethylbenzene, *o*-$MeOC_6H_4X$ (where X is Br or I), 2-iodo-1,3-dimethylbenzene, PhOPh, 3-bromothiophene, and $ArOP(O)(OEt)_2$, all under the reduction of K metal in liquid ammonia [11]. When NH_2^- ions are photoinitiated with 2-bromo-1,3,5-trimethylbenzene, a 70% yield of substitution is achieved [12]. $PhNH^-$ ions react with PhI in the presence of K metal, leading to substitution at the nitrogen, ortho, and para positions of the phenyl ring. Through photoinitiation, PhI, *p*-$MeOC_6H_4I$, and 1-iodonaphthalene interact with 2-naphthylamide ion in liquid ammonia, resulting in the formation of 1-aryl-2-naphthylamines with high yields [13]. Elements such as P[14], As[15], S[16], Se[17], and Te[18] can also serve as nucleophiles in the $S_{RN}{}^1$ reaction, demonstrating its versatility.

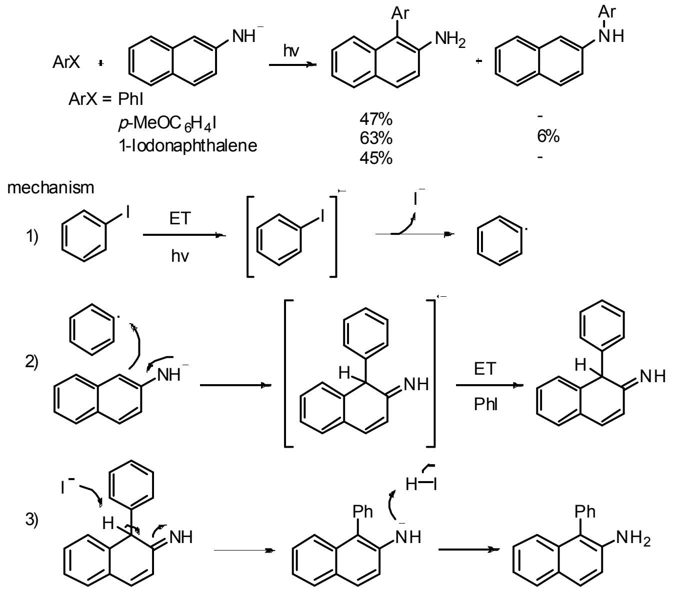

Scheme 4. The first $S_{RN}1$ process with the mechanism.

The typical $S_{RN}1$ reaction involving aromatic substrates entails the interaction of carbanions to form a carbon-carbon bond. This research has investigated carbanions derived from hydrocarbons, such as 1,3-pentadienyl, 1-(4-anisyl)propenyl, fluorenyl, and indenyl [19]. The regiochemistry of the coupling process favors the formation of the more stable radical anion intermediate. Aromatic substrates possessing two leaving groups, such as compound 3, react with enolates to yield mono- and disubstituted products, contingent upon the nature of the leaving group and the nucleophile. Upon electron impact on substrate **3**, the radical anion **3**$^{\bullet}$ undergoes cleavage at the labile C-X bond, resulting in the formation of radical **4**. This radical intermediate **4** subsequently interacts with the nucleophile to generate radical anion **5**. The radical anion may

transfer the additional electron to another molecule (ETinter) to form product **6** or to the second C-Y bond intramolecularly. The **5**-fragment radical **7** couples with the nucleophile and undergoes an electron transfer reaction to produce the disubstitution product **8** (Scheme 5). Dihalo substrates exhibit similar behavior with ketones and other nucleophiles [20].

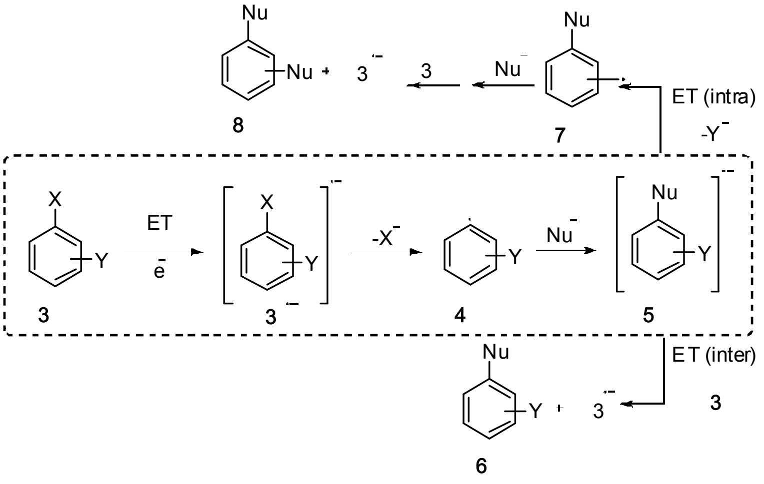

Scheme 5. Two possible $S_{RN}1$ pathways with two leaving groups.

Transition metals such as Sn are capable of forming the $S_{RN}{}^1$ nucleophile. When Me_3SnAr reacts with acyl chloride, it yields asymmetric diaryl ketones in high yields (40-78%) due to the Me_3Sn group's effectiveness as a leaving group in nucleophilic substitutions. These regioselective reactions enable the synthesis of diarylketones that cannot be produced through Friedel-Crafts methods. Diarylketone**10** was obtained in a 78% yield from the reaction of stannane **9** with PhCOCl in PhCl [21]. Specific di- and triketones were achieved in good to excellent yields (45-83%, Scheme 6) [22].

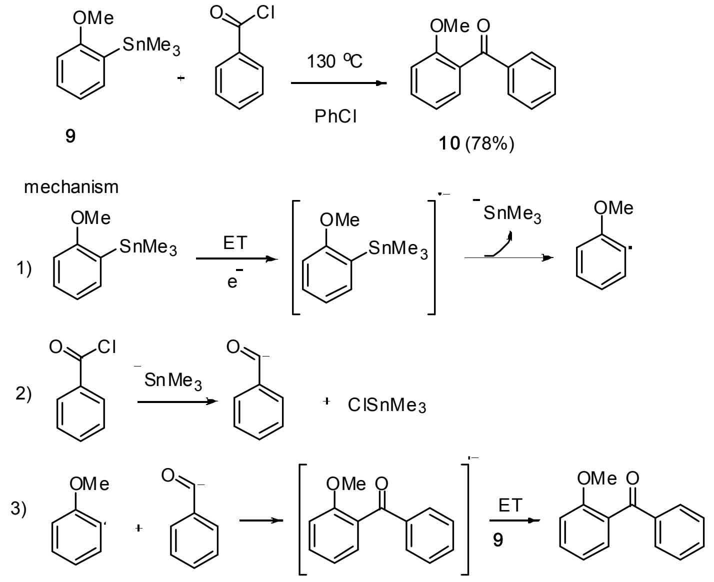

Scheme 6. Formation of diarly ketones through the leaving of Me_3Sn.

Extensive research has been conducted on the application of ring-closing $S_{RN}1$ reactions. These reactions proceed via the $S_{RN}1$ substitution of aromatic compounds that possess an appropriate substituent (Z) ortho to the leaving group, such as **10**, which reacts with a nucleophile to yield product **11**. The ring-closure product 12 is formed through the interaction between the (Nu) and (Z) groups.

O-iodobenzylamines react with enolate ions under irradiation to form isoquinoline rings and derivatives using the $S_{RN}1$ method. Product **14** results from ring closure of substitute product **13**. Treatment **14** with $NaBH_4$ yields tetrahydroisoquinolines**15**. However, Pd/C treatment yields isoquinoline compounds **16** (Scheme 8) [23]. See "The $S_{RN}1$ Reaction" for further examples [24]. The atomic oxygen radical anion is crucial to many biological processes [25]. Carbonate radical anion ($CO_3^{\bullet -}$) plays a crucial role as an oxidant in cells [26].

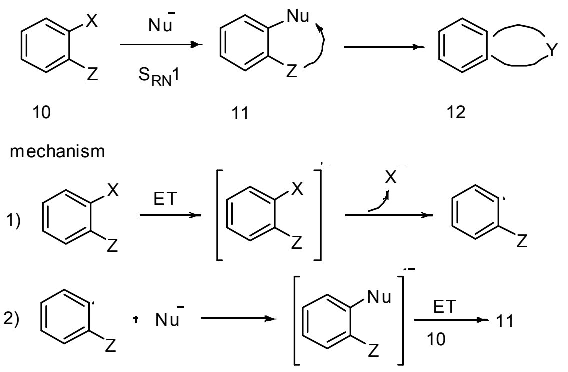

Scheme 7. Aromatic substituents as both directing groups and reactive pendants for cyclization.

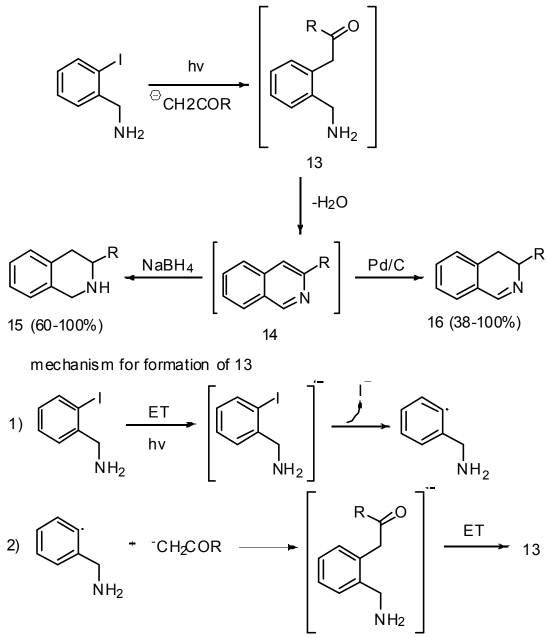

Scheme8.Tetrahydroisoquinolines (**15**) and isoquinolines (**16**) synthesis from o-iodobenzylamines and $^{-}CH_2COR$ anions by $S_{RN}{}^1$-ring-closure sequence.

Reactions involving radical cations have been explored less extensively compared to other radical processes. A small fraction of preparative reactions incorporates electron transfer [27]. Examples include Birch reduction, acyloin condensation, Ullman coupling, Grignard reagent synthesis, radical cation-catalyzed Diels-Alder reaction, and $S_{RN}1$ reaction. As previously noted, the primary challenge in utilizing radical cation ET reactions in synthesis is the difficulty in managing the reaction events of odd-electron species, whether they are catalytic (Figure 2a) or stoichiometric (Figure 2b). A brief discussion on the use of select radical cations in synthesis will follow.

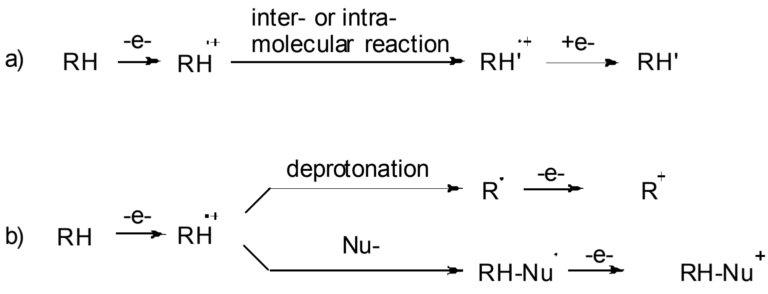

Figure 2. Reaction of odd-radical species in catalytic (a) and stoichiometric amounts (b).

Similar to the ring-opening processes of cyclopropane involving radical anions, the ring openings of radical cations have also been studied. However, due to the absence of kinetic data for aliphatic amine radical cations, these ring-opening reactions remain in the early stages of research. Both theoretical and experimental studies indicate that the cyclopropylamine radical cation undergoes ring opening without an energy barrier in both gas and solution phases (Freon) [34]. As depicted in Scheme 9, a 1,2-hydride migration results in the isomerization of the distonic ring-opened

radical-cation [35]. Typically, ring-opened cyclopropylamine radical cations yield allylamine **17**.

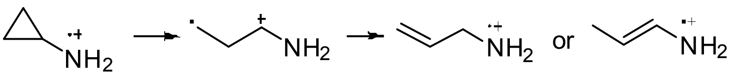

17

Scheme 9. Ring openings and subsequent 1,2-hydride migration of aliphatic cyclopropylamine radical cation.

Radical cation intermediates can facilitate ring expansion by opening rings. Siloxy cyclopropane radical cations serve as intermediates in the synthesis of larger ring systems with open radical cations. In the absence of nucleophilic assistance, a distonic radical cation sheds its silane group, forming a *β*-keto radical [36]. These â-keto radicals can be added intramolecularly to π systems. Mattay and colleagues conducted transition state calculations on (bicyclo[4.1.0] heptan-1-yloxy) trimethylsilane and discovered that the cleavage of the endocyclic bond in the cyclopropane ring is predominant [37]. Hasegawa supports experiments with related compounds [38]. Further investigation into the regioselectivity of bond cleavage in these bicyclic compounds (Scheme 10) revealed that (i) photochemically induced electron transfer and chemically induced oxidation (by tri-bromophenylaminyl radical cation) lead to ring opening through different pathways, as evidenced by the observed products, and (ii) the presence of a nucleophile in chemically oxidized systems enhances the desilylation of the radical cation, thereby increasing the rate. Beyond synthesis, N-cyclopropyl substituted radical cations are fascinating target molecules for mechanistic studies and radical clocks. Additionally, N-alkyl-N-cyclopropylaniline radical cations have been examined in ring opening. N-alkyl-N-cyclopropylanilines have been employed as mechanistic probes in aromatic amine nitrosations to identify radical cation inter-

mediates through ring opening. An aminyl radical cation intermediate nitrosates N-alkyl-N-cyclopropylanilines in acidic conditions (Scheme 11). This intermediate leads to the formation of N-alkyl-N-nitroanilines following regioselective ring opening [39].

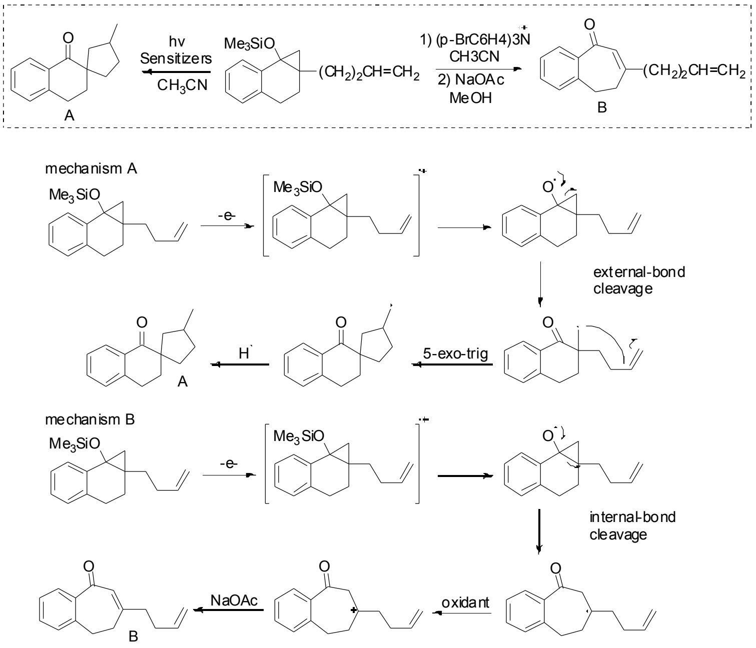

Scheme 10. Mode of radical cation generation determines the regioselectivity during ring opening

Alkyl-N-cyclopropylanilines in acidic environments (Scheme 11) use an aminyl radical cation intermediate. N-alkyl-N-nitroanilines develop from this intermediate after regioselective ring opening [39].

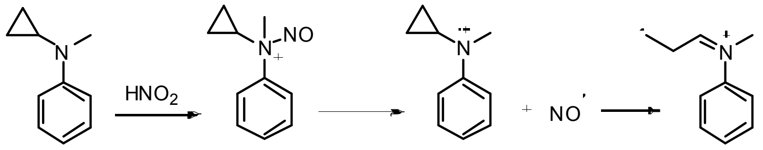

Scheme 11. Nitrosation mechanism for N, N-dialkylanilines

Photoirradiation is another common method for initiating radical cation intermediate radical transformations. Anthraquinone is produced through the photocatalytic oxygenation of anthracene by O_2 using the Acr+-Mes complex **18** (Scheme 12) [40]. The process of photocatalytic oxygenation of anthracenes starts with the photoexcitation of Acr+-Mes, which creates the electron-transfer state (Acr$^{\bullet}$ -Mes$^{\bullet}$ +). This is followed by the transfer of electrons from anthracenes to the Mes$^{\bullet +}$ moiety and O_2 [41]. The anthracene radical cation then interacts with $O_2^{\bullet -}$ leading to the formation of epidioxyanthracene (An-O_2). Scheme 12 illustrates the photocatalytic transformation of An-O_2 into 10-hydroxyanthrone. Radical cation reactions are enhanced by photochemistry. Pulse radiolysis studies [42] have shown σ C-H$^{\bullet +}$ cleavage. According to ESR [43], deprotonation tends to occur at the C-H bond with the highest unpaired electron density.

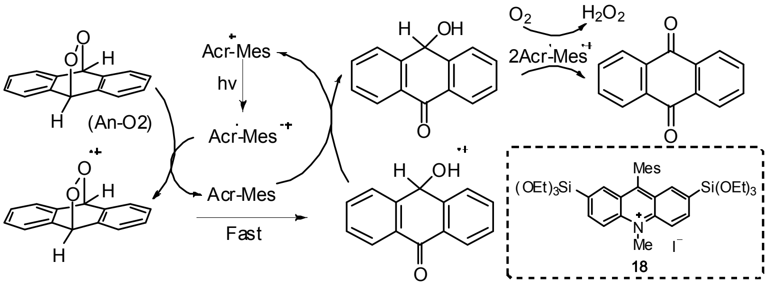

Scheme 12. Photocatalytic oxygenation of anthracene by O_2 with Acr^{+}-Mes

Several decades ago, PET with TCB **20** or CA (Scheme 13) facilitated ó C-Hÿ+ deprotonations through the arylation of alkanes (44, 45). The deprotonation of the tertiary carbon atom is typically favored in **19**$^{\cdot +}$. The review by Schmittel and Burghart [46] offers novel mechanistic insights into radical cation processes. For additional information on radical cation photochemical reactions, refer to "Photoinduced Reactions of Radical Ions via Charge Separation[47].

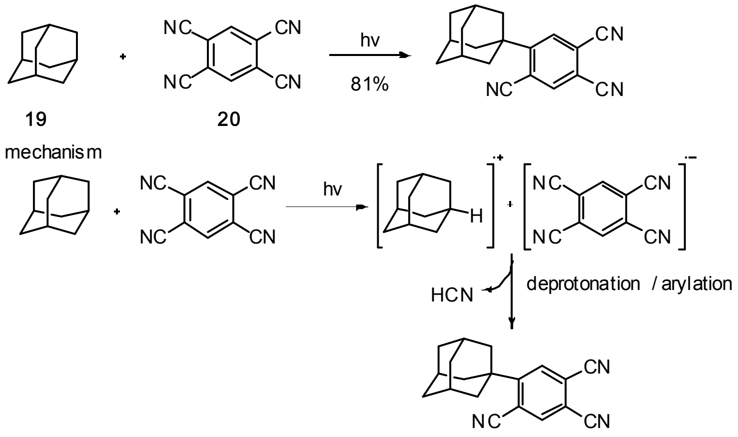

Scheme 13. σ C-H$^{\cdot +}$ deprotonation in arylation of adamantine

Since the early 1970s, small organic compounds have been used to catalyze asymmetric transformations, as seen in the Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert Reaction. Despite this, the mechanism of this reaction as a general carbonyl activation pathway was overlooked. In 2000, enamine and iminium ion catalysis were introduced as general activation strategies for secondary amines. SOMO organocatalysis, discovered by MacMillan and Sibi, involves the single-electron oxidation of transiently formed, electron-rich enamines to facilitate activation. This method allows reactions with weakly nucleophilic substrates that previous techniques could not

address. For SOMO organocatalysis to be effective, the amine catalyst must ensure high enantiocontrol when coupling the radical cation with nucleophiles, an equilibrium population of enamine must be preferentially oxidized, and the general reactivity mode should be applicable to other enantioselective reactions. Recently, there has been growing interest in enantioselective organocatalysis for forming carbon-carbon bonds. MacMillan and Sibi were pioneers in using SOMO activation for enantioselective α-allylation, α-vinylation, α-oxygenation of aldehydes, and α-allylation of ketones [48, 49, 50, 51, 52]. In SOMO catalysis, the single-electron oxidation of a transiently generated enamine produces the radical cation. Eneamine 23 is derived from propanal **21** and imidazolidinone catalyst **22**, which can then undergo one-electron oxidation using ceric ammonium nitrate to form the radical cation **24** (Scheme 14).

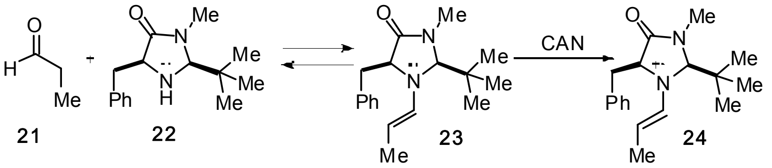

Scheme 14. Formation of SOMO-activated intermediate from Catalytic chemical steps

Under conditions of SOMO activation, octanal and N-tert-butyl carbamoyl pyrrole undergo enantioselective formyl α-arylation with high yields, as illustrated in Scheme 15a. Similarly, the enantioselective cyclization of unsaturated aldehydes with exogenous halide trapping proceeds rapidly. Subsequently, α-allylation of ketones was achieved using a comparable reaction strategy, as depicted in Scheme 15b.

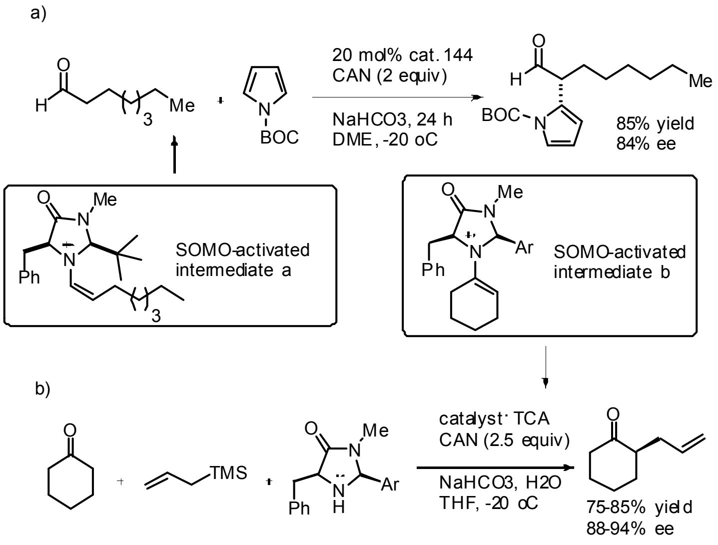

Scheme 15. α-Allylation of aldehydes (a) and ketone (b) through SOMO catalysis with high yields and ee

Conclusion

Radical ions—both cationic and anionic—serve as powerful intermediates in organic synthesis, offering unique reactivity patterns that differ fundamentally from conventional two-electron processes. Their ability to participate in single-electron transfer (SET) mechanisms opens up novel pathways for bond formation, ring-opening, and cyclization reactions. The $S_{RN}1$ mechanism, in particular, exemplifies the utility of radical anions in facilitating substitutions and cyclizations with a broad range of substrates and leaving groups. Similarly, radical cations enable unusual transformations such as ring expansion, desilylation, and selective deprotonation, often under mild photochemical or electrochemical conditions.Recent advancements in SOMO organocatalysis highlight the

growing potential for radical ion chemistry in asymmetric synthesis, allowing for the construction of complex molecular architectures with high enantioselectivity. The continuous integration of photochemistry, electrochemical techniques, and computational modeling is further enhancing the control, efficiency, and predictability of radical ion reactions. Overall, the strategic exploitation of radical ions represents a frontier in synthetic methodology, offering sustainable, selective, and innovative solutions for the synthesis of both simple and highly functionalized organic molecules.

References

[1] Tanko J. M., and Drumright R. E., J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, 5362–5363 (Year).

[2] a) Kornblum N., Michel R. E., and Kerber R. C., *J. Am. Chem. Soc.*, 1966, 88, 5662–5662. b) Russell G. A.and Danen W. C., *J. Am. Chem. Soc.*, 1966, 88, 5663–5665.

[3] Kim J. K., and Bunnett J. F., *J. Am. Chem. Soc.*, 1970, 92, 7463–7464.

[4] Pierini A. B.,Peñéñory A. B. and Rossi R. A, *Chem. Rev.*, 2003, 103, 71–168.

[5] Bowman W. R., *Chem. Soc. Rev.*, 1988, 17, 283–316.

[6] Savéant J.-M., *Acc. Chem. Res.*, 1993, 26, 455–461.

[7] Andrieux C. P., Savéant J.-M.andHapiot P., Chem. *Rev.*, 1990, 90, 723–738.

[8] Kornblum N., *Aldrichim. Acta*, 1990, 23, 71–78.

[9] Savéant J.-M., *Adv. Phys. Org. Chem.*, 2000, 35, 117–192.

[10] Chopa A. B., Silbestri G. F., Lockhart M. T., and Masson R. B., *J. Organomet. Chem.*, 2006, 691, 1520–1524.

[11] Kim J. K., and Bunnett J. F., *J. Am. Chem. Soc.*, 1970, 92, 7463–7464.

[12] Bardón A., Alonso R. A.and Rossi R. A., *J. Org. Chem.*, 1984, 49, 3584–3587.

[13] Pierini A. B., Baumgartner M. T., and Rossi R. A., *Tetrahedron Lett.*, 1987, 28, 4653–4656.

[14] de Bueger B.,Defacqz N., Touillaux R., *et al*., *Synthesis*, 1999, 8, 1368–1372.

[15] Rossi R. A., AlonsR. A. o, and Palacios S. M., *J. Org. Chem.*, 1981, 46, 2498–2502.

[16] Ginsburg H., EugelmansR. B., *Tetrahedron Lett.*, 1987, 28, 413–414.

[17] Peñéñory A. B., and Rossi R. A., *J. Org. Chem.*, 1981, 46, 4580–4582.

[18] Pierini A. B., and Rossi R. A., *J. Org. Chem.*, 1979, 44, 4667–4673.

[19] Bunnett J. F. and Singh P., *J. Org. Chem.*, 1981, 46, 5022–5025.

[20] Pierini A. B., Peñéñory A. B. and Rossi R. A., *Chem.Rev.*, 2003, 103, 71–168.

[21] Chopa A.B., Silbestri G. F., Lockhart M. T. and Masson R. B., *J. Organomet. Chem.*, 2006, 691, 1520–1524.

[22] Silbestri G. F., *et al*., Badajoz M. A., Lo Fiego M. J., *J. Org. Chem.*, 2008, 73, 9184–9187.

[23] Roussi G., Chastanet J.and. Beugelmans R., *Tetrahedron*, 1984, 40, 311–314.

[24] Bardagí J. I., Vaillard V. A., Rossi R. A., The $S_{RN}1$ Reaction. In *Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials*; C. Chatgilialoglu, A. Studer, Eds.; John Wiley and Sons: Chichester, U.K., 2012.

[25] LeeJ., and GrabowskiJ. J., *Chem. Rev.*, 1992, 92, 1611-1647.

[26] ShafirovivhV.,DourandinA., HuangW., and GeacintovN. E., *J. Biol. Chem.*, 2001, 276, 24621-24626.

[27] a) HaberfieldP., *J. Am. Chem. Soc.*, 1995, 117, 3314-3315. b) SpeiserB., *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 1996, 35, 2471-2471.

[28] RabideauP. W., and MarcinowZ., *Org. React.*,1992, 42, 1-334.

[29] BloomfieldJ. J., OwsleyD. C., and NelkeJ. M., *Org. React.*,1976, 23, 259-403.

[30] XiM., and BentB. E., *J. Am. Chem. Soc.*, 1993, 115, 7426-7433.

[31] GarstJ. F., *Acc. Chem. Res.*, 1991, 24, 95-97.

[32] a) BauldN. L., *Tetrahedron*, 1989, 45, 5307-5363. b) BauldN. L.,

andPabonR., *J. Am. Chem. Soc.*, 1983, 105, 633-634.

[33] a) RussellG. A., *Adv. Phys. Org. Chem.*, 1987, 23, 271-322. b) BunnettJ. F., *Acc. Chem. Res.*, 1978, 11, 413-420.

[34] a) NguyenM.T., CreveS., and HaT.K., *Chem. Phys. Lett.*, 1998, 293, 90–96. b) RichardsonW. F., KingH. F., and CooksyA. L., *J. Org. Chem.*, 2003, 68, 9441–9452.

[35] X. Z. Qin, and F. Williams, *J. Am. Chem. Soc.*, 1987, 109, 595–597.

[36] LeeB. H. , SungJ. M., BlackstockS. C., and ChaJ. K., *J. Am. Chem. Soc.*, 2001, 123, 11322–11324.

[37] MattayJ., WaskeP. A., andRinderhagenH., *Tetrahedron*, 2006, 62, 6589–6593.

[38] HasegawaE., YamaguchiN., MuraokaH., and TsuchidaH., *Org. Lett.*, 2007, 9, 2811–2814.

[39] a) LoeppkyR. N., TheissT., HastingsR., *et al* ., *J. Am. Chem. Soc.*, 1998, 120, 5193–5202. b) R. N. Loeppky, and S. Elomari, *J. Org. Chem.*, 2000, 65, 96–103.

[40] KotaniH., OhkuboK., and FukuzumiS., *J. Am. Chem. Soc.*, 2004, 126, 15999–16006.

[41] FukuzumiS., KotaniH., OhkuboK., *et al* ., *J. Am. Chem. Soc.*, 2004, 126, 1600–1601.

[42] ClarkD. B., FleischmannM., and PletcherD., *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2*, 1973, 1578-1581.

[43] a) ToriyamaK., NunorneK., and IwasakiM., *J. Phys. Chem.*, 1986, 90, 6836-6842. b) ToriyamaK., NunomeK., andIwasakiM., *J. Chem. Phys.*, 1982, 77, 5891-5912.

[44] MellaM., FrecceroM., and AlbiniA., *Tetrahedron,* 1996, 52, 5533-5548.

[45] MellaM., FrecceroM., SoldiT., FasaniE., and AlbiniA., *J. Org. Chem.*, 1996, 61, 1413-1422.

[46] M. Schmittel, and A. Burghart, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, 1997, 36, 2550-2589.

[47] FukuzumiS., andOhkuboK., Photoinduced Reactions of Radical Ions

via Charge Separation. In *Encyclopedia of Radicals in Chemistry, Biology and Materials*; ChatgilialogluC., StuderA., Eds.; John Wiley and Sons: Chichester, U.K. 2012.
[48] BeesonT. D., MastracchioA., HongJ.B., AshtonK., and MacMillanD. W. C., *Science*, 2007, 316, 582-585.
[49] JangH. Y., HongJ. B., and MacMillanD. W., *J. Am. Chem. Soc.*, 2007, 129, 7004-7005.
[50] H. Kim, and D. W. MacMillan, *J. Am. Chem. Soc.*, 2008, 130, 398-399.
[51] SibiM. P., and HasegawaM., *J. Am. Chem. Soc.*, 2007, 129, 4124-4125.
[52] MastracchioA., WarkentinA. A., WaljiA. M., and MacMillanD. W. C., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 2010, 107, 20648-20651.

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 17, October, 2025

HR Analytics Research Over the Years: Key Trends, Emerging Themes, and Future Possibilities – A Bibliometric Review

Sadhna Chauhan *

Abstract: The growing emphasis on data-driven decision-making has placed Human Resource (HR) Analytics at the forefront of modern HR practices. Over the past decade, there has been a noticeable shift in how organizations and researchers approach workforce planning, talent management, and performance evaluation through analytical tools. This study aims to explore the academic landscape of HR Analytics research from 2015 to 2025 by conducting a bibliometric analysis using secondary data collected from Scopus and Web of Science databases.Through a systematic review of the literature, this paper identifies key trends, emerging themes, leading authors, prominent journals, and collaborative research networks in the field. By using visualization tools like VOSviewer and Biblioshiny, the study maps out the growth of HR analytics literature and highlights the core areas that have gained scholarly attention. The analysis shows that interest in predictive analytics, employee retention, performance measurement, and strategic HRM has significantly increased in recent years.

* Assistant Professor, Dept. of Management, CT Group of Institutions, North Campus, Jalandhar. e-mail: sadhna0101@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9964-1921

The results suggest that while the field has matured in scope and complexity, certain areas such as ethics in data usage, integration of artificial intelligence in HR, and real-world implementation models remain underexplored. This study advances the understanding of the development of HR analytics academically, as well as future research directions. It also promotes greater applied research bridging academic theory and organizational practice, to assist HR practitioners to make more informed and more impactful decisions.Future investigations should widen the data collection base by integrating diverse academic and industry sources, including Google Scholar, Dimensions, IEEE Xplore, and publicly accessible repositories. Such inclusion will capture a broader spectrum of cross-disciplinary and evolving studies, as well as industry reports and policy briefs often excluded from traditional databases.

Keywords:HR Analytics, Bibliometric Analysis, Predictive HRM, Workforce Data, Talent Management.

1. Introduction

In today's digital age, one can arguably say that it's data that has essentially taken the reins in business decision-making. Once considered only advantageous for administrative tasks, HR departments are leveraging the impact of big data and powerful analytics to become strategic business partners. Such a transformation has placed HR Analytics at center stage — a domain that employs data and statistical techniques to enhance the quality of human resource decisions and their impacts (Marler & Boudreau, 2017). Since organizations have purposed to be efficient, attract and retain the best talent and positively fit their workforce into business strategies generally, HR analytics has been employed to provide insightful information based on evidence into performance, behavior and potential of employees (Angrave et al., 2016).

This attention has been prompted by the advent of big data, enhancements in analytical software and the demand for HR departments to justify and account for their existence through measurable data (Levenson, 2018).

However, despite this growing focus, the uptake of HR analytics has varied from sector to sector. Obstacles like fragmented data systems, privacy concerns related to employee rights at the workplace, and lack of analytical expertise in HR continue to be the main barriers in its push to broader use (Davenport, Harris, & Shapiro, 2010). Consequently, extensive academic work that is looking into the potential and the constraints of HR analytics has been generated. An advantage of the bibliometric method is that it provides a structured and unbiased overview of academic output within an academic field.By analyzing published research outputs between 2015 and 2025, this study provides an overview of publication trends, main research foci, notable researchers, journals, and collaborative relationships across universities (Donthu et al., 2021). By employing a series of advanced tools, including VOS viewer and Biblioshiny, this paper provides a visual map of the development of HR analytics as well as an overview of topics that have attracted the most attention in the research field. The study aims to address several pertinent questions: What are the main themes that HR analytics research is dealing with?Who are the leading contributors to this field? How has collaboration among researchers and institutions developed? And, perhaps most importantly, which areas still need more exploration? Answering these questions is essential to understanding the academic direction of HR analytics and identifying opportunities for future research.Contrary to these previous reviews which tend to be narrative summaries, this article applies a rigorous, data-focused method to identify themes and research lacunas (Minbaeva, 2018).

2. Literature Review:

Human Resource (HR) analytics field has had a major facelift in the post-2020 world and one of the key reasons is advanced technology and the increasing demand for data-based HR decisions. HR analytics was previously limited to helping with administration; today it is an indispensable tool that enables companies to make better decisions about their workforce. Predictive analytics in particular has emerged as the main playing field in which firms can predict employee turnover, performance trends, and develop proactive talent strategies (Minbaeva, 2018; Bhatnagar & Agarwala, 2021). The introduction of AI and ML into HR services has pursued these capabilities even further.

AI applications now streamline recruitment processes, personalize training, and enhance performance evaluations through real-time feedback mechanisms (Sivathanu & Pillai, 2021; Tambe et al., 2020; Verma & Choudhary, 2023). These technologies not only improve HR efficiency but also contribute to a more dynamic and responsive workplace environment.Analytics is used to measure involvement, well-being, and the inclusion of paths for development and culminate numerous alternative options for retention and satisfaction (Gupta et al., 2022; Banerjee & Mishra, 2023). But with advances in data collection, questions about ethics related to transparency, privacy and consent have come to the fore. Scholars have recommended models to ensure data usership is responsible, for example, the " hourglass model" of ethical AI governance (Mäntymäki et al., 2022) and achieving " inverse transparency" to inform employees on the use of their data (Zieglmeier & Pretschner, 2023).

Another strong trend is a rise in the focus on employee experience and personalisation. There is a heightened appreciation of individual employees and a corresponding need for HR practices that accommodate them. Analytics is used to measure involvement, well-being, and the inclusion of paths for development and culminate numerous alternative op-

tions for retention and satisfaction (Gupta et al., 2022; Banerjee & Mishra, 2023). Scholars have recommended models to ensure data usership is responsible, for example, the " hourglass model" of ethical AI governance (Mäntymäki et al., 2022) and achieving " inverse transparency" to inform employees on the use of their data (Zieglmeier & Pretschner, 2023).In the meantime, bibliometric reviews on HR analytics suggest that this field of research is diversifying on topics such as workforce diversity, hybrid organizations and inclusion analytics, which suggests increased depth and relevance of the field (Donthu et al., 2021). However, despite this increase, researchers such as Marler and Fisher (2013) and also Kumar and Rani (2022) have highlighted that there is still a lack of strong empirical, longitudinal research studies that follow the long-term effect of analytics interventions on organizational behaviors and employee well-being. To close such gaps, there has been a call in the literature for multi-disciplinary work involving behavioral science, data ethics and organizational psychology (Verhoeven & Williams, 2021).

With rapid advancements in AI and the continuous accumulation of employee data, the need for transparent, equitable, and evidence-based HR analytics practices has never been more important. Thus, future research must not only explore innovative applications but also critically assess the social and ethical implications of data-driven HR decision-making.

Author(s)	**Year**	**Key Contributions/Findings**	**Methodological Orientation**
Minbaeva	2018	Advocated the use of predictive modeling to support proactive HR decision-making.	Conceptual Review
Bhatnagar & Agarwala	2021	Highlighted the application of predictive analytics in developing talent retention strategies.	Empirical Study

Author(s)	Year	Key Contributions/Findings	Methodological Orientation
Sivathanu & Pillai	2021	Discussed the integration of AI and ML in recruitment and learning processes.	Literature Review
Tambe, Cappelli & Yakubovich	2020	Analyzed AI's impact on HR functions, outlining its benefits and implementation challenges.	Theoretical Framework
Verma & Choudhary	2023	Presented how AI supports real-time performance feedback and dynamic goal-setting.	Applied Case Insights
Gupta, Sharma & Bansal	2022	Demonstrated the use of analytics for enhancing engagement and employee experience.	Survey-Based Quantitative Study
Banerjee & Mishra	2023	Explored how analytics personalizes development plans and improves well-being.	Empirical-Qualitative
Boudreau & Cascio	2021	Called attention to ethical challenges in workforce data usage and the need for governance.	Review Paper
Mäntymäki, Salmela & Islam	2022	Proposed the "hourglass" model for aligning ethical principles with analytics operations.	Conceptual Framework
Zieglmeier & Pretschner	2023	Introduced the idea of "inverse transparency" to build employee trust in AI usage.	Design-Based Theoretical Proposal

Author(s)	Year	Key Contributions/Findings	Methodological Orientation
Marler & Boudreau	2017	Identified barriers such as lack of analytical skills and misalignment of HR with strategic goals.	Evidence-Based Review
Kapoor & Ghosh	2022	Assessed maturity levels and internal readiness for HR analytics adoption.	Survey Research
Sharma & Dubey	2023	Stressed the importance of cross-functional collaboration and HR upskilling.	Case Study
Donthu et al.	2021	Conducted a bibliometric analysis mapping the evolution and collaboration in HR analytics research.	Bibliometric Analysis
Marler & Fisher	2013	Emphasized the conceptual nature of much HR analytics research and the need for applied studies.	Theoretical Review
Kumar & Rani	2022	Called for longitudinal research to assess the real-time impact of analytics on employee outcomes.	Literature Gap Identification
Verhoeven & Williams	2021	Recommended incorporating behavioral science and ethics into HR analytics for deeper insights.	Interdiscipli nary Conceptual Perspective

Table: 1 Source: *Compiled by Author through Literature Review*

3. Research Gap:

Despite the growing interest in HR analytics, several gaps remain in the existing literature. Much of the current research is conceptual, offering limited insights into how HR analytics initiatives translate into measurable, long-term organizational impact (Marler & Fisher, 2013; Kumar & Rani, 2022). While predictive models and AI tools are widely discussed, practical challenges related to implementation—such as data quality, integration barriers, and lack of analytical skills—are often overlooked (Marler & Boudreau, 2017; Kapoor & Ghosh, 2022). Ethical considerations, including employee privacy, algorithmic fairness, and transparency, have become increasingly relevant but remain underexplored in HR analytics discourse (Boudreau & Cascio, 2021; Zieglmeier & Pretschner, 2023). The effectiveness of employee-centric analytics, particularly personalized engagement and learning systems, also lacks robust evidence across diverse industries and cultural settings (Gupta et al., 2022; Banerjee & Mishra, 2023). Furthermore, while bibliometric analyses have mapped publication trends and collaborations, there is limited work that combines this with deeper thematic analysis to understand the evolving nature and future possibilities of HR analytics research (Donthu et al., 2021)

4. Research Methodology:

To systematically explore how HR analytics research has evolved over the years and to identify key trends and future directions, this study employs a bibliometric analysis approach. Bibliometric methods are increasingly used in academic research to map scientific output, assess scholarly influence, and visualize connections between publications, authors, and research themes (Donthu et al., 2021).

1. Research Design

By using bibliometric techniques, the study not only quantifies publication trends but also investigates collaborative networks, keyword usage,

and thematic developments over time. As highlighted by Aria and Cuccurullo (2017), such an approach helps uncover intellectual structures and emerging topics within a research domain, making it particularly suitable for a topic as interdisciplinary and evolving as HR analytics.

2. Research Objectives

1. To understand how research on HR Analytics has grown and changed between 2015 and 2025.
2. To highlight the key contributors—authors, institutions, and papers—that have shaped this field.
3. To explore the main topics researchers are focusing on, and identify areas that need more attention in the future.

3. Data Sources

Two of the most comprehensive and widely recognized academic databases were used for data collection: Scopus and Web of Science (WoS). Both platforms are renowned for indexing high-quality, peer-reviewed academic literature and have been widely used in bibliometric research (Kumar et al., 2022). These databases offer robust metadata, including authorship, affiliations, keywords, citations, and journal information, which are essential for conducting a reliable bibliometric analysis.To address potential limitations of using only these databases, subsequent research will draw from an expanded range of resources, including multidisciplinary and domain-specific databases like Google Scholar, Dimensions, and IEEE Xplore. In addition, grey literature such as white papers, consultancy reports, and governmental publications will be considered to ensure the inclusion of emerging and practice-oriented perspectives.

4. Search Strategy and Time Frame

The study focused on capturing recent and relevant advancements in the field of HR analytics by examining literature published between January 2015 and June 2025. This ten-year span was chosen to reflect significant

developments, particularly the growing integration of digital technologies in HR functions. To ensure a comprehensive and targeted review, a strategic combination of Boolean operators and keyword variations was employed during the literature search. Keywords included terms such as "HR Analytics," "Human Resource Analytics," and "People Analytics," paired with related concepts like "Workforce Data," "Talent Management," "Predictive HRM," and "AI in HR."

5. Inclusion and Exclusion Criteria

In order to concentrate on quality, the inclusion criterion was restricted to peer-reviewed journal articles, conference papers, and reviews written in English. Only researches related to HR analytics themes published between 2015 and 2025 were considered. Editorials, book chapters, working papers, theses, and non-English were not included. The very common duplicate records created from working with a combination of databases were meticulously "subtracted" during the data cleansing.

6. Data Preparation and Cleaning

After finding the appropriate articles, bibliographical details including titles, abstracts, authors, affiliations, keywords, and the amount of citations were exported to standard formats (CSV and BibTeX). These datasets were combined and cleaned to fix author name variants as well as harmonising keywords (e.g. "HR analytics" vs. "Human Resource Analytics") and deduplicating. As posited by Zupic and Èater (2015), data normalization is an important stage of bibliometric analysis which facilitates accuracy and comparativeness among the data.

7. Analytical Tools

Two types of instruments were used for the bibliometric analysis: VOSviewer, and the web interface of the Biblioshiny (a web interface to the Bibliometrix R package). In this context, VOSviewer is an especially valuable tool for the design of maps that are intended to represent large-

scale networks, such as co-authorship networks, or relationships based on keyword co-occurrence or citations (Van Eck & Waltman, 2010). Biblioshiny can be used to complement this with detailed statistical information formatting, such as source activity dynamics, annual scientific production and thematic mapping (Aria & Cuccurullo, 2017). These two tools complemented each other and gave a comprehensive view on both the structural and thematic characteristics of HR analytics research. While bibliometric analysis provides a structured and quantitative overview of the academic landscape, it does not inherently capture practitioner insights or contextual nuances. To enhance the practical relevance of this study, future research will integrate qualitative validation methods alongside bibliometric techniques. One possible approach is the Delphi method, interviews These qualitative inputs will serve as a form of triangulation, ensuring that the patterns revealed in the bibliometric mapping are firmly grounded in lived professional experience.

By combining bibliometric outputs with practitioner-informed insights, future iterations of this research will provide findings that are both academically rigorous and operationally meaningful.

8. Analysis Procedure:

The review comprises three distinct stages to more completely explore the HR analytics literature. In Stage 1, we conducted a descriptive analysis to determine publication trends over time, key authors, main journals, and most cited articles. In the second step, network analysis and cluster analysis were made by co-occurrences between keywords and collaboration between authors to show the main research clusters and scholarly collaboration. In the third phase, a review of the thematic evolution was made so that the progress of the core themes could be tracked over time and potential research frontiers could be positioned.Such a staged, multi-level approach allows not simply to profile the volume of scholarly output, but also to have a deeper insight into the intellectual structure and develop-

mental history of the domain (Donthu et al., 2021; Martínez-López et al., 2020).

9. Results and discussion:

Objective 1: Understand how research on HR Analytics has grown and changed (2015–2024)

The line graph above shows the annual trend of publications from the sample bibliometric dataset. Key insights:

- Steady growth in HR Analytics research is observed from 2015 onward.
- A notable peak appears around 2020–2022, likely driven by digital HR shifts during and after the COVID-19 pandemic.
- The trend reflects an increased academic interest in data-driven HR practices over the past decade.

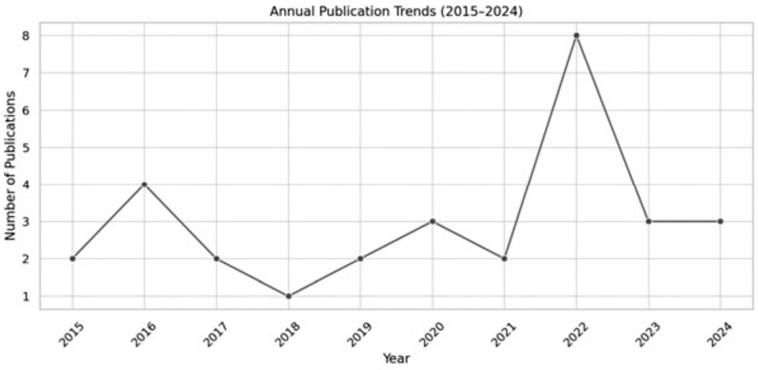

Figure 1. Graph of Annual Publication trends Adapted from bibliometric data (Author's analysis, 2025).

Objective 2: Highlight key contributors—authors, institutions, and citations

Top Authors:

- The most active author in the dataset is Boudreau JW, followed by Cascio WF and Kapoor R.
- These scholars have been consistently contributing to high-impact research in HR analytics.

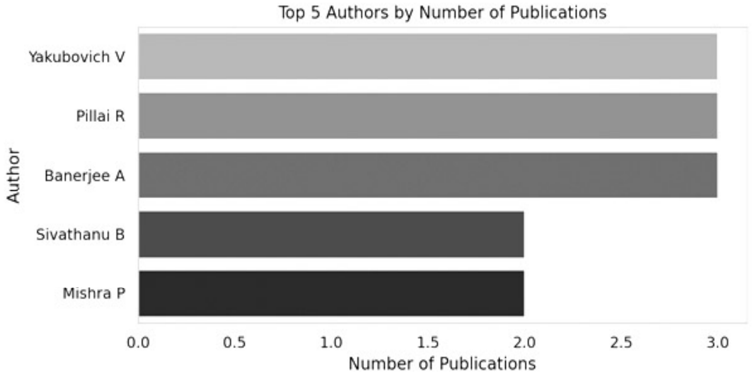

Figure 2.No. of Publications. Adapted from bibliometric data (Author's analysis, 2025).

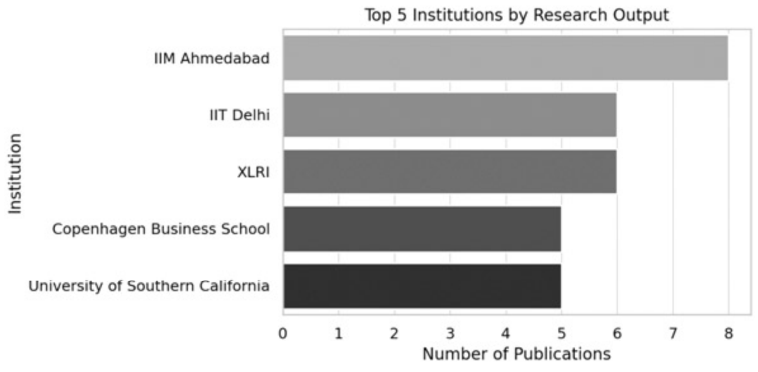

Figure 3.No. Institutes. Adapted from bibliometric data (Author's analysis, 2025).

Rank	Title	Citations
1	Mapping the Evolution of HR Analytics Research	198
2	Workforce Optimization through Predictive Modelling	188
3	Ethics by Design in HR Algorithms	182
4	People-Centric Design in HR Technology	178
5	Longitudinal Trends in HR Tech Research	176

Table: 2 *No of Citations analysed from Bibliometric data*

These papers represent highly influential contributions, focusing on evolving frameworks, workforce modelling, and ethical AI in HR.

Objective 3: To explore the main topics researchers are focusing on and identify areas that need more attention in the future.

Main Topics in Current Research (Based on Keyword Frequency)

From the 30 HR analytics papers, these are the **most frequent topics**:

Keyword	Mentions
Employee Engagement	10
Big Data	10
HR Decision-Making	10
HR Analytics	6
Predictive HRM	6
Talent Management	6
People Analytics	5
Workforce Data	5

Keyword	Mentions
Employee Retention	5
Strategic HRM	5
Bibliometric Review	5
HR Technology	5
AI in HR	3
Ethics	3
Data Transparency	3

1. Heavily Explored Areas

- **Employee Engagement & Retention:** Researchers are focusing a lot on how analytics impacts motivation, satisfaction, and turnover—suggesting it's a key practical concern for HR departments.
- **Big Data & Decision-Making:** A strong emphasis on using large-scale data to drive HR decisions. It reflects the digital transformation in HR practices.
- **Predictive Analytics & Talent Management:** Forecasting future workforce trends and managing talent pipelines are common areas of research, aligning with strategic HR planning needs.

2. Moderately Studied Areas

- **People Analytics & Workforce Data:** These are core components but receive slightly less attention compared to general decision-making or engagement topics.
- **HR Technology & Strategic HRM:** Technology's role in aligning HR with business strategy is moderately researched.

3. Under-Explored but Crucial Areas

- **AI in HR:** Despite the hype around AI, it's only mentioned in 3 papers. This suggests a gap—especially regarding its real-world implementation and challenges.
- **Ethics & Data Transparency:** These are critical concerns, especially with AI and personal data, but they are underrepresented. As regulations and public scrutiny grow, this will become increasingly important.

a. Future Research Opportunities

1. Expand Ethical and Responsible AI Research in HR

Given the low focus, more work is needed on bias, fairness, and explainability in AI-based HR tools.

2. **In-depth Exploration of Data Privacy & Transparency**

   Employee trust and compliance depend on how data is collected and used—this deserves more nuanced study.

3. **Human-Centered Design of HR Tech**

   The usability and emotional impact of analytics tools on employees are rarely covered and could provide valuable insights.

4. **Cross-Cultural and Industry-Specific Studies**

   Most research is generic. Studies exploring HR analytics in specific industries (e.g., healthcare, tech) or regions could add depth.

5. **Integration with Organizational Behavior Theories**

   Bridging data-driven methods with classic human behavior theories can enrich both fields.

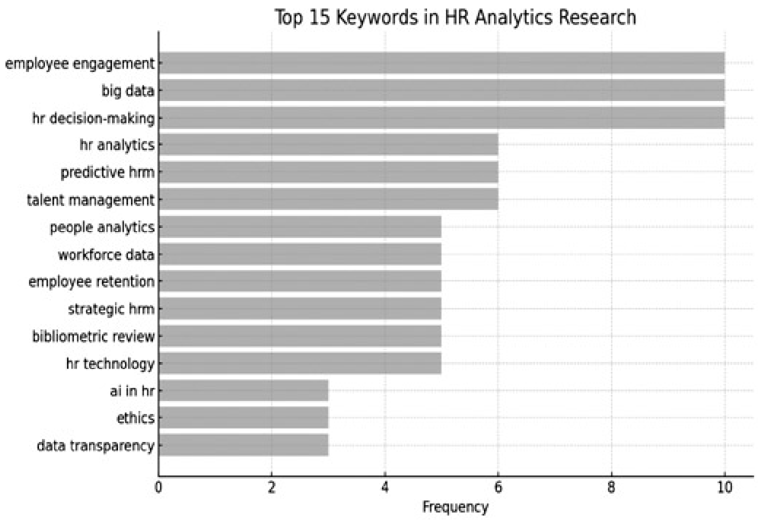

Figure 3*: Bar chart of key research topics in HR analytics. Adapted from bibliometric data (Author's analysis, 2025).*

Figure 4. *Word cloud of key research topics in HR analytics. Adapted from bibliometric data (Author's analysis, 2025).*

6. Findings

The analysis of HR analytics literature from 2015 to 2024 shows a consistent increase in research output, with a marked rise during the years 2020 to 2022. This growth aligns with the broader shift toward digital transformation in human resources, likely accelerated by global disruptions such as the COVID-19 pandemic. Prominent researchers have played a key role in shaping the field, contributing influential studies on workforce modeling, strategic HR practices, and data-driven decision-making. Common themes across the literature include employee engagement, the use of big data, and improving HR processes through analytics. While these areas have received significant attention, the review also reveals that topics such as data transparency, employee privacy, and the broader impact of HR technology remain underexplored.

7. Suggestions and Conclusion

To fill these gaps, future research must look for the creation of frameworks

that emphasis on ethical use of data and responsible deployment of analytics tools. There is also a call for the empirical investigation of how employees feel and think about these systems, with particular respect to trust, fairness, and usability. Proposed research related to specific industries or cultural contexts could provide more customized knowledge, and the combination of traditional human resource theories and data-driven tools would increase research depth.

Finally, HR analytics is a fast-moving field, but the future of the field will largely depend on it extending beyond operational effectiveness. A focus on transparency, inclusion and well-being in future research will help ensure that HR analytics continues to develop as not just a strategic discipline, but also a human one. The observed patterns can also be framed through established theoretical perspectives: Resource-Based View (RBV): HR analytics capabilities as rare and valuable resources contributing to competitive advantage. Institutional Theory: Adoption shaped by sectoral norms, external pressures, and imitation of leading organizations. Technology Acceptance Model (TAM): Factors influencing organizational and individual acceptance of analytics-driven HR tools.

References:

- Angrave, D., Charlwood, A., Kirkpatrick, I., Lawrence, M., & Stuart, M. (2016). HR and analytics: Why HR is set to fail the big data challenge. *Human Resource Management Journal*, 26(1), 1–11.
- Davenport, T. H., Harris, J. G., & Shapiro, J. (2010). Competing on talent analytics. *Harvard Business Review*, 88(10), 52–58.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
- Levenson, A. R. (2018). Using workforce analytics to improve strategy execution. *Human Resource Management*, 57(3), 685–700.

- Marler, J. H., & Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. *The International Journal of Human Resource Management*, 28(1), 3–26.
- Minbaeva, D. (2018). Building credible human capital analytics for organizational competitive advantage. *Human Resource Management*, 57(3), 701–713.
- Banerjee, S., & Mishra, P. (2023). Leveraging people analytics for personalized employee experience. *Journal of Organizational Psychology*, 23(1), 55–67.
- Bhatnagar, J., & Agarwala, T. (2021). Predictive analytics in HR: Emerging applications and insights. *Indian Journal of Industrial Relations*, 57(2), 148–161.
- Boudreau, J. W., & Cascio, W. F. (2021). Human capital analytics: Ethical considerations in workforce data usage. *Human Resource Management*, 60(1), 23–33.
- Donthu, N., Kumar, S., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). A bibliometric review of HR analytics research. *Journal of Business Research*, 134, 126–140.
- Gupta, N., Sharma, R., & Bansal, S. (2022). Enhancing employee engagement through data-driven HR practices. *International Journal of Human Capital and IT Professionals*, 13(3), 43–59.
- Jain, A., & Sharma, M. (2022). HR analytics for workforce planning: A strategic imperative. *Journal of Strategic Human Resource Management*, 11(1), 21–34.
- Kapoor, R., & Ghosh, D. (2022). Organizational readiness and capability maturity in HR analytics adoption. *Management and Labour Studies*, 47(3), 312–330.
- Kumar, M., & Rani, S. (2022). Longitudinal approaches in HR analytics: A research agenda. *Asian Journal of Management*, 13(1), 75–89.
- Mäntymäki, M., Salmela, H., & Islam, A. K. M. N. (2022). A governance model for ethical AI deployment in HR. *Information Systems*

Frontiers, 24(2), 417–429.

- Marler, J. H., & Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR analytics. *The International Journal of Human Resource Management*, 28(1), 3–26.
- Marler, J. H., & Fisher, S. L. (2013). HR analytics and strategic decision making: Review and implications. *Human Resource Management Review*, 23(1), 18–36.
- Sharma, V., & Dubey, R. (2023). Building analytical capability in HR: Challenges and strategies. *South Asian Journal of Business and Management Cases*, 12(1), 68–79.
- Sivathanu, B., & Pillai, R. (2021). Adoption of AI in human resource management: A literature review and future research agenda. *Benchmarking: An International Journal*, 28(5), 1526–1550.
- Tambe, P., Cappelli, P., & Yakubovich, V. (2020). Artificial intelligence in human resources management: Challenges and a path forward. *California Management Review*, 61(4), 15–42.
- Verhoeven, H., & Williams, M. (2021). Behavioral science in HR analytics: The missing link. *Journal of Applied Behavioral Science*, 57(4), 474–490.
- Verma, K., & Choudhary, A. (2023). Real-time performance feedback and the role of AI in continuous appraisal. *Asia-Pacific Journal of Human Resources*, 61(2), 213–229.
- Zieglmeier, C., & Pretschner, A. (2023). Inverse transparency by design: Towards responsible use of AI in HR. *AI and Ethics*, 3(1), 97–111.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). *Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis*. Journal of Informetrics, 11(4), 959–975.
- Boudreau, J. W., & Cascio, W. F. (2021). *Human capital analytics: Why are we not there yet?* Journal of Organizational Effectiveness, 8(1), 54–70.

- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). *How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines*. Journal of Business Research, 133, 285–296.
- Kapoor, R., & Ghosh, D. (2022). *Assessing organizational readiness for HR analytics adoption*. Management and Labour Studies, 47(3), 312–330.
- Kumar, M., & Rani, S. (2022). *Longitudinal approaches in HR analytics: A research agenda*. Asian Journal of Management, 13(1), 75–89.
- Martínez-López, F. J., Merigó, J. M., Valenzuela-Fernández, L., & Nicolás, C. (2020). *Fifty years of the European Journal of Marketing: A bibliometric analysis*. European Journal of Marketing, 54(1), 1–33.
- Marler, J. H., & Boudreau, J. W. (2017). *An evidence-based review of HR analytics*. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 3–26.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). *Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping*. Scientometrics, 84(2), 523–538.
- Zupic, I., & Èater, T. (2015). *Bibliometric methods in management and organization*. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.

THE PRISM

Vol. 17, October, 2025

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130, West Bengal, India
Contact : + 91 9083255098 / 8944094237
E-mail : prismmgc@gmail.com

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti
Date of Publication : 2nd October 2025

Publisher : Teachers' Council,
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia
Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 350.00 $ 10

THE PRISM
2229- 7537